

DOI No : <https://www.doi.org/10.62272/JS.V14>

ISSN: 1813-2871

JOURNAL OF SOCIOLOGY

Volume 14 Issue 1&2, 2023

সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা

EDITOR

Professor Dr. A K M Jamal Uddin



**Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka**

Editor:

Professor Dr. A K M Jamal Uddin
Department of Sociology
University of Dhaka

Members:

Professor Dr. Zeenat Huda
Department of Sociology
University of Dhaka

Professor Dr. A.S.M. Amanullah
Department of Sociology
University of Dhaka

Professor Dr. Fatema Rezina Iqbal
Department of Sociology
University of Dhaka

Professor Salma Akhter
Department of Sociology
University of Dhaka

Editorial Associate:

Saraf Afra Mou
MSS First Semester
Department of Sociology
University of Dhaka

Subscription: Tk. 500.00 per issue (US\$ 30 including postage)

Correspondence: Editor, Journal of Sociology, Nazmul Karim Study Center, Room No. 1, Lecture Theater, Arts Faculty, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh. E-mail: nksc1511@gmail.com

Printed by: Memorial Offset Printers, 67/68 Jogenagor Road Wari, Dhaka.
Phone: 01923525127, 01790377720

Editor's Note

The first and second issues altogether under volume 14 of the Journal of Sociology for the year 2023 has come out. I am very pleased to say that the editorial board took decision to bring out the first and second issue on time, therefore, more articles were invited from the teachers, researchers and scholars. At the call, the center received a huge number of articles, and out of those, some were sorted out for review and only recommended articles are being published.

Further, like previous issues also it took much time to bring out the current issue on time. Because it was very difficult to get the articles reviewed by the reviewers. On the other hand, some reviewers took much time to revise and correct the articles as per suggestions of the reviewers. Like previous issue, the journal is bilingual with resourceful articles. In this volume altogether 13 articles have been published, out of which 8 are in Bangla and 5 are in English. We hope that this issue will be readable and helpful for both academics and researchers. Once again, I am thankful to the members of the editorial board, reviewers, and contributors and especially to Prof. Dr. A. S. M. Maksud Kamal, the Vice-Chancellor of the University of Dhaka for his generous cooperation.

Professor Dr. A K M Jamal Uddin

NAZMUL KARIM STUDY CENTER

The Nazmul Karim Study Center has been named after Dr.A.K. Nazmul Karim who was the first Bangalee Professor of the Department of Sociology, University of Dhaka. Dr. Karim taught at the Department of Sociology for 22 years as professor, besides this, he was also Chairman of the department. After his sudden death in 1982, the Academic committee of the Department of Sociology adopted a resolution and placed it to the Dhaka University administration to do something in memory of Dr. Nazmul Karim. In 2000, the university administration established the Nazmul Karim Study Center under the direct guidance of the Vice Chancellor of the University. Professor Syed Ahmed Khan was appointed as the first Director of the center. The present Director of the center is Prof. Dr. A. K.M. Jamal Uddin and also, he is the editor of the Journal of Sociology.

The objective of the Center is to arrange seminars and lectures on different current socio-economic issues and to publish a research journal twice a year. Distinguished and learned personalities of our society are invited to public deliver lectures at this center. The e-mail address of the center is nksc1511@gmail.com

CONTENTS

সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেনের শিক্ষার্জন ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ (The Context of Achieving and Application of Education by Sociologist Rangalal Sen)	7-28
বাবুল চন্দ্র সুত্রধর	
সমাজতত্ত্ব তর্ক-বিতর্ক (Debates in Sociology) ড. মনিরুল ইসলাম খান	29-43
Building Sociological Theory in the Global South: Problems and Prospects Dr. Lipon Mondal	44-70
ব্রনো লাতুরের তত্ত্ব-ভাবনা পরিচয় (Introduction to the Theoretical Ideas of Bruno Latour) ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ড	71-80
Neoliberalism and Economic Transformation in Rural Bangladesh: A Study on Palsa Village Saraf Afra Mou, Dr A K M Jamal Uddin	81-106
Buddhist Currency in Ancient Period: A Comparative Study Mst. Ummaysulaim Prethe	107-117
Risks, Vulnerabilities, and Adaptations: Exploring the Impact of Salinity Intrusion on Women in Coastal Bangladesh Shahana Afrin Dina, Dilafroze Khanam, Mohammad Mufajjal Sarwar	118-139
বাংলা বাগ্ধারায় সমাজচিত্র রূপায়ণে সংকৃত সাহিত্যের ভূমিকা – একটি পর্যালোচনা (The Role of Sanskrit Literature in Illustrating the Social Views through Bengali Idioms- A Review) তিতাস কুমার শীল	140-160
বৌদ্ধ শিল্পকলার উত্তর ও বিকাশে রাজবংশের অবদান সমীক্ষা: বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ (A Study on the Dynastic Contributions to the Origin and Development of Buddhist Arts: Buddha Age to Gupta Age) ড. শান্তু বড়ুয়া	161-183
প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নির্দর্শন 'সাংকাশ্য': অতীত ও বর্তমান (The 'Sāṃkāshya' As A Sign of Ancient Buddhist Traditions: Past and Present) ড. শামীমা নাছরিন	184-201
মালবেদে জনগোষ্ঠীর জাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত মুন্শিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রাম (Kinship and Descent System of Malbedey Community: A Case Study of Gopalpur Village in Munshiganj District.) কাজী মিজানুর রহমান	202-215

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধ: গণহত্যা ও গণকবর	216-243
(Agailjhara in the Liberation War: Genocide and Mass Graves in Eyewitness Accounts)	
ড. কালিদাস ভট্ট	
Role of Women Entrepreneurs in Handicraft Small Enterprises and Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh	244-254
Dr. Salma Begum, Moniruzzaman	

সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেনের শিক্ষার্জন ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ
(The Context of Achieving and Application of Education
by Sociologist Rangalal Sen)

বাবুল চন্দ্ৰ সুত্রধৰ*

সার-সংক্ষেপ

ড. রংগলাল সেন (১৯৩৩-২০১৪) অধ্যাপক হিসেবেই দেশে ও বিশ্বে পরিচিত ছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগ দেন, ১৯৬৪ সনে। পরের বছর একই পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও বিদ্যুৎ সমাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বংগবন্ধু পরিষদ, শের-এ-বাংলা স্মৃতি পরিষদ, জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি। তাছাড়া, তিনি চ্যাপেলের মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণিকেট সদস্য হন। ২০১১ সনে ড. রংগলাল সেনকে জাতীয় অধ্যাপকের অনন্য র্ঘ্যাদা দান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ২০১৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী দেশবরেণ্যে এই জাতীয় অধ্যাপকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। ড. রংগলাল সেন প্রারম্ভিক পর্যাপ্ত প্রয়োগ করে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মূল্যবান কতিপয় গ্রহণ করে আসে। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে কোন প্রকার হিংসা ও হানাহানি থাকবে না, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সদাচার প্রদর্শিত হবে, অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমুখ্য মানসলোকের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, মৈতিকতা বোধসম্পন্ন যুক্তিশীল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে- এই ছিল রংগলাল সেনের শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। রংগলাল সেন শুধু একজন মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী বা তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি সমাজতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ কর্মীও ছিলেন। তাঁর ধর্মাদর্শ অনুযায়ী শুধু উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে ধর্মচর্চাকে সীমিত না রেখে ব্যক্তিজীবনে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, অহিংসা ও পরার্থপরতার মাধ্যমে মানবসমাজকে অধিকতর সুন্দর করে তোলার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। ভাল মানুষ অর্থ শিক্ষক হিসেবে ভাল নন, অথবা ভাল শিক্ষক অর্থ মানুষ হিসেবে ভাল নন, রংগলাল সেনের কাছে এসব ছিল নিতান্তই অকল্পনীয় বিষয়। সকলের প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল- সবকিছুর আগে ভাল মানুষ হতে হবে। প্রকৃত

* গবেষক, রিসার্চ ইনশিয়োটিভস বাংলাদেশ ও মানবাধিকার কর্মী।
E-mail: bc_sutradhar@yahoo.com

শিক্ষায় সুসমৃদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এক ও অভিন্ন আদর্শ বুকে ধারণ করেছেন। তাইতো দল-মত নির্বিশেষে পরিচিতজন মাত্রই তাঁর প্রতি সর্বদা শুদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন। রংগলাল সেনের অর্জিত শিক্ষা ও শিক্ষার প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করে তাঁকে একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী, সমতাবাদী শিক্ষাবিদ ও নৈতিকতাবাদী মানবপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের অধিকারী রংগলাল সেন জীবনে এমন সব মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের আদর্শ এমনভাবে লালন করেন, যাতে করে তাঁর আদর্শেরখায় কথনো ছেদ পড়েন। সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষা প্রত্যয়টির অনুসন্ধান করলেও ড. সেনের ব্যক্তিত্বের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করা যায়। বক্ষ্যমান ক্ষুদ্র নিবন্ধে ব্যক্তি রংগলাল সেনের প্রতিষ্ঠানসম হয়ে ওঠা এবং এর পেছনে ত্রিয়াশীল অনুঘটকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও এতে শিক্ষার প্রয়োগ, তাঁর আদর্শিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পটভূমি হিসেবে থাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব, আদর্শের পরম্পরা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Abstract

Dr. Rangalal Sen (1933-2014) was known in the country and abroad as a professor. After completing his education from Dhaka University, he first joined the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) as a lecturer in 1964. In the next year, he moved to the Department of Sociology of Dhaka University in the same position. His career began in 1953 as a primary school teacher. Apart from teaching, he was actively associated with several socio-political organizations and learned societies, including: Dhaka University Teachers' Association, Dhaka University Senate, Bangladesh College-University Teachers' Association, Bangladesh Sociological Association, Expatriate Bangladesh Government, Bangladesh Itihas Parishad, Bangla Academy, Bangladesh Asiatic Society, Communist Party of Bangladesh, Bangabandhu Parishad, Sher-e-Bangla Smriti Parishad etc. Moreover, he became a syndicate member of many universities at many times on the nomination of the Chancellor. In June 2011 the Government of the People's Republic of Bangladesh awarded Rangalal Sen in the unique status of National Professor. This distinguished professor passed away on February 10, 2014. Even though Dr. Rangalal Sen passed away, some of his sociologically valuable works will survive him. By acquiring education, human qualities will be fully developed in a person, where there will be no violence and strife, mutual kindness will be displayed among people, the active presence of non-communal and democratic mind will be ensured, a rational social system with moral sense will be established - this was Rangalal Sen's philosophy of education. Rangalal Sen was not only a Marxist sociologist or theorist but also a dedicated worker of socialism. According to his philosophy, the true meaning of life lies in making the human society more beautiful through honesty, justice, non-violence and altruism in personal life without limiting

religious practice to worship and fasting. A good person but not good as a teacher, or a good teacher but not good as a person-these were completely unthinkable things for Rangalal Sen. His advice to everyone was to be a good person first. Enriched with real education, he has always kept one and the same ideal in his heart. Therefore, regardless of the party and opinion, only those who know him were and are always respectful to him. Rangalal Sen can be termed as a humanistic sociologist, egalitarian educationist and moralistic philanthropist considering the education achieved by him and its practical aspects. Rangalal Sen, who was blessed with good fortune, got close to such great persons in his life and cherished their ideals in such a way that his line of ideals never crossed., Dr. Sen's personality formation can be well understood in the light of sociological judgement of education. This short article attempts to explore the institutionalization of Rangalal Sen and the catalysts behind it. For this purpose, Rangalal Sen's educational life, career and application of education in it, influence of institutional and non-institutional education as a background for the formation of his ideal personality, reciprocity of ideals etc. are discussed.)

“প্রত্যেক মানবাত্মার জ্ঞানার্জন ক্ষমতা ছাড়াও এমন সব ইন্দ্রিয় থাকে যার সাহায্যে সত্যের রূপ দর্শন করতে পারে”^১

১. ভূমিকা

সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ পদে পদে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধানে কোন সুসংবন্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানের উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু মানুষ দমে যায় নি- তার যা কিছু সম্বল ছিল তা নিয়েই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেছে এবং দেরীতে হলেও সফল হয়েছে বলেই মানুষ আজ বিজ্ঞানের জগতে উপনীত হতে পেরেছে। কারণ, মানুষ নিয়তই সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীলতার অদম্য অভিলাষের বদৌলতে মানুষ জলে, ঝলে ও অন্তরীক্ষে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। যেখানে যে সত্য লুকায়িত রয়েছে, যথাযথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা উদঘাটিত করে চলেছে। এখানেই মানুষ ক্ষান্ত নয়, আত্মসাদে বিভোর নয়; বরং উদঘাটিত সত্যকে বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে, পেছনের যত ঘটনা টেনে টেনে বের করেছে। এভাবে সৃষ্টি লাভ করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা। আবার সকল শাখা-প্রশাখা প্রবল বেগে ছুটে চলেছে এক অভিন্ন গন্তব্যের পানে- অখণ্ড সত্যের অভিমুখে। অর্থাৎ এসব শাখা-প্রশাখা জ্ঞানসমুদ্রে আত্মবিসর্জন দিতে পারলেই সার্থকতা লাভ করে। জ্ঞান নিয়তই সত্যাশ্রয়ী- সত্যের সাথে সম্পর্কহীন কোন কিছুকেই প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না; আর সত্য যেহেতু অখণ্ড, তাই সত্যের কোন ভেতর-বাইর, কমতি-বাড়তি নেই- এগুলো মানব-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘূরপাক খেতে থাকে। কবি ও বিজ্ঞানীর বিচরণক্ষেত্রে ও অনুসন্ধান পদ্ধতি ভিন্নতর হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্য এক, এই বিবেচনায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এ বিষয়ে একটি চমৎকার কথা বলেছেনঃ “কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য

প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি অনিবচনীয় একের সঙ্গানে বাহির হইয়াছে।”^১

এসব শাস্ত্রের অন্যতম শাখা সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয়ে সত্যস্মাত হওয়ার মানসে একরৈখিক জীবনচর্যা প্রতিষ্ঠার দুর্মূল্য সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী মহান ব্যক্তিদের মধ্যে আজকের আলোচ্য জাতীয় অধ্যাপক রংগলাল সেন (১৯৩৩-২০১৪) মহোদয় অন্যতম। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে রেখে গেছেন হিমালয়সম সুদৃঢ় আদর্শিক চেতনার এক সুবিশাল নিশানা। অধীত ও অর্জিত শিক্ষায় সুসমৃদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এক ও অভিন্ন আদর্শ বুকে ধারণ করেছেন। তাইতো দল-মত নির্বিশেষে পরিচিতজন মাত্রই তাঁর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ও আছেন। বক্ষ্যমান ক্ষুদ্র নিবন্ধে ব্যক্তি রংগলাল সেনের প্রতিষ্ঠানসম হয়ে ওঠা এবং এর পেছনে ক্রিয়াশীল অনুযাটকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। এ উদ্দেশ্যে রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও এতে শিক্ষার প্রয়োগ, তাঁর আদর্শিক ব্যক্তিত্ব গঠনের পটভূমি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব, আদর্শের পরম্পরা প্রভৃতি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর, জ্ঞানশাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা প্রত্যয়টিকে কিভাবে বিবেচনা করে, তাও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে। বিনীতভাবে বলে রাখা আবশ্যক যে, অধ্যাপক ড. সেন শুধু আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন পিতৃসম অমীয় দায়িত্বশীল একজন অভিভাবকও; তাই নিবন্ধের নানা স্থানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এমনকি আবেগেরও প্রয়োগ ঘটতে পারে।

২. রংগলাল সেন

অধ্যাপক রংগলাল সেন ১৯৩৩ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কোন এক শুভক্ষণে মৌলভীবাজার সদর উপজেলাধীন ৩ নং কামালপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের অস্তর্গত ত্রৈলোক্যবিজয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদণ্ড নাম মনোমোহন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের মত তিনিও খেলাধুলা, দৌড়ৰাঁপ থেকে শুরু করে ক্ষেত্রে মাঠে খাবার নিয়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে গৃহপালিত প্রাণীদের পরিচর্যা- সব কিছুই করতেন। “সারা কার্তিক মাস ব্যাপী শেষ রাতে সনাতন ধর্মাবলম্বী পাশের বাড়ীগুলোতে ‘মঙ্গলা কীর্তন’ চলত, যা খুব ভোর বেলায়ই শেষ হয়ে যেত। কীর্তনের শব্দে ঘূম ভেঙ্গে যেত। ঘুম থেকে ওঠে অন্ধকারের মধ্যেই সঙ্গীসাথী মিলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতাম। সে প্রসাদের সুস্থান ও কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি আজও যেন মনে সজীব হয়ে আছে”- অত্যন্ত আবেগভরা কর্তৃত তিনি বাল্যকালের স্মৃতি রোমাঞ্ছন করতেন।

বর্তমানে কর্মসূত্রে ও লেখাপড়ায় প্রায় সবাই বাড়ীর বাইরে বসবাস করছেন। জেলা শহর থেকে ৯-১০ কিলোমিটার উত্তরের এ গ্রামটি খরপ্রোতা মনু নদীর তীরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। মনু নদীর ওপর স্থাপিত সেতুটি একেবারে সেন পরিবারের বাড়ীর লাগোয়া, ‘নতুন ব্রীজ’ নামে এখানে বাস স্টেপসহ বিশাল বাজার জমে উঠেছে। জমিজমা কেনাবেচো বিদ্যা (স্থানীয়ভাবে ‘কিয়ার’ নামে প্রচলিত, যা ৩০ শতাংশের সমান)-র পরিবর্তে শতাংশে এসে পৌছেছে। প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা বলে দামও আকাশচূম্বী। কৃষিজীবী হিসেবে সেন পরিবারের একদা বেশ জমিজমা ছিল, বিভিন্ন কারণে এর সবটুকু ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

২.ক. শিক্ষাজীবন

রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৪০ সনে স্থানীয় বাসুদেবশ্রী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির মাধ্যমে। ১৯৪৬ সনে ‘মিডল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট’ পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সনে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে

ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে সিলেট প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসিটিউট থেকে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন, যেখানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের চৌদশত প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সনে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে মৌলভীবাজার মহাবিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে আই এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯-১৯৬৩ সনের মধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সমান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। উল্লেখ্য, তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগে সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণী অর্জনকারী মেধাবী ছাত্র। ১৯৭৩-১৯৭৭ সময়কালে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে এম এ ও পরে পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

২.খ. কর্মজীবন

রংগলাল সেনের শিক্ষাজীবনের গতি-প্রকৃতি দেখলে যে কারোরই মনে প্রশ়ংসন উদ্বেক হতে পারে- একজন মেধাবী ছাত্রের পাসের সনে এত ব্যবধান কেন? ১৯৫৩ সনে স্থানীয় বাসুদেবংগী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে রংগলাল সেনের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর গৃহশিক্ষক ও ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী নরেশ চন্দ্র দাস মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁকে এখানে নিযুক্ত হতে উৎসাহিত করেন। একটি বৃহৎ পরিবারের ভৱণ-পোষণ ও সকল সঙ্গনের লেখাপড়ার ব্যয়ভার চালিয়ে যাওয়া কৃষিজীবী পরিবারের কর্তা বাবার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বিষয়টি অনুধাবন করে বাবা-মাকে রাজী করিয়ে তিনি শিক্ষকতায় যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি মৌলভীবাজার জেলার বেশ কাঁচি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর সর্বশেষ কর্মসূল ছিল জেলা শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত শ্যামরায়ের বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগ দেন, ১৯৬৪ সনে। শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষকতার পেশা। পরের বছর একই পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে চলে আসেন। বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রায় প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র ও পরে শিক্ষক হয়ে তিনি বাংলাদেশে উক্ত জ্ঞানশাখার বিকাশ ও বিস্তারে বিশাল অবদান রাখেন। সরদার ফজলুল করিম অধ্যাপক ড. হরিদাস ভট্টাচার্যকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের 'সংগঠক'ও হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞান ও রংগলাল সেন সম্পর্কে ঠিক একই কথা খাটে। পদোন্নতি পেয়ে পেয়ে শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পদ অধ্যাপকের দায়িত্বে উন্নীত হয়ে কর্মজীবনের সমাপ্তি টানেন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রশাসনিক দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও বিদ্যুৎ সমাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বংগবন্ধু পরিষদ, শের-এ-বাংলা স্মৃতি পরিষদ, জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি। তাছাড়া, তিনি চ্যাম্পেলরের মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঞ্চিকেট সদস্য হন।

২০১১ সনের ১৪ জুন আরোও চারজন গুণী ব্যক্তির সাথে ড. রংগলাল সেনকে জাতীয় অধ্যাপকের অনন্য মর্যাদা দান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এ উপলক্ষ্যে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন; স্মারক-পত্রে বলা হয়:

“শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার স্নেহিন্দু প্রসন্নতাময় নৈষ্ঠিক অধ্যাপনা কিংবদন্তিতুল্য। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষক-নেতা ও শিক্ষা-প্রশাসক রূপে আপনার অবদান এবং স্বদেশ ও মানবিকতার প্রতি দায়বদ্ধতার সীকৃতিস্বরূপ জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত্ত হওয়ার বিরল সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় আপনার জন্য আমরা গর্বিত”।^৪

ড. রংগলাল সেন পরলোকগত হলেও তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মূল্যবান কতিপয় গ্রন্থ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখিবে। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্রন্থ রচনায় তাঁর সমকক্ষ আর কেউ আছেন কিনা, জানা নেই। তাঁর ২৩টি গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হল: Middle Class, Elites, Civil Society and Other Essays- 2 vols. (2011), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান (সম্পাদনা-যৌথ) (২০০৯), পরিবর্তনশীল সমাজ: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (এ কে নাজমুল করিম) অনুবাদ-যৌথ (২০০৮), প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান (যৌথ) (২০০৩), সিভিল সোসাইটি (২০০৩), সমাজবিজ্ঞান (স্যামুয়েল কোনিগ) অনুবাদ (২০০২), বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩), মানুষের সমাজ (জর্জ সিস্পসন) অনুবাদ (২০০০), সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র (১৯৯৭), Political Elites in Bangladesh (1986), ড. জ্যোতির্ময় গুহ্ঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা-যৌথ) (১৯৮৬), বাসন্তিকা-জগন্নাথ হল বার্ষিকী হীরক জয়ষ্ঠী সংখ্যা (১৯৮৫), বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস (১৯৮৫), ড. নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদনা-যৌথ) (১৯৮৪) প্রভৃতি। দেশী-বিদেশী গবেষণা জার্নালে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তাঁর আরোও বেশ কিছু লেখালেখি ও প্রকাশনার পরিকল্পনা ছিল, শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তা আর হয়ে ওঠেনি।

২.গ. বার্ধক্য জীবন ও মৃত্যু

চল্লিশ বছর বয়সের দিকে ড. সেনের ডায়াবেটিক রোগ ধরা পড়ে। তখন থেকেই তিনি স্বাস্থ্য ও শরীরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে ওঠেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, প্রাতঃভ্রমণ, স্নান থেকে শুরু করে সকল নিয়ন্ত্রণ তিনি কাঁটায় কাঁটায় সময় মেনে পরিচালনা করতেন। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী নয় এমন খাবার তিনি কারো অনুরোধে গ্রহণ করতেন না। একবার তাঁর সাথে গিয়েছিলাম নিরঞ্জন অধিকারী (অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্যারের বাসায়। কুশলাদি বিনিময় পর্বেই তিনি বলে ফেলেন, ‘আমাকে খাবারের কিছু দেবেন না, যদি নিতান্তই দিতে চান তাহলে শুধু এক কাপ দুধ দেবেন’। যার ফলে তিনি ক্ষণে ক্ষণে রোগাক্রান্ত হতেন না। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি তাঁকে দুঁবার শ্রেষ্ঠ নিয়মনিষ্ঠ রোগী হিসেবে পুরস্কৃত করে। ২০১২ সনের প্রথমদিক থেকে তিনি প্রায়শঃই অসুস্থতা বোধ করতেন। মাঝে মাঝে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হত। স্বয়ার হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় উন্নত চিকিৎসা ও সেবার কথা বিবেচনা করে তাঁকে তাঁর বড় মেয়ে পাপড়িদি (ডাঃ সূচনা সেন) তাঁদের চট্টগ্রামের বাসায় স্থানান্তরিত করেন। জীবনের শেষ দু'মাস তিনি চট্টগ্রামের সার্জিক্সোপ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ২০১৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী দেশবরেণ্য এই জাতীয় অধ্যাপকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তবে সমাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য হিসেবে ‘সামাজিক ব্যবস্থা ও আদর্শের ভিত্তির বিশ্লেষণ’^৫-কে তিনি যথাযোগ্যভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

৩. রংগলাল সেনের জীবনাদর্শ

শিক্ষক ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনকালে ড. রংগলাল সেনের একটি অনন্যসাধারণ পরিচিতি ছিল; আর, তা হচ্ছে ভাল মানুষ’ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি। জীবনের প্রতিটি কর্ম ও মুহূর্তকে তিনি নিষ্কল্প রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা এবারে তার আদর্শিক জীবনচর্যার প্রধান কাঁটি দিক অনুসন্ধান করব, যাতে করে ব্যক্তি রংগলাল সেনের জীবনের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

৩.ক. শিক্ষাদর্শ

শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে, যেখানে কোন প্রকার হিংসা ও হানাহানি থাকবে না, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সদাচার প্রদর্শিত হবে, অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমুখ্যে মানসলোকের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, নেতৃত্বতা বোধসম্পন্ন যুক্তিশীল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে - এই ছিল রংগলাল সেনের শিক্ষাদর্শের মূল কথা। “সঙ্গে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না”^৬-বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের এই অমূল্য বাণীতে তাঁর ছিল অগাধ ভরসা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি সমাবর্তনে উপাচার্য স্যার আহমেদ ফজলুর রহমান (এ এফ রহমান) এ বিষয়ে যে অতীব মূল্যবান অভিভাবণ প্রদান করেন, সেগুলোর অংশবিশেষ রংগলাল সেন তাঁর এক লেখায় স্বত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন:

“.. there is a gulf between the intelligentsia and the masses. You have to bridge that gulf. All your education would be purposeless if you do not carry back with you to your homes the atmosphere of your University- the spirit of comradeship rather than communal isolation, clean living, clean thinking and the steady adherence to the ideals of social service.” (*12th Convocation, 16th August, 1934*)^৭

“You have also to possess the ability to win the confidence and goodwill of the people among whom you live and work... In that sense politics may be said to be a branch of the art of getting on with other people... the underlying ideas of politics should be stated to be free from prejudice and outworn terminology...The duty of all of us is first of all to put ourselves right and then help democracy. True democracy is not an external government but an inward rule. The democracy of the heart has to be developed before we get democracy fulfilled in practice.” (*14th Convocation, 29th July, 1936*)^৮

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ স্যার এ এফ রহমান (১৮৮৯-১৯৪৫) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় উপাচার্য ও দেশীয় তথা বাঙালীদের মধ্যে প্রথম।

সুতরাং বুবাই যাচ্ছে যে, একজন শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রথমে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রী করে গড়ে তুলতে হবে এবং পরবর্তীতে সে গুণগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেবে। এহেন মননশীলতা মখন গোটা সমাজে প্রবাহিত হবে অবারিতভাবে, তখনই উন্মোচিত হবে সামাজিক সংহতি তথা শান্তি-শৃংখলার সিংহদ্বার। অধ্যাপক সেন শুধু এসব কথা লিখেছেন বা উদ্ধৃত করেছেন এমন নয়, আজীবন সে আদর্শিক চেতনা সনিষ্ঠভাবে লালন করেছেন। শিক্ষকতা, রাজনীতি, প্রশাসন, অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব প্রভৃতি যখন যে অধিক্ষেত্রে কর্ম পরিচালনা করেছেন, কোথাও তিনি তাঁর অর্জিত চেতনা থেকে সরে যান নি।

৩.খ. রাজনৈতিক আদর্শ

রংগলাল সেন শুধু একজন মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী বা তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি এর একনিষ্ঠ কর্মীও ছিলেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। বাংলার ইতিহাসের বিখ্যাত বাষটির এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ঐ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি কমরেড মো: ফরহাদসহ অনেক নেতার সাথে সুপরিচিত হন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৬৩ সনে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের চার মূলনীতি তথা বাস্তালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র- এর প্রতি ছিল তাঁর অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধা।

মানব সভ্যতার আদি গুরু এরিস্টটল মানুষকে সামাজিক জীব বলে যে আখ্যা দেন, ড. সেন কার্ল মার্ক্সের চিন্তা মোগ করে একে আরোও এগিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন; অর্থাৎ, মানুষ শুধু সামাজিক জীব নয়, রাজনৈতিক জীবও। রাজনৈতিক চেতনা ব্যতিরেকে একজন মানুষের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানের বিদ্যম্ভ গবেষক ড. সেনের রাজনৈতিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘সকল মানুষ’। আধুনিক উন্নয়নতত্ত্বে ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ (no one left behind) বলে যে ধরনি সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, তা তাঁর রাজনৈতিক সমাজমানসে বহু আগে থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল।

অগণতান্ত্রিক ও স্বার্থবাদী সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং এর পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সমাজে উচ্চ-নীচ নানা শ্রেণী জন্ম লাভ করে। উচ্চ শ্রেণীর লোকজন অধিকতর মাত্রায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। রংগলাল সেনের অনেক লেখায় বিষয়টি সুল্পষ্টভাবে ঘৰ্তে এসেছে। তাঁর সুপরিচিত ও পাঠকনন্দিত গ্রন্থ ‘বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস’-এ উক্ত বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গ্রন্থটির শুরুতে সামাজিক স্তরবিন্যাস, অসমতা ও সচলতার প্রত্যয়গত ধারণা ও প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরে একাদিক্রমে বাংলাদেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাক-মুসলিম, মুসলিম, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশে উক্ত প্রত্যয়টির বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থের উপসংহারে এসে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোকে বাংলাদেশের জনসমষ্টির তিনটি স্তর নিরূপণ করে যে মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন তা সকল স্তরের গবেষক ও চিন্তাবিদের জন্য অবশ্য পঠিতব্য বলে আমার মনে হয়: “বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন নিম্নস্তরে, শতকরা ৮ জন মধ্যস্তরে ও শতকরা ৫ জন উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। বর্তমান বাংলাদেশে যে অর্থনীতি, শিল্পনীতি, ভূমিনীতি ও উন্নয়ন-কৌশল চালু আছে তার মাধ্যমে মাত্র ঐ ৫ ভাগ লোকই উপকৃত হচ্ছে।অতএব বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে যারা সত্যিকার আগ্রহী তাদেরকে অবশ্যই উক্ত সামাজিক স্তরবিন্যাসের বাস্তব চিত্র বিবেচনায় রেখে এমন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে, যার ফলে ঐ ধরনের বৈষম্যমূলক সমাজ- ব্যবস্থার চিরতরে অবসান ঘটে এবং এর পরিবর্তে একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই রাজনীতির সাথে উন্নয়ন পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান।”^{১০}

৩.গ. ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ

“ধর্ম সামাজিক সংহতির চূড়ান্ত সূত্র। সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের অভিন্ন অধিকার যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।.. ধর্ম হচ্ছে এসব মূল্যবোধের ভিত্তিস্থরণ। ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, কখনও তারা মিথ্যা কথা বলবে না, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা অক্ষুণ্ন থাকবে, মানুষ সৎ ও ধর্মপ্রাণ হবে- এসব মূল্যবোধ সামাজিক সংহতি সংরক্ষণের সহায়ক।.. ধর্ম মানুষের ইহজাগতিক ব্যর্থতার পরিবর্তে ভাল কাজ করার মাধ্যমে স্বর্গলাভে আশ্বস্ত করে”^{১১}- অতিশয় সহজ-সরল কথার মাধ্যমে রংগলাল সেন তাঁর ধর্মানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি ইহজগত ও

পরজগতের মধ্যে ধর্মের সুমসৃণ মৈত্রীসেতু নির্মাণে প্রয়াসী ছিলেন। ইহজগতে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদেশ, ক্রোধ, পরমতে অসহিষ্ণুতা ও আত্মার্থ সিদ্ধির সামাজিক স্তরবিন্যাসপ্রসূত বৈষম্য তথা রক্তারকি হানাহানি অব্যাহত থাকবে আর পরজগতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে- তিনি এ ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল- মানুষে মানুষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসা ব্যতীত সমাজে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা আসতে পারে না, তেমনি পরজগতে স্রষ্টার সামুদ্ধ্য লাভ করাও সম্ভব হবে না। ইংরেজ কবি উইলিয়াম রেক (১৭৫৭-১৮২৭) যেমনটা বলেছিলেন,

“For all must love the human form
In heathen, Turk or Jew,
Where mercy peace and pity dwell
There God is dwelling too”.^{১২}

বুবা যায়, রংগলাল সেনের এহেন ধারণা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তাঁর অবীত ও অধ্যাপনীয় শান্ত সমাজবিজ্ঞানের এক বিরাট অনুপ্রেরণা। তাঁর ধর্ম ও নেতৃত্বকা সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় অগাস্ট কোঁত, কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্ফীম, ম্যাক্স উয়েবার, রাজা রামমোহন রায়, সঁশুর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, আমী বিবেকানন্দ প্রমুখ সমাজ-দাশনিকের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর, পিতা-মাতা সহ শিক্ষকদের প্রভাব তো ছিলই। শুধু উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে ধর্মচর্চাকে সীমিত না রেখে ব্যক্তিজীবনে সততা, ন্যায়প্রায়ণতা, অহিংসা ও পরার্থপরতার মাধ্যমে মানবসমাজকে অধিকতর সুন্দর করে তোলার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। শুধু ইহজগত-পরজগত নয়, তিনি ধর্মানুশীলনের প্রাচ্য-প্রতীচ্যেরও সময়ে বিশ্বাসী ছিলেন। শান্তি-শৃঙ্খলা মূলত একটি নির্ভরশীল চলক, এটি এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না, প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণমূলক আন্তরিক সহযোগিতা। সমাজে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চায় রংগলাল সেনকে ততটা তৎপর হতে দেখা যায়নি। কিন্তু ধর্মাদর্শের বর্ণিত মৌল উপাদান-সমৃদ্ধ জীবন পরিচালনায় তিনি কঠোর অধ্যবসায়ী ছিলেন। নানা কর্মকাণ্ড, আচরণ তথা লেখালেখিতে তিনি ইল্পাতসম নেতৃত্বাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। ধর্মীয় সভা-সমাবেশেও তিনি একই আদর্শের জয়ধ্বনির কথা বলেছেন।

৩.৮. মানবতা ও মানবাধিকার

মানুষকে বৈষম্যহীনভাবে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে তার মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা মানবতা কিংবা মানবাধিকারের প্রথম শর্ত। আমার উপলক্ষ মতে অধ্যাপক সেন সে শর্ত পূরণ করে আরোও বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ আমি নিজে অবাক বিশ্বায়ে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। গৃহকর্মী, রিকশা ও ভ্যানচালক থেকে শুরু করে জুতার কারিগর- সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তাদের সাথে তিনি সুযোগ পেলেই রীতিমত আড়ডা জমিয়ে বসতেন। নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জবাব নিতেন। পরে বলতেন, ‘দেখেছ, সাধারণ মানুষরা কত গভীরভাবে ভাবতে জানে!’

‘জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ও মানবাধিকার আন্দোলনের ধারা’ প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ‘আফিকা’ কবিতা থেকে যে উদ্ধৃতি টেনেছেন, অধিকার বষ্ঠিত জনগোষ্ঠী ও একইসাথে অধিকার লুঠনকারীদের সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বুঝে নিতে কোনরূপ সমস্যার অবকাশ থাকে না:

হায় ছায়াবৃত্তা
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ

উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে ।
 এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
 নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
 এল মানুষ ধরার দল ।
 গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে ।
 সভ্যের বর্বর লোড
 নাখ করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা ।
 তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাঞ্পাকুল অরণ্যপথে
 পক্ষিল হল ধুলি তোমার রক্তে অশ্বতে মিশে,
 দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
 বীভৎস কাদার পিণ্ড
 চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ।¹³

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক যত বেশী মাত্রায় ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ হবে, উন্নয়নের সুফল তত বেশী মাত্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে। জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিচালিত সমাপ্তকৃত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (*Millennium Development Goals-MDGs*)¹⁴ ও চলমান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (*Sustainable Development Goals- SDGs*)¹⁵ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদর্থক ফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চিন্তা ও কর্মের কথাই সুক্ষ বিচারে ধৰা পড়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রংগলাল সেন সমাজের সকল মানুষের মধ্যে যুগপৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা অবলোকনে প্রয়াসী ছিলেন। অধিকার মূলত একটি আইনী প্রত্যয়, যা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত। নাগরিক যদি রাষ্ট্রে তার অধিকার সম্পর্কে জানতে না পারে তাহলে একদিকে সে তার পিছিয়ে পড়া (নাকি দেওয়া) অবস্থান থেকে ওঠে আসার সুযোগ পায় না; অপরদিকে রাষ্ট্রে তার কর্তব্যও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। ড. সেন চূড়ান্তভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকজনের মধ্যে মাঝীয় ‘বিচ্ছিন্নতা’ (*alienation*)-র সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিকে ‘বাস্তব ব্যক্তি’¹⁶ হিসেবে আত্মকাশের নির্দেশনা দেন। অধ্যাপক আনিসুর রহমানের কথায় এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই: “যদি কোনদিন গ্রামীণ শ্রমজীবীদের নেতৃত্বে দেশে একটি ইতিবাচক গতিশীলতা আসে। তবে এই গতিশীলতা তার নিজস্ব গণতন্ত্রও রচনা করবে।”¹⁷ তখন ‘অধিকার’ ‘অধিকার’ বলে এত শোরগোলেরও প্রয়োজন হবে না।

৪. আদর্শের সূত্র-সমন্বয় ও বিতরণ পদ্ধতি

শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিকতা, মানবাধিকার প্রভৃতি আদর্শিক অধিক্ষেত্রে অধ্যাপক রংগলাল সেনের অবস্থান নিয়ে আমরা যে আলোচনা করে এলাম, তাতে এক চমৎকার সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রক্রতিপক্ষে যেকোন মহাপ্রাণের জীবনালেখ্য পুরোনুপূর্জভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এ সত্যটুকুই নিঃশেষে পেয়ে থাকি।

৪.ক. আদর্শের সূত্র-সমন্বয়

রংগলাল সেনের আদর্শিক জীবনের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সকল আদর্শই একটি সরলরেখায় মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি-সর্বত্রই তাঁকে পাওয়া যায় একজন কঠোর নীতিসাধক হিসেবে। আদর্শের প্রশংসন কখনো কোন ছাঢ় তিনি দেন নি, যার কেন্দ্রস্থলে সমাসীন ছিল সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। তিনি বলতেন, একজন ভাল মানুষই হতে পারে ভাল শিক্ষক, ভাল রাজনীতিক, ভাল ব্যবসায়ী, ভাল বাবা,

ভাল মা, ভাল স্বামী, ভাল স্ত্রী ইত্যাদি। ভাল মানুষ অথচ শিক্ষক হিসেবে ভাল নন, অথবা ভাল শিক্ষক অথচ মানুষ হিসেবে ভাল নন, রংগলাল সেনের কাছে এসব ছিল নিতান্তই অকল্পনীয় বিষয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ তৎপরতা ও সংগ্রামে আজ সর্বএই মহা আয়োজন দেখা যাচ্ছে। দেশের গণতন্ত্র, জাতির গণতন্ত্র, দলের গণতন্ত্র-, গোষ্ঠীর গণতন্ত্র- এসব বিভিন্ন আন্তরণে গণতন্ত্রকে চিত্রিত করে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা বিশেষত রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখ্যরিত করে রেখেছে। কিন্তু গণতন্ত্র আবাদের মূল ক্ষেত্র যে ব্যক্তিমানস, মাটি নয়, ভৌগোলিক কোন এলাকা নয়, একথা আমরা অনেকেই অনেক সময় ভুলে যাই। ধর্মচার্চার ক্ষেত্রেও এ কথাটি সম্ভবে প্রযোজ্য। পঙ্গিত রাধাকৃষ্ণনের মতে, “We must cultivate democracy as a state of mind, a style of life. A world brotherhood can be born only by the achievement of community with ourselves. Here is the task for religion.”¹⁸ আসলে মানবাচরণের সকল ক্ষেত্রেই মনন্ত্বের বিরাট সংযোগ রয়েছে। এ সংযোগের কার্যকরিতা উপলব্ধি ও প্রয়োগে যে যত বেশী সফল, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা তার তত বেশী। রংগলাল সেন এ বিবেচনায় একজন সফল ব্যক্তি ছিলেন।

অধ্যাপক সেনের রাজনৈতিক সমালোচনার প্রকাশ ছিল এমন যে সমালোচিত ব্যক্তিটি পাশে বসে থাকলেও রাগ করতে পারতেন না। তাঁর অসাধারণ উপস্থাপন ক্ষমতা ও তথ্যের অবতারণার কাছে যে কাউকে হার মানতে হত। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে তিনি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের নাম তত্ত্বের আশ্রয় নিতেন। আবার কখনো কখনো অন্যের যুক্তিও মেনে নিতেন- পরমতের প্রতি শ্রদ্ধায় সমন্ব্য গণতান্ত্রিক মানসিকতার এ এক অপূর্ব প্রকাশ।

জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে অধ্যাপনা ব্যতীত আর কোন উৎস তাঁর ছিল না। বিভিন্ন মহল থেকে আয়ের বিভিন্ন উৎসের প্রলোভনও তিনি পেয়েছিলেন, যা তিনি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। যুক্তরাজ্যে পি-এইচ ডি অধ্যয়নকালে এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের শিলং-এ স্থাপিত যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ক অফিসে তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন শেষে অনেকে তাঁকে দেশে না ফেরার পরামর্শ দেন। অধ্যাপক সেন দেশমাত্কার টানে এসব পরামর্শও প্রত্যাখ্যান করে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত স্থাপন করেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা তাঁকে কখনো হতোদ্যম করে নি, চলার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের হিন্দু সমাজের জাতিবর্গ ব্যবস্থাকে তিনি অবাস্তব, অপরিগামদশী ও সমাজের জন্য আত্মাতী বলে অভিহিত করতেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলাপচারিতায় তাঁর এ সংক্রান্ত শক্ত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি এর বাস্তব প্রমাণও রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর সত্তানদের আন্তর্ভুক্ত বিয়ে সম্পাদনের মাধ্যমে। তাঁর নিজের বেলায়ও একই বিষয় ঘটেছিল। কতটুকু উদার মনের অধিকারী হলে তা সম্ভব, তা ভাবতেও অবাক লাগে। আমার নিজের বিয়ের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে স্বর্বর্গ ত্যাগ না করার পক্ষে মত পোষণ করায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের প্রতি ড. সেনের ভালবাসার ছিল এক নিরন্তর টান। এসব সাধারণ মানুষ যারা মূলগতভাবে সমাজের গঠন প্রক্রিয়ার নেপথ্য কুশীলব, তারা কদাচিং কোন আলোচনায় স্থান পায়। এ কে নাজমুল করিম চলমান ইতিহাস চর্চায় সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞার সমালোচনা করে সমাজ গবেষকদের এ কাজে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তাঁর ভাষায়, “.. a great wealth of materials about Indian history was discovered, but in such detailed ‘stories of kings, courts and conquests’, the social history of the people was practically lost. The sociologist of today can fruitfully utilize these materials for building up a real social

history of India and Pakistan.”^{১৯} শিক্ষকের এহেন নির্দেশনা রংগলাল সেন মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাইতো সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি প্রধানত: ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ ও মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া-সঙ্গত সমাজকাঠামো। সুবিখ্যাত সামাজিক ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব ‘ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস’^{২০} নামে যে ৪ খণ্ডের গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন, তা এহেন প্রচেষ্টার এক জ্বাঙ্গল্যমান দৃষ্টান্ত।

৪.৬. আদর্শের বিতরণ পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার ফিলিপ জোসেফ হারটগ (১৮৬৪-১৯৪৭) শিক্ষার দুটি দিক অবলোকন করেন; যথা- বিদ্যায়তন্ত্রিক (education for technical efficiency) ও সাংস্কৃতিক (education for culture)। তিনি মনে করেন যে, একজন ব্যক্তির সামাজিক উপযুক্তা বিনির্মাণে এ দুইরের ভূমিকা সম্ভাবনে দ্বিয়াশীল।^{২১} আমরা এ দুটি দিককে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকরূপে ধরে নিয়ে বলতে পারি যে, শিক্ষার্থী তার অধীত শাস্ত্র থেকে অর্জিত জ্ঞান এবং সমাজে এর সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর শিক্ষার্থী ও সমাজ উভয়ের লাভালাভ নির্ভরশীল। রংগলাল সেনের শিক্ষার্জন ও বিতরণে উপাচার্য মহোদয়ের মূল্যবান উপলক্ষ্মীটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।

‘শিক্ষকও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিয়ে চলছেন- তার পরীক্ষার মূল বিষয় হল সর্বাদা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলা, যাতে করে শিক্ষার্থীর মেধার সুষ্ঠু মূল্যায়ন সুনিশ্চিত হতে পারে’- কথাটি সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম প্রায়শই উচ্চারণ করতেন বলে আমাকে জানান রংগলাল সেন। শিক্ষকের নির্দেশিত আদর্শটি ড. সেন আতঙ্ক করতে পেরেছিলেন বলেই সকল মহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল উৎবন্ধন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী- সকল স্তরেই নানামুখী সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা রয়েছে এবং এসব সংগঠন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক শক্তি ও আদর্শের সাথে যুক্ত। রংগলাল সেন নিজেও একটি আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তথাপি শিক্ষক হিসেবে তিনি কখনো কোনরূপ আপন-পর বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন নি। অর্থাৎ, কাউকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি কখনো আদর্শের দোলাচলে আবর্তিত হয়ে পড়েন নি। তাঁর কাছে ছাত্রের পরিচয় ছিল শুধুই ছাত্র, সহকর্মী মানে সহকর্মী। তাই দেখেছি, ড. সেনের বিভাগীয় অফিস কক্ষে দল মত নির্বিশেষে সকলের যাতায়াত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রংগলাল সেনের কর্মজীবন ও আমাদের ছাত্রীবনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির ব্যাপারটি ছিল সমসাময়িক। আবেগ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, “উক্ত পরীক্ষার্থীরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমার সক্রিয় কর্মজীবনের সর্বশেষ ব্যাচ। এদের সান্ধিধ্য আমি অপার আনন্দ-অনুভূতির মধ্য দিয়ে উপভোগ করেছি। মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদের বিদায়ের সাথে আমার অবসর জীবনের সূচনা লঞ্চের রয়েছে এক নিগৃত সম্পর্ক।”^{২২} বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটির সুপারিশে পরবর্তী ৫ বছর তিনি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগীয় অফিসে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্রনেতা স্যারের সাথে দেখা করতে আসতেন। আমি এক কোণে বসে থাকতাম। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট প্রভৃতি নানা সংগঠনের নেতাকর্মীদের কাছে তাঁর বার্তা ছিল একই ধরনের:

- সবার আগে ভাল মানুষ হতে হবে
- অন্যকে নিজের মত করে দেখতে হবে
- মানুষের মূল প্রয়োজনগুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে
- মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে সর্বোচ্চ সমরূপতা অক্ষন করতে হবে

- সমাজের সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে
- তবেই যেকোন আদর্শ বা অবস্থান থেকে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করা সম্ভব।

ড. সেনের বিভিন্ন লেখা খুঁজলেও এসব মূল্যবান কথা পাওয়া যাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল দলেই তাল মানুষ আছেন যারা প্রকৃত অর্থেই দেশের কল্যাণে কাজ করছেন। তাই রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয় দিয়ে কাউকে সঠিকভাবে বিচার করা যায় না। বিপরীত আদর্শের কাউকে কাউকেও তিনি ‘তাল মানুষ’ বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, ‘শিক্ষকরা হলেন সমাজ গড়ার কারিগর বা প্রকৌশলী, এখানে কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকলে তা সম্পূর্ণ সমাজকে নেতৃত্বকর্তার দিকে ধাবিত করবে’। মোট কথা, কোন ছাত্রছাত্রী যেন ভুল পথে চলে না যায়, সেদিকে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য থাকলেও ছড়ান্ত লক্ষ্য সুশিক্ষিত ও দেশগ্রেফ্রেনিক ব্যক্তি মাত্রেরই অভিন্নতা রয়েছে; অন্তত থাকা উচিত। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকআইভার এ সম্পর্কে বলেন, “ঐক্যের সন্ধানে অবশ্যে আমরা ব্যক্তির কাছে যেতে পারি। যেখানে অনেক অনেক্য ও দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করে সেখানেও ঐক্য খুঁজে পেতে পারি। এ ঐক্য নিহিত থাকে প্রত্যেকের আত্মসম্পর্কের মধ্যে এবং প্রত্যেকের প্রিয় লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে। আমরা এর সন্ধান পাই আত্মসম্পর্কের মধ্যে নয়, বরং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে। কোন বন্ধন বা চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার মধ্যে নয়; বরং প্রত্যেক মানুষের আত্মসচেতন মননশীলতায়।”^{২৩} এই আত্মসচেতন মননশীলতা সামনে রেখেই শিক্ষা বিতরণে ব্রহ্মী হন ড. সেন।

শ্রেণীকক্ষের পাঠ্যদানেও ড. সেনের অনুরূপ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, তাঁর পাঠ্যদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল; তা হচ্ছে, তিনি অধ্যায়ের প্রবেশের পূর্বেই অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচুর তথ্য, এর শিক্ষণীয় দিকসমূহ এবং বিষয়-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করতেন। ফলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠের বিষয়বস্তু সহজতর হয়ে উঠত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, “ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন, শেষকালে এই অলঙ্গ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রাণীর দ্বারা হয় না”^{২৪}- কথাটি রংগলাল সেনের শিক্ষাদানের মধ্যে স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক মধ্যেও আমি তাঁর একাধিক বক্তৃতা শুনেছি। তিনি উন্নেজিত হতেন না, আক্রমণাত্মক কথা বলতেন না, চলমান সমস্যা উপস্থাপন করে এর সমাধানে করণীয় সম্পর্কে সহজ-সরল ভাষায় পরামর্শযুক্ত কথা বলতেন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনি এসব বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটাতেন, যা শোনার জন্য ভিন্ন সংগঠনের সমর্থকও উপস্থিত হতেন, নীরবে শুনতেন।

৫. আদর্শের পরম্পরা

রংগলাল সেনের আদর্শিক চেতনার ভিত রচনায় প্রতিষ্ঠানসম কংজন ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অবশ্য স্মর্তব্য। সুপ্রসন্ন ভাগ্যের অধিকারী রংগলাল সেন জীবনে এমন সব মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের আদর্শ এমনভাবে গ্রহণ ও ধারণ করেন, যাতে করে তাঁর আদর্শেরখায় কখনো ছেদ পড়েনি। ঐ শ্রদ্ধেয়জনের সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি পরিচিতি তুলে ধরলে আমাদের আলোচনা বাস্তবমূর্তী হয়ে উঠবে; যাদের মধ্যে রয়েছেন বাবা রমন চন্দ্র সেন ও মা গিরিবালা সেন, গৃহশিক্ষক নরেশ চন্দ্র দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে সহকর্মী অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিম, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা এবং সাসেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টম বি বটোমোর (পি-এইচ ডি'র সুপারভাইজার)। উল্লেখ্য,

বর্ণিত গুণী ব্যক্তিবর্গের কথা আমি স্বয়ং অধ্যাপক সেনের কাছেই বার বার শুনেছি। আর, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্যান্য পরিমণ্ডলের কতিপয় মনীষীর প্রভাবও তাঁর ব্যক্তিত্বের ভেতর লক্ষ্য করা যায়। আর, পরবর্তীতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এহেন আদর্শের অবস্থান কেমন রয়েছে, তারও অন্ন আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

৫.ক. বাবা রমন চন্দ্র সেন ও মা গিরিবালা সেন তথা পারিবারিক পরিচয়

রংগলাল সেনের বাবা শ্রী রমন চন্দ্র সেন কর্মজীবন শুরু করেন মোঙ্গার হিসেবে। পারিবারিক দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনায় রেখে এ পেশায় তিনি বেশীদিন থাকতে পারেন নি। গ্রামের বাড়ীর পাশে অবস্থিত আজমনি মাধ্যমিক ইঁরেজী বিদ্যালয় ও আখাইলকুরা মদ্রাসায় পর পর শিক্ষকতা করেন। তিনি দুঁবার স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। মা শ্রী গিরিবালা সেন ছিলেন গৃহিণী। পরিবারের সম্পূর্ণ দেখতাল করার পাশাপাশি ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ও মননশীলতার সুস্থ বিকাশে ছিল তার কঠোর অনুশাসন। ঠিক সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা, স্কুলে যাওয়া-আসা, ঘুমানো ও ঘুম থেকে ঝটা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। তাঁদের ১০ সন্তানের মধ্যে ৪ জন শৈশবেই মারা যান। বাকী ৬ জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রোহিণীকান্ত সেন (প্রয়াত) ছিলেন স্থানীয় মন্মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক; দ্বিতীয় রংগলাল সেন; তৃতীয় ও চতুর্থ ২ বোন, যথাক্রমে সুসঙ্গীনী সেন দেব ও মহামায়া সেন। তাঁরা সুশিক্ষিতা হলেও কোন চাকুরীতে যোগ দেন নি, গৃহিণী হিসেবেই জীবনযাপন করে প্রয়াত হয়েছেন। পঞ্চম বাক্ষিম চন্দ্র সেন (প্রয়াত) ছিলেন নিজ জেলা শহরের নাম করা চিকিৎসক (এমবিবিএস); কনিষ্ঠ পীয়ুষ কান্তি সেন আইনজীবী হিসেবে সুখ্যাতি নিয়ে মৌলভীবাজার জজ কোর্টে কাজ করছেন।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেন পরিবারের এক উজ্জ্বল অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বাবা ও বড় ভাই মহাআ গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ও কংগ্রেসের স্থানীয় সংগঠক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর গোটা পরিবার সমাজতাত্ত্বিক আদর্শে উত্তুন্দ হন এবং ক্রমশ: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বে আসীন হন। সুশিক্ষিত পরিবার হিসেবে গোটা এলাকায় তাঁদের একটি অনন্য সামাজিক অবস্থানও ছিল।

৫.খ. নরেশ চন্দ্র দাস

সেন পরিবারের গৃহশিক্ষকশ্রী নরেশ চন্দ্র দাস ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা শহরের নিকট-পশ্চিমে অবস্থিত ঘড়ুয়া গ্রামের অধিবাসী। নরেশ পঞ্চিত নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ীটি তৎকালে ‘পঞ্চিত বাড়ী’ বলে খ্যাত ছিল। তিনি পুরুষ ধরে পাঞ্চিত তথা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁর। নরেশ পঞ্চিতের বাবা কৈলাস পঞ্চিত শহরের তৎকালে সুবিখ্যাত শ্রীনাথ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দুই কাকা সারদা চরণ ও অনন্দা চরণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের মহত্ব উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দু’জন অভাগা (!) শিক্ষক তাঁদের উদ্যোগের চরম দক্ষিণাও পেয়েছিলেন- ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে তাঁদের ক’জন ছাত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও নির্দেশনায় নিজ বাড়ীতে অগ্নিদণ্ড ও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁদেরকে।²⁵

সেন পরিবারের বাড়ীর নিকটবর্তী বাসুদেবশ্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নরেশ পঞ্চিত। তাঁর আবাসিক ব্যবস্থার দায়িত্ব নেন দক্ষিণ পৈলভাগ (রামেরগাঁও)-এর অধিবাসী ও ৩ এবং ৫ কামালপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শ্রী কৃপেশ চন্দ্র দেব। হাতে খড়ি ছাড়াও নরেশ পঞ্চিত বহুদিন ধরে সেন পরিবারের তৎকালীন ছাত্রদের পড়িয়েছেন। অত্যন্ত মেধাবী, নীতিনিষ্ঠ, সুশ্রেষ্ঠ ও আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। সেন পরিবারে

তখন প্রায়ই ছানীয় জ্ঞানীগুণীদের আড্ডা বসত, যেখানে পঞ্চিত মশাই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। ভোজনবিলাসী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রতিভাবান ছাত্র বলে রংগলাল সেনকে তিনি অতিশয় স্নেহ করতেন।

৫.গ. গোবিন্দ চন্দ্র দেব

দর্শনশাস্ত্রের সুপঞ্চিত, দর্শনসাগর উপাধিপ্রাপ্ত এবং মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৮৫) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০৮) প্রাপ্ত ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব পুরকায়ষ্ট (১৯০৭-১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী ড. দেবের পূর্বপুরুষের ভারতের গুজরাট থেকে এখানে এসে ছায়ী বসতি স্থাপন করেন। স্বর্ণেজ্জুল কৃতিত্বের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি জি সি দেব নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। কলকাতার রিপন কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ১৯৫৩ সনে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান ছাড়াও তিনি ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল)-এর হাউজ টিউটর ও পরবর্তীতে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নয়টি মূল্যবান গ্রন্থের প্রগতি, যা আজও অভিজ্ঞমহলে সমাদৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে নরপিশাচ পাক হানাদার বাহিনী ও এদের এদেশীয় দালালদের পরিকল্পিত আক্রমণের শিকার হয়ে ২৫শে মার্চের কালোরাতে অকৃতদার এই মনীষীর জীবনাবসান ঘটে।

৫.ঘ. এ কে নাজমুল করিম

অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের নাজমুল করিম (১৯২২-১৯৮২) বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার আনন্দানিক সূচনা করেন ১৯৫৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ড. করিম তদনীন্তন সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। পরে রকফেলার বৃত্তি নিয়ে লঙ্ঘন ক্ষুল অব ইকোনমিক্স থেকে পি-এইচ ডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ফেনী কলেজের প্রভাষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ঢাকা কলেজেও তিনি একই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন।

লক্ষ্মীপুরে জন্মগ্রহণকারী ড. করিমের পৈতৃক নিবাস কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের ফাল্লুনকরা গ্রামে। সমাজবিজ্ঞানের ওপর তিনি কঠিন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিপ্রদর্শন ২০১২ সনে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে শিক্ষা কেন্দ্র ও বৃত্তি চালু রয়েছে। তিনি কল্যাণ সন্তানের জনক ড. করিমের স্ত্রী সৈয়দা জাহানারা বেগম ঢাকার বদরহন্দেসা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

৫.ঙ. জ্যোতির্ময় গুহ্যাকুরতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. জ্যোতির্ময় গুহ্যাকুরতা (১৯২০-১৯৭১) মহোদয়ের জন্য ময়মনসিংহ শহরে। পৈতৃক নিবাস বরিশালের বানারীপাড়ায়। বাবা ও মা উভয়েই শিক্ষক হিসেবে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল খুবই কৃতিত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক

ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। স্নাতকে দর্শনশাস্ত্রে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাওয়ায় তাঁকে পোপ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডাল প্রদান করা হয়। বৃটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে লঙ্ঘনের কিংস কলেজ থেকে তিনি পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক ছাড়াও তিনি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিবাদী সমাজিচিন্তক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষক রূপে বিশেষ পরিচিত লাভ করেন।

তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহষ্ঠাকুরতা ছিলেন পুরানো ঢাকার গেওরিয়ায় অবস্থিত মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁদের একমাত্র সন্তান ড. মেঘনা গুহষ্ঠাকুরতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে মানবাধিকার এবং সামাজিক গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদক্ষভাবে কাজ করছেন।

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের কালোরাতে তিনি বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে গুরুতর আহত হন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩০ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫.৮. টম বি বটোমোর

বৃটিশ মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক টম বি বটোমোর (১৯২০-১৯৯২) সমাজ গবেষক হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। লঙ্ঘন স্কুল অব ইকোনোমিক্স থেকে তিনি সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। যশোরী সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিপবার্গের অধীনে তিনি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি যুক্তরাজ্যের লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার সাইমন ফ্রেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৫৩-১৯৫৯ মেয়াদে *International Sociological Association-* এর নির্বাহী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭০-১৯৭৮ মেয়াদে উক্ত সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। *British Sociological Association-* এর সভাপতিও ছিলেন তিনি (১৯৬৯-১৯৭১)। রাজনীতি সচেতন বটোমোর বৃটিশ লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন।

২০টি মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা বটোমোর সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অসংখ্য জার্নাল সম্পাদনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সারা বিশ্বের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পরিমণালে বহুল পর্যবেক্ষিত কর্তৃ হল: *Classes in Modern Society* (1955), *Marx: Selected Writings in Sociology & Social Philosophy* (1956), *Sociology: A Guide to Problems and Literature* (1962), *Elites and Society* (1966), *Sociology as Social Criticism* (1975), *Marxist Sociology* (1975), *A History of Sociological Analysis* (1979), *A Dictionary of Marxist Thought* (1983), *Sociology and Socialism* (1984), *The Capitalist Class: An International Study* (1989) প্রভৃতি।

যেসব ব্যক্তিত্বের কথা আমরা আলোচনা করলাম, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ও কৃতিত্বের সামনে-পেছনে যে অনৰ্বাণ আলোকশিখা জলজ্বল করছিল, তা হলো সততা ও ন্যায়নির্ণয়-প্রসূত জ্ঞান। জ্ঞানগুরু সক্রিটিসের 'সদগুণই জ্ঞান' ২৬ এই ক্ষুদ্র অথচ মহামূল্যবান বাণীতে তারা সর্বদা অবিচল ছিলেন। আর রংগলাল সেনের আদর্শিক ভিত্তি রচিত হওয়ার প্রধান অনুষ্টক-সূত্র এখানেই গ্রথিত।

৫.চ. স্তৰী, উত্তৱাধিকাৰীগণ ও আদৰ্শিক চেতনার ধাৰাবাহিকতা

অধ্যাপক রংগলাল সেনের স্তৰী কমলা সেন (১৯৪২-২০১৮) ছিলেন সৰ্বগুণে গুণান্বিতা এক মহিয়সী নারী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে উজ্জ ক্যাম্পাসে অবস্থিত উদয়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এৱ আগে তিনি ঢাকার নারী শিক্ষা মন্দিৰ (বৰ্তমান নাম শেৱে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়) ও টাঙ্গাইল জেলার মিৰ্জাপুৰেৰ ভাৱতেশ্বৰী হোমসেৱ শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৬ সনেৱ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাঁদেৱ বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। আমি একটু ঘন ঘন তাঁদেৱ বাসায় যেতাম। মাসীমা দৱজা খুলেই বলতেন, ‘আমাৰ বাবুল আইছে’; শব্দগুলো আজও আমাৰ কানে বাজে। সেন দম্পতিৰ সত্তান তিনজন, যাদেৱ সকলেই অত্যন্ত মেধাৱ স্বাক্ষৰ রেখে শিক্ষাজীৱন সম্পন্ন করে কৰ্মজীৱন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্ৰথমজন সৃচনা সেন পাপড়ি, পেশায় চিকিৎসক, চট্টগ্রামে একটি বেসৱকাৰী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কৰাচ্ছেন। তাঁৰ স্বামী শিব শঙ্কৰ সাহা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজেৱ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ সার্জন। তাঁৰা তিনি সত্ত্বানেৱ জনক-জননী। দ্বিতীয়জন রচনা সেন পাপিয়া, তাঁৰ স্বামী মানস মৈত্র। দুঁজনেই প্ৰকৌশলী হিসেবে মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্ৰেৱ আৱিজোনায় একটি কম্পিউটাৱ কোম্পানীতে কৰ্মৱত। তাঁৰা দুঁসত্তানেৱ জনক-জননী। তৃতীয়জন সত্যকাম সেন পৱাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৱ ফিল্যাস বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বিসিএস (প্ৰশাসন) ক্যাডারেৱ কৰ্মকৰ্তা হিসেবে সৱকাৱেৱ যুগ্ম সচিবেৱ দায়িত্বে কৰ্মৱত। তাঁৰ স্তৰী দীপালী বকশী সেন ঢাকার একটি স্কুলেৱ শিক্ষক, তিনি উচ্চদিভজনে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্ৰীধাৰী। তাঁৰা দুঁসত্তানেৱ জনক-জননী। পেশাগত দায়িত্ব পালনেৱ পাশাপাশি পিতৱ আদৰ্শিক চেতনা তাঁৰা অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা সহকাৱে লালন কৱে চলেছেন। মানুষেৱ আদৰ্শিক ও জ্ঞানভিত্তিক চেতনা তৈৱীৰ একটি বংশগত ধাৰাবাহিকতা প্ৰয়োজন হয়, নোবেল বিজয়ী বাঙালী অৰ্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমৰ্ত্য সেনেৱ পাৱিবাৱিক উত্তৱাধিকাৱেৱ প্ৰসঙ্গ টেনে ড. সেন এ মন্তব্য কৱাচ্ছেন। তা ছাড়া, রংগলাল সেনেৱ ভাই-বোন ও অনেক আতীয়-স্বজনেৱ পৱিবাৱেৱ সাথে আমাৰ ঘনিষ্ঠ পৱিচয় ও যোগাযোগ রয়েছে, যাদেৱ আদৰ্শিক চেতনা ও সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা প্ৰশংসনীয়।

৬. শিক্ষা

শিক্ষা প্ৰত্যয়টি উত্তৱিত না হলে সভ্যতা হয়ত সমাজকাঠামোয় এত সুদৃঢ় স্থান লাভ কৱাতে পাৱত না। আজকাল বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, কলা, বাণিজ্য ও শিল্পেৱ অভাৱনীয় অগ্ৰগতিৰ ফলে মানব সভ্যতাৰ চৰম উৎকৰ্মেৱ যে ঘন্টাৰনি দিকে-দিগন্তে নিনাদিত হচ্ছে, তা শিক্ষার আশীৰ্বাদ ছাড়া আৱ কিছুই নয়। আমোৰা এখন ড. সেনেৱ অধীত শাৰ্স্ট্ৰ সমাজবিজ্ঞানেৱ আলোকে শিক্ষার প্ৰকৃতি অনুসন্ধানেৱ চেষ্টা কৱাৰ। আমোৰা মনে কৱি, তাঁৰ আদৰ্শিক মানসলোক গঠনেৱ পটভূমিকায় এই আলোচনা একেবাৱেই প্ৰাসঙ্গিক।

৬.ক. শিক্ষা প্ৰত্যয়টি স্বভাৱজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত

বক্ষত মানুষেৱ স্জনশীলতাৰ অনন্য গুণটিই গোটা জগৎকে গতিময় কৱে তুলেছে; যেখানে বাধা প্ৰয়োজন হয়েছে, সেখানে উত্তৱণেৱ প্ৰয়াস চালিয়েছে। অৰ্থাৎ, মানুষেৱ জীৱনকে অবাধ ও সুষমামণ্ডিত কৱাৰ লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্ৰহণে মানুষকে সৰ্বদাই তৎপৰ থাকতে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী মহামাৰী কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্ৰণে মানুষ তাৰ স্বভাৱসুলভ সে প্ৰচেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হয়েছে এবং ইতোপূৰ্বে ক্যালাৱ, যক্ষা, ম্যালেৱিয়া, কলেৱা প্ৰভৃতি দুৱারোগ্য ব্যাধি থেকে মানব সমাজকে বাঁচানোৱ উদ্যোগে সুফল অৰ্জন কৱেছে। আধুনিক যুগেই নয়, সভ্যতাৰ উষালঘণ্টে মানুষ নানা ধৰনেৱ বাধা-বিপত্তি জয় কৱাৰ তৎপৰতা চালিয়েছে, আমোৰা যাদেৱকে বৰ্বৰ বলে উপহাস কৱি! জীৱন ধাৱণেৱ মূল উপাদান খাদ্য (এমনকি অখাদ্য) সামঞ্জী সহ

অনেক আবশ্যিকীয় বিষয় নিরূপণ করেছেন ঐসব বর্বরাই, আবিষ্কারক বা উত্তাবকের উপাধি তারা কখনো চায় নি, পায় নি। নেতৃত্বাদী সমাজ-দার্শনিক এডাম ফার্গুসন এজন্যই আদিম সমাজের সমীক্ষায় কল্পনাবিলাসের পরিবর্তে তথ্যনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ‘‘আদিম সমাজের মানুষকে অসভ্য-বর্বর বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কেননা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, যাদেরকে আমরা বর্বর বলতে অভ্যন্ত তারা আমাদের মত সভ্যদের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়।’’^{২৭}

মানুষের সৃজনী প্রতিভার অনন্য অনুসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণকে বাধা দিলেন না। বাহিরে থাণিটিকে সর্বথাকারে বিবৰ্ণ নিরস্ত দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল ‘আমি অসাধ্য সাধন করব’। অর্থাৎ ‘যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে’। সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চারদিকে অতিকায় জগ্নদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল তখন সে হরিণের মত পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মত লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে- চকমকি পাথর কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে।’’^{২৮} ভাষাহীন, বুদ্ধিহীন বলে বিবেচিত অনুজীব থেকে শুরু করে বিকট জন্ম-জানোয়ারের মধ্যেও আত্মরক্ষার নানা কৌশল আতঙ্ক করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তো বটেই, থাণিমাত্রাই জীবনকে ঝঝঝটমুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য পূর্বসূরীদের নিকট থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৬.৬. শিক্ষার ধরন

শিক্ষা অর্জন ও বিতরণের নানাবিধি ধরন রয়েছে। তবে এসব ধরনকে মোটামোটি তিনটি প্রধান বিভাগের অধীনে বিন্যস্ত করা যায়।

প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক বা আনন্দানিক শিক্ষা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার সর্বব্যাপী রূপ। বিশের সর্বত্রই এ ধরনের শিক্ষার উপস্থিতি রয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ রাষ্ট্রের আইন ও নেতৃত্বকৃত, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক বাস্তবতা ও মূল্যবোধ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিবেচনা করে শ্রেণী অনুযায়ী একটি পাঠ্ক্রম নির্ধারণ করে দেয়। পাঠ্দানের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় তৈরী করা হয় ভবন, যা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত একদল লোক নিয়োগ করা হয় আগত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা বিতরণের জন্য। নির্ধারিত সময়-কাঠামো অনুসরণ করে শিক্ষা প্রদান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা এখানে অবশ্য পালনীয় বিষয়। মূল্যায়ন শেষে মেধামান উল্লেখপূর্বক প্রত্যায়ন তথা সনদপত্র প্রদান করা হয়। পাঠ্দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মননবৃত্তির বিকাশেও নানা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অপ্রাতিষ্ঠানিক বা আনন্দানিক শিক্ষাও মূলত সর্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা। পৃথিবীর তাৎক্ষণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সূতিকাগার হল এটি। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাই মানুষকে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পটভূমি রচনা করে দেয়। জীবন ধারণের অনেক মূল্যবান উপাদান ও তথ্য মানুষের কাছে ধরা দেয় অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমেই, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নেই কোন ভবন বা পাঠ্ক্রম। নেই কোন সনদের ব্যবস্থা; তবে মূল্যায়নের একটি সুপ্ত ব্যবস্থা এখানে পরিলক্ষিত হয়। পরিবার, প্রকৃতি, সামাজিক ও নেসর্গিক প্রতিবেশ, খেলার সাথী, আত্মায়-স্বজন প্রভৃতি সব কিছুই এখানে শিক্ষার আধার রূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ, ধর্মীয় ও নেতৃত্ব বিধি-বিধান, জীবন ধারণের উপায়, উপার্জনের

চলমান ব্যবস্থা প্রত্তি বিষয়ে মানুষের মধ্যে সর্বদাই মিথ্যায়া সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো মানুষের মধ্যে নানা বিশ্বাসের জন্য দেয়, যা শিক্ষারপে পরবর্তী জীবনে মানুষ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ এখানে শিক্ষার বিষয়টি উন্নুক্ত- ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা’^{১৯}। পঞ্চিত জওহরলাল নেহরু তাঁর মামণি ইন্দিরাকে এ পদ্ধতিতে প্রকৃতির ভাষা^{২০} উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য থেকে মৃত্যু অবধি এ শিক্ষা চলমান থাকে।

তৃতীয়ত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম ও সংশ্লিষ্ট নৈতিমালা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণত, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা করে থাকেন।

৬.গ. শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

মানুষের সমাজ ও জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলাই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করছে, শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণেও তৎপর রয়েছে। সাথে সাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বও সম্যক বিবেচনায় এসেছে। শিক্ষার অধিক্ষেত্র যাই হোক, চূড়ান্ত অর্থে মানুষকে যথাযথ মানবীয় গুণাবলীতে ঝান্দ করে সমাজের সংহতি তথা অংগতি ত্বরান্বিত করার মধ্যেই শিক্ষার সার কথা গ্রাহিত। শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য আমরা ক'জন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ দার্শনিকের বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই:

এরিস্টটল: সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশের অপর নাম শিক্ষা। এটি বিশেষ করে মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, যার মাধ্যমে সে পরম সত্য, শিষ্টতা ও সৌন্দর্যের মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।^{২১}

জন লক: শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানসিক শৃঙ্খলা বিধান।^{২২}

জ্যাজ্যাক রুশো: শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন।^{২৩}

অগাস্ট কেঁতো: শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ সাধন নয়; শিক্ষার্থীকে সমাজের সকল ঘৰের মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। তিনি সার্বজনীন শিক্ষার ওপর জোর দেন।^{২৪}

হার্বার্ট স্পেন্সার: সমুদয় মানবীয় শক্তি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা বর্ধিত হয়। ... বিজ্ঞানের তুল্য ন্যূনতা আর কেহই শিক্ষা দেয় না।^{২৫}

এমিল ডুর্মেই: শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক হয়। তিনি বিদ্যালয়কে গৃহের সাথে তুলনা করেন।^{২৬}

টি বি বটোমোর: শিশুদের সামাজিকীকরণ ও শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধান করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।^{২৭}

চিন্তাবিদদের উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা সহজেই এ সামান্যীকরণে পৌঁছাতে পারি যে, একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, যার ফলে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার, সৌন্দর্যানুরাগ, ভালবাসা ও সহানুভূতির সুসমন্বয় সাধিত হয়ে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করে শিক্ষাবিদ

খান সারওয়ার মুরশিদ যে মন্তব্য করেন, তার উল্লেখ করে প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানতে চাই: “শিক্ষার লক্ষ্য হবে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্নোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফূরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমবয়, জ্ঞানবোধ কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞানের নিয়োগের দ্বারা জীবনে সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্চা ও প্রসার।”^{৩৮}

৬.৮. সামাজিকীকরণের আসল বাহন শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব। বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে হরেক রকম রীতি-নীতি মান্য করে সমাজে বসবাস করে বিধায় অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবেক-বুদ্ধি অর্জন করে নিতে হয়, নতুবা নামান্তরে আমরা কেউ কেউ দেহসর্বস্ব প্রাণীই থেকে যাই। কাজী নজরুল্লের উপলক্ষ এখানে যোগ করার মত:

সেরেফ পঞ্চের ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত
সেই কামনার সন্তান মোরা ! তবুও গর্ব কত।^{৩৯}

মোদা কথা, ‘সমাজের মানুষ’ হিসেবে যে গুণগুলো কোন একজনের চরিত্রে থাকা উচিত, সেগুলো অর্জন করতে পারার মধ্যেই মানুষ নামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়, গর্ব করা যায়। আর, এখানেই রয়েছে ‘সামাজিকীকরণ’ প্রত্যয়টির যথোপযুক্ত ভূমিকা। সামাজিকভানী রংগলাল সেনের কথায়: “একটি মানবশিশু জৈবিক সত্তা হিসেবে প্রাণীর চাহিদা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। সে ক্রমশঃ সামাজিক জীবে পরিণত হয়।”^{৪০} যে প্রক্রিয়ায় মানবশিশু সামাজিক জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এটিই সামাজিকীকরণ। সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমাজের সংহতি বজায় রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য বলে বিবেচিত। তাই শৈশব থেকে প্রাণবয়স্ক মানুষের মধ্যে এই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। মানুষের সামাজিক মিথ্যামূলক সকল ক্ষেত্রে তথা পরিবার, প্রতিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জীবিকার আধারসমূহ, বিনোদনের মাধ্যমসমূহ, গণমাধ্যম, আইন, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিকীকরণের বাহনরূপে কাজ করে।

অধ্যাপক রংগলাল সেনের সার্বিক জীবনাচরণে সমাজিকভানীদের নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থা কর্তৃতানি প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ পাঠ্যক্রমহলের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

৭. উপসংহার

রংগলাল সেনের অর্জিত শিক্ষা ও শিক্ষার প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা তাঁকে একজন মানবতাবাদী সমাজিকভানী, সমতাবাদী শিক্ষাবিদ ও নৈতিকতাবাদী মানবপ্রেমিক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। পারিবারিক আদর্শ, বিভিন্ন জনী-গুণী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও অধীত শাস্ত্র সমাজিকভানের শিক্ষার সম্মিলিত প্রভাবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এমন এক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, যা তাঁকে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন তথা সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, নৈতিকতা প্রভৃতিতে তাঁর অবস্থান নির্ণয়ে নির্মের বিপরীতমুখী দুটি বক্তব্যই যথেষ্ট। প্রথমত, তিনি বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৪)-র প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি অকৃষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেখানে বলা হয়: “একটি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবৈষম্য দূর করে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান করতে হবে। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা প্রধানতঃ সমাজের

একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তার ফলে ক্ষমক, শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সন্তান-সন্তানিদের প্রতিভা বিকাশের পথে বিশাল আন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। .. সারা দেশে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে ও অংগতির স্বার্থে দেশব্যাপী শিক্ষার মানের একটি মোটামোটি সমতা বিধান অপরিহার্য। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা, বাসস্থান, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, বয়স প্রভৃতি কারণে যেন কারো প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ব্যাহত না হয় তা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনিচিত করতে হবে।”^{৪১} দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমলের এস এম শরীফ শিক্ষা কমিশনের মুখ্যবন্দে বলা হয়েছিল: “শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের সন্তান ধারণা পাস্টাতে হবে। সন্তান শিক্ষা লাভ করা যায় বলে যে তাদের ভুল ধারণা রয়েছে তা শিগগিই বর্জন করতে হবে। যেমন দায় তেমন জিনিস- অর্থনীতির এ সূত্র অন্যান্য ব্যাপারে যেমন সত্য, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও তা উপেক্ষা করা অসম্ভব।”^{৪২} শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের এহেন হীন প্রয়াসকে ড. সেন আজীবন তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন।

উল্লিখিত দুটি বক্তব্য থেকে অধ্যাপক রংগলাল সেনের আদর্শিক চেতনার ভিত্তি মানবিকতাবাদের কত গভীরে গ্রথিত ছিল, তা অতি সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দান করে শৃঙ্খলিত জীবন থেকে সকল মানুষকে মুক্ত জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেই যেকোন নীতিমালার সার্থকতা প্রমাণিত হয়। এতে মানবাত্মার সত্য দর্শনের প্রক্রিয়াটির শুভ সূচনা ঘটতে পারে। আর এখানেই অনুধাবন করি রংগলাল সেনের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য।

তথ্যসূত্র

১. প্লেটো (সৈয়দ মকসুদ আলী অনুদিত), রিপাবলিক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ১৭৭
২. জগন্মীশ চন্দ্র বসু, অব্যক্ত, কোলকাতা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৩২৮ বাঃ, পৃ. ৯২
৩. সরদার ফজলুল করিম, ‘হরিদাস ভট্টাচার্য: একজন শিক্ষকের আলেখ্য’, রংগলাল সেন ও অন্যান্য (স.), বাস্তিকা, ঢাকা, জগন্মাথ হল বার্ষিকী হীরক জয়তী সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ১৩৬
৪. জগন্মাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জাতীয় অধ্যাপক রংগলাল সেন সংবর্ধনা স্মরণিকা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১
৫. এ কে নাজমুল করিম, সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ১৬
৬. উদ্ধৃত, হারুন-অর-রশিদ, ৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব তিহ্য-সম্পদ: বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৬৮
৭. রংগলাল সেন, সিভিল সোসাইটি, ঢাকা, তপন প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৬৪
৮. রংগলাল সেন, সিভিল সোসাইটি, ঐ, পৃ. ১৬৫
৯. রংগলাল সেন, সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৪, পৃ. ৩০৮
১০. রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৬, পৃ. ১১৮
১১. রংগলাল সেন ও বিশ্বতর কুমার নাথ, প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৮, পৃ. ৩২৩
১২. Quoted in S Radhakrishnan, *Religion and Society*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1947, p. 91
১৩. রংগলাল সেন, সিভিল সোসাইটি, ঐ, পৃ. ২১১
১৪. বিস্তারিত দেখুন, অনলাইন উইকিপিডিয়া
১৫. বিস্তারিত দেখুন, অনলাইন উইকিপিডিয়া

১৬. রংগলাল সেন, সমাজকাঠামো: পুঁজিবাদ ও সমাজতত্ত্ব, ঐ, পৃ. ৩৫১
১৭. মো: আনিসুর রহমান, অপহৃত বাংলাদেশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ. ১১৬
১৮. S Radhakrishnan, *op cit.*, p. 100
১৯. A K Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Dhaka, Nawroz Kitabistan, 1996, p. 9-10
২০. ইরফান হাবিব (কাবেরী বসু অনুদিত). ভারতবর্ষের মানুমের ইতিহাস (৪ খণ্ড), কোলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২- ২০০৬ (কৌতুহলী পাঠকদের জন্য রেফারেন্স হিসেবে উল্লিখিত)
২১. Sir P J Hartog, *Examinations and their Relation to Culture and Efficiency*, London, Constable and Company Ltd., 1918, p. xv (int.)
২২. আব্দুল মুহিত ও বাবুল চন্দ্র সুত্রধর (স.:), অশ্বান স্মৃতি এলবাম, ঢাকা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৩০ তম ব্যাচ, ১৯৯৪, ড. রংগলাল সেন প্রদত্ত শুভেচ্ছা বাণী
২৩. আর এম ম্যাকআইভার (এমাজ উদীন আহমদ অনুদিত), আধুনিক রাষ্ট্র, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৪৪৫
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষাবিধি', পথের সংগ্রহ, কোলকাতা, বিশ্বভারতী এন্ড্রুনিভাগ, ১৩৫৪ বাঃ, পৃ. ১৮৩
২৫. ডা: সুধেন্দু বিকাশ দাশ, স্বাধীনতা ও মৌলভীবাজারের ঘড়ুয়া গ্রাম, দৈনিক সিলেট মিরর, ১২ মে, ২০২০
২৬. রংগলাল সেন, সিভিল সোসাইটি, ঐ, পৃ. ১৫
২৭. দেখুন, রংগলাল সেন, সিভিল সোসাইটি, ঐ, পৃ. ৬
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সত্যের আহ্বান', কালান্তর, কোলকাতা, বিশ্বভারতী এন্ড্রুনিভাগ, ১৪১৬ বাঃ, পৃ. ১৯০-১৯১
২৯. কবি সুনির্মল বসু'র বিখ্যাত কবিতা 'সবার আমি ছাত্র'
৩০. জওহরলাল নেহেরু (হেনা চৌধুরী অনুদিত), মা-মণিকে বাবা, কলকাতা, পত্রপুট, ১৯৯৩, পৃ. ৩
৩১. রংগলাল সেন ও বিশ্বন্ত কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০২
৩২. রংগলাল সেন ও বিশ্বন্ত কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০৫
৩৩. রংগলাল সেন ও বিশ্বন্ত কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০৫
৩৪. স্যামুয়েল কোনিগ (রংগলাল সেন অনুদিত), সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা, জে কে প্রেস এণ্ড প্রাবলিকেশনস, ২০০২, পৃ. ১৩০
৩৫. হার্বার্ট স্পেসার (স্বামী বিবেকানন্দ অনুদিত), শিক্ষা, কোলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮১, পৃ. ৪০ ও ৪৫
৩৬. স্যামুয়েল কোনিগ (রংগলাল সেন অনুদিত), ঐ, পৃ. ১৩১
৩৭. T B Bottomore, *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, London, Unwin University Books, 1970, p. 271
৩৮. দেখুন, আনিসুজ্জামান, সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ১০৩
৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, বারাঙ্গনা, কবিতা সংগ্রহ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০৬. পৃ. ১৫৮
৪০. রংগলাল সেন ও বিশ্বন্ত কুমার নাথ, ঐ, পৃ. ৩০৩
৪১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ১৯৯৮, পৃ. ২৫৬
৪২. রংগলাল সেন, বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২৫৯

সমাজতত্ত্বে তর্ক-বিতর্ক
(Debates in Sociology)
ড. মনিরুল ইসলাম খান*

Abstract

This paper focuses on the theoretical debates in sociology that acted as the driving force in its course of development drawing heavily from the thinking of Alvin Gouldner. Revolutionary transformation in the French society in late eighteenth century and the subsequent social disorder created the background of the development of positivism by Comte with the advocacy of restoring social order. Intermingling of different theories also took place as in the case of positivism furnishing the context for the emergence of structural functionalism. Interpretative sociology brought new dimension to the understanding of social phenomena by highlighting the perspective of the actors instead of the observer. In this vein it also discusses the emergence of intersubjectivity, ethnomethodology and related theoretical views. For obvious reason the paper deals elaborately with the perspective of Marxism. It underlines that structural functionalism presents society as an interwoven equilibrium while Marxism views the same as a conflicting whole with the effect of domination by the ruling class. This paper elaborates on the basic tenets of historical materialism as couched in Marxism. However, Marxist prognosis faltered in advanced capitalist countries of the Western hemisphere calling for new theoretical insight. Within Marxism it happened by examining the causal background of the continuation of capitalist countries, elaborated in this paper in the section on structural Marxism. The premise of sociology also necessitated the emergence of Durkheim and Weber who argued for different perspectives for the understanding of social order. The contributions of system theory and interactionism are duly acknowledged in this paper to weave a comprehensive intellectual tapestry being linked with debates and argumentation. The parallelism of system and individual brought dualism in sociological theory and Anthony Giddens took up attempt to draw a conflation between the two, unfolding a new dimension in the debate ridden sociological theories. The paper concluded with the discussion of Derrida and Lyotard to unfold the novel approach of post-modernism in challenging the claim of universality of modern theories.

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: mikdu1070@gmail.com

যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সমাজবিজ্ঞান একটি আলাদা ধরনের বিজ্ঞান। এই বৈসাদৃশ্য তর্ক-বিতর্কের অন্যতম একটি উৎস। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও তর্ক বিতর্ক আছে তবে তার ধরন আলাদা। সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষ ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক। মানুষের মন, চেতনা ও সংস্কৃতি মানুষকে ভিন্নতা দিয়েছে, যা সমাজ বিজ্ঞানের আলাদা চরিত্রের পেছনের একটা বড় কারণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় বস্তু বা জীবজগৎ নিয়ে কাজ করে, তাদের মন বা সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই, তাই ঐ বিজ্ঞানটাও আলাদা, যেখানে অপরিবর্তনীয় সূত্রের ছড়াচাঢ়ি, তেমনটা সমাজবিজ্ঞানে নয়।

সমাজবিজ্ঞানের তর্কের ইতিহাসটাও পুরনো, যদি দার্শনিকদের প্রাসঙ্গিক ভাবনা আমরা বিবেচনার মধ্যে নেই। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক প্লেটো বা এরিস্টটল দাস প্রথাকে স্বাভাবিক মনে করেছিলেন, যা বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনা বলে মনে করা হয়। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী এ্যালভিন গোল্ডনার তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে সমাজতত্ত্ব বিকাশের যে যুগভাগ করেছিলেন তাতে প্রথম যুগকে দেখিয়েছেন দৃষ্টব্যাদী যুগ, যেখানে প্রধান অবদান সাঁ সিমো ও অগাস্ট কেঁোঁৎ এর। দ্বিতীয় যুগকে চিহ্নিত করেছেন মার্কসবাদ দিয়ে, আর এই পর্বে সময়িত হয়েছে জার্মান ভাববাদ, ফরাসি সমাজতত্ত্ব এবং ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের ভাবনা। তৃতীয় যুগ ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞান। এই যুগে আমরা পাই ভেবার, ডুর্ভিম ও পেরেটোর চিন্তার সরব উপস্থিতি। চতুর্থ যুগে আমরা পাচ্ছি কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ যার প্রতিফলন দেখতে পাই ট্যালকট পারসনস্ এর রচনায়। ১৯৩০ দশকে এই পর্বের শুরু। হার্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান এই পর্বকে আরও সমৃদ্ধ করেছে যার মধ্যে আছেন রবার্ট মারটন, কিংসলে ডেভিস, উইলবার্ট মুর বা রবার্ট উইলিয়ামস এর মত ব্যক্তিবর্গ। এই প্রবন্ধে মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করা হবে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে তর্কগুলো হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অগাস্ট কেঁোঁৎ ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এবং তাঁকে এই শাস্ত্রের জনকও বলা হয়। তিনি সাঁ সিমোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বুদ্ধির পুনর্জাগরণ এবং ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দেয়। সামন্ত যুগের প্রবল শ্রেণী যেমন সামন্ত প্রভু বা খ্রিস্টীয় যাজকদের ক্ষমতাকে আঘাত করা হয়েছে এবং এই বিপ্লবের নেতৃত্বে রয়েছেন নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাতে অত্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী বর্গ এবং সাধারণ জনগণ। পুঁজিবাদ তখন বিকশিত হচ্ছে এবং উপযোগিতাবাদ ভাবনার জগতকে নাড়া দিচ্ছে। এখানে ঐতিহ্য এবং ধর্মের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, সামন্ত প্রভুদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, যাজকদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সেই শূন্যস্থান দখল করেছে নতুন মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যরা। এই পরিবর্তন সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে এবং প্রচল রাজনৈতিক অঙ্গীরাতা বিরাজ করছে ফ্রান্সে। ফরাসী বিপ্লব ও পরের কয়েক দশকে ঘন ঘন সরকার পতন হয়েছে, এবং বিপ্লবীরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং প্রতি বিপ্লবীরা যাদেরকে পুনরুদ্ধারকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে, তারা ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। অভিজাতদের সম্মান জানাতে চেয়েছেন। ব্যক্তিস্বাত্ত্বাদের চাইতে সমাজের বাঁধনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেঁোঁৎ এর সমাজচিন্তা এই

-
1. Raymond A. Morrow and David D. Brown (1994), Critical Theory and Methodology, (Vol. 3), Sage Publications: USA.
 2. Alvin Gouldner (1971), The Coming Crisis of Western Sociology, Heine Mann: UK.

প্রেক্ষিতে বিকশিত হয়েছে এবং দৃষ্টব্যাদী সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে। বুদ্ধির পুনর্জাগরণের দাশনিকেরা শুধু প্রত্যাখ্যানকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে ক্যোঁৎ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যার ধারাবাহিকতায় দৃষ্টবাদের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। সমাজ যেমন বদলাবে একইভাবে স্থিতিশীলও থাকতে হবে। ঐতিহ্যকে শুধু প্রত্যাখ্যান করলেই চলবে না গ্রহণযোগ্য দিকগুলোও খুঁজে বের করতে হবে। ক্যোঁৎ এর সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক গতিশীলতা তত্ত্বের গুরুত্ব এই প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা সম্ভব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সামষ্টিকতাবাদ যদি বেঁচে নেওয়ার বিষয় হয়, দৃষ্টবাদ দ্বিতীয়টিকে বেছে নেবে। জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী চেতনা এবং পুনরুদ্ধারকারীদের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পাশ কাটিয়ে দৃষ্টবাদ বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছে, শিল্পতত্ত্বকে সমর্থন দিয়েছে, পরিবার, সমাজের বন্ধন, স্থিতিশীল প্রক্রিয়া ইত্যাদির স্বপক্ষে মতামত দিয়েছে। দৃষ্টবাদ স্থিতিশীলতার পক্ষের একটি সামাজিক দর্শন, যা প্রকারান্তরে বিকাশমান-পুঁজিবাদী সমাজের স্বপক্ষ একটি দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অগাস্ট ক্যোঁৎ এর চিন্তা এবং ফরাসি সমাজবিজ্ঞান বিকাশের ধারা জীববিজ্ঞান কর্তৃক যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। এর একটি তাৎপর্য সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করা। সমাজের একটা দেহ আছে এবং এই সমাজদেহ যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তাদের সম্পর্ক আন্তর্নির্ভরশীলতার। ডুর্ঘাম যখন শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়ার জৈবিক সংহতি তত্ত্ব প্রদান করলেন তাতে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আন্তর্নির্ভরশীলতার বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট চিন্তা ধারণ করল। এভাবে ক্রিয়াবাদের সূত্রপাত। এই তত্ত্ব মনে করে সমাজ দেহের মধ্যে যে আন্তর্নির্ভরশীলতা তা থেকে সূচিত হয়েছে সামাজিক ভারসাম্যের প্রক্রিয়া। সমাজ নিজীব ধারায় এই ভারসাম্য তৈরি করে এবং সমাজের বাঁধনকে ধরে রাখতে পারে। সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন একে অপরের পরিপূরক তেমনি সমাজের গোষ্ঠী সমূহও। প্রয়োজনহীন কিছুই সমাজে টিকে থাকতে পারে না, তাই পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি হয় আন্তর্নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্য। এই তত্ত্বের সবচেয়ে বড় উপকারটা পেয়েছে সেই সময়ের বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজ। ফরাসি বিপ্লব উত্তর যে বিশ্বখন্দা তা বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত এবং স্থিতিশীলতা কাম্য। ফ্রাসে উনবিংশ শতাব্দীতে যে মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল তারা এই পর্যায়ে নিজেদের সংযত করলো, স্থিতিশীলতার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করলো। উগ্রপন্থা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন ধারণা সূত্রপাত তারা করলো, যদিও এই উগ্রপন্থার মাধ্যমেই ফ্রাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, সামন্ততাত্ত্বিক কাঠামো ভেঙে গিয়েছে, অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক পতন হয়েছে, মধ্যবিত্ত শক্তিশালী হয়েছে। বিরাজমান উগ্রপন্থা থেকে যদি আরো বিপ্লবী দাবি উঠে সেটা ছিল উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ভৌতি, তাই তাদের স্থিতিশীলতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন। সাম্য ও স্বাধীনতা ফরাসি বিপ্লবের বাণী, কিন্তু এই বাণী যদি উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির বিপক্ষে যায়, তাহলে সেই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়াটা ছিল তাদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব এবং দৃষ্টবাদ নতুন বুর্জোয়া সমাজের তাত্ত্বিক আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হলো। কোঁৎ নিজেও ভাবলেন বিজ্ঞান এবং জ্ঞান চর্চা দিয়ে সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব। উগ্রপন্থা বিপ্লব বা বিশ্বখন্দা আর দরকার নেই ফ্রাসে।

-
3. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley and Charles H. Powers (2012), *The Emergence of Sociological Theory*, Sage: USA (seventh edition).
 4. উপরে উল্লেখিত
 5. Anthony Giddens (1978), *Introduction in Positivism and Sociology*, Heine Mann: UK (edited by Anthony Giddens & originally published in 1974)
 6. Alvin Gouldner, (1971), প্রাণক্ষণ

দৃষ্টবাদ আরো পরিবর্তন নিয়ে আসলো যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে সমাজবিজ্ঞানের জন্য উপযোগী মনে করা হলো। পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ, হিসাব কষা বা ভবিষ্যৎবাণী করা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি যা দিয়ে জ্ঞান অর্জন সম্ভব, তত্ত্ব তৈরি সম্ভব, বিশ্লেষণ বা বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে কাজিত পথে পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু শুরু থেকেই দৃষ্টবাদী পদ্ধতির প্রসার সমাজবিজ্ঞানে খুব সহজভাবে আগায়নি। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টবাদী তত্ত্বে স্বাচ্ছন্দ বেধ করলেও, জার্মানীতে এর ব্যত্যয় ঘটলো।^৭ মানুষের আচরণ জড় বস্ত্র আচরণ হতে আলাদা। মানুষ চেতনার অধিকারী, সুতরাং তার কর্মকাণ্ড বুঝে শুনে হয়। মানুষ যেটা করে, সেটা কি সেভাবে করা যাবে, বা যাবে না বিবেচনার মধ্যে নেয়। সুতরাং মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করতে গেলে, তার মনের ভাবটাও বুঝতে হবে, যে বোধ থেকে সে কাজটি করছে। ভেবার সমাজবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা নির্ভর একটি বিজ্ঞান বললেন। মানুষের সব আচরণ বা কাজকর্ম হিসেব করে বা ছেক কেটে হয় না। উদ্দেশ্য ও পথের সঠিক সম্পর্ক যদি যৌক্তিক আচরণের সংজ্ঞা হয়, মানুষের অনেক আচরণই এই ধরনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ তাড়িত আচরণ সমূহ। তাই মানুষের আচরণকে বস্ত্রনিষ্ঠ মানদণ্ডে দাঢ় করানো মুশকিল, যে কারনে শূটজ একে আঙ্গচেতনামূলক বললেন। অর্থাৎ অনেকে যখন একটি আচরণে অভ্যন্ত হয়, সেটাই একটি তুলনীয় মানদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। শূটজ আরো মনে করেন যে গবেষকের অনুমিত মানের সাথে যিনি কাজটি করছেন, তার ভাবানার মিল নাও থাকতে পারে, তাই পর্যবেক্ষন প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। উদ্দেশ্য ও পথের সঠিক সম্পর্ককে যৌক্তিক আচরণের ভিত্তি ধরেছেন ভেবার, কিন্তু মানুষের অসংখ্য আচরণ এই ছকের বাইরে। তাই গারাফিংকেল বললেন যে, যা যুক্তির বাইরের আচরণ বলে মনে করা হয়, সেটাই হতে পারে গবেষণার সূচনা। উদ্দেশ্য ও পথ সঠিকভাবে যুক্ত এমন আচরণের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সম্ভব বা ভবিষ্যৎ বাণীও করা সম্ভব, তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি একেবারে ব্যবহার করা যাবে না এমনটা নয়। মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী চলে তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আচরণগত ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু আঙ্গচেতনামূলক কাঠামোর চাপে মানুষের আচরণকে একটা ছকের মধ্যে থাকতে হয়, সুতরাং এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু প্রথা সবসময় সঠিক কারণ নাও হতে পারে। যেমন বাড় ফুঁক প্রথাগত চিকিৎসা, বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। তবে অভিন্ন ব্যাখ্যা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বাস্তবতা মনে রাখতে হবে। যে সামাজিক সত্য এক যুগের জন্য প্রযোজ্য অন্য যুগের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন গ্রাম বাংলার সালিশ এর প্রাসঙ্গিকতা বহুলাংশে কমে গেছে সাম্প্রতিক সময়ে।

দৃষ্টবাদের পর যে পর্বটির কথা গোল্ডনার বলেছেন তা হলো- মার্ক্সবাদী পর্ব। মার্ক্সবাদ শুধু নতুন বিশ্লেষণের ছকই দেয়নি সমাজবিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ একটি শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে সমাজবিজ্ঞান বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মার্ক্স এর চিন্তাভাবনা পাঠ করে থাকে।

ক্রিয়াবাদ ও দৃষ্টবাদ সমাজকে আঙ্গনির্ভরশীল একটি সমষ্টি মনে করে থাকলে, মার্ক্সবাদ সেটা একটি দ্বন্দ্বিক সমষ্টি মনে করে। পশ্চিম ইউরোপ আদিম সাম্যবাদী অবস্থা থেকে ব্যক্তি

-
7. Anthony Giddens (1978), প্রাণক্ষণ
 8. মার্ক্স এবং এঙ্গেলস এর তত্ত্ব ও মতবাদ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় রচিত হয়েছে। তাঁরা হেগেলের ভাববাদ, এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিচার্ডের অর্থনৈতিক চিন্তা ও ইউরোপে প্রচলিত তৎকালিন সমাজতাত্ত্বিক ভাবনাকে আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভাবণাকে উপস্থাপন করেন। এই প্রবক্ষে মার্ক্স ও এঙ্গেলস সংক্রান্ত আলোচনা নিম্নলিখিত সূত্র থেকে আহরিত: Economic And Philosophic Manuscripts Of 1844 (Progress publisher, USSR, 1977, fifth revised edition; A Critique Of The German

সম্পত্তি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ক্লাপাত্তরিত হয়েছে। শ্রেণী বিভাজন সামাজিক বৈষম্য নিয়ে এসেছিল সাথে সাথে দ্বাদশিক সম্পর্ক ও তৈরি করেছিল। মার্কস তাঁর লেখায়, দর্শন, অর্থনৈতিক ও ইতিহাসের সময় ঘটিয়েছেন। ইতিহাসের পরিবর্তনকে হেগেল দেখেছিলেন চেতনা বা ভাবের ক্রিয়াশীলতার ফলশ্রুতি হিসেবে। একাধিক গ্রন্থে মার্কস এই বক্ত্যবকে প্রাত্যাখ্যান করে বিপরীত চিন্তা উপস্থাপন করেছেন। মার্কস চেতনাকে দেখেছেন অনেকটা রসদের মত, এর অন্তর্নির্দিত সত্তা বা যাকে ‘খাঁটি চেতনা’ বলা হয় এমন কিছু নেই, বাস্তবতার আলোকে চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠে, একে ব্যবহারিক চেতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে মানুষের কর্মকান্ডের মূল ভিত্তিটি কি? মার্কসবাদ অনুযায়ী জৈবিক ভাবে বেঁচে থাকা এবং সেই লক্ষ্যে উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাটা প্রধান কাজ। উৎপাদনের কাজ এককভাবে সংঘটিত হলেও প্রথম থেকেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে একটি সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হতে হবে, সেটা তার প্রাত্যহিক কথোপকথনের সময় বা সন্তান সন্তুতি উৎপাদনের সময়। মানুষের চেতনা, উৎপাদন কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সবই একই সুত্রে গ্রহিত হয়েছে। বস্তগত শ্রম থেকে মানসিক শ্রম যখন আলাদা হয়েছে তখন মানুষ বিমুর্ত- তাত্ত্বিক চিন্তা করেছে, তবে এখানে চিন্তা কখনই মানুষের কর্মকান্ডের পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হয়নি, বরং বাস্তবতার আলোকে তা ক্রিয়াশীল হয়েছে, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের কাজ বাস্তবতার সেতুবন্ধন রচনা করেছে বলে আমরা বলতে পারি। মার্কস এর উপরের ভাবনাগুলি সমাজবিজ্ঞানের জন্য যতটা মুখ্য হয়েছে, তার চাইতে বেশি হয়েছে সম্পত্তির বিবর্তনের ইতিহাস। মার্কস তাঁর সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজকে একাধিক গ্রন্থ করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। এই পুঁজিবাদী সমাজেই সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু এবং প্রধান সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটি একটি ভারসাম্য উপযোগী সমাজ যতই ভেতরে টানাপোড়ন থাকুক না কেন।

মার্কস এর মতে মানুষের সমাজের সূচনা কৌম সমাজের ভেতর দিয়ে সেই সমাজে সংগ্রহমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন মাছ ধরা, শিকার করা ইত্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল। সমাজ কাঠামোতে ছিলো একজন পিতৃতাত্ত্বিক কর্মধার এবং অপরাপর সদস্যবৃন্দ। এই কাঠামোর মধ্যে এক সময় আবির্ভূত হয়েছে দাস, যারা যুক্তে পরান্ত অন্য কোন গোষ্ঠী থেকে আসতে পারে। দাসের সংখ্যা বাড়ার প্রক্রিয়ায় নাগরিক ও দাস শ্রেণীর উক্তব। নাগরিকবৃন্দ দাস প্রভু। ইতিমধ্যে একাধিক কৌম একত্রিত হয়ে নতুন সমাজের পত্তন করেছে, যা নগর কেন্দ্রিক সমাজ। ক্রীস এবং রোম এর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মার্কস এর এই বিশ্লেষণ। এখানে কৃষি থেকে আলাদা হয়েছে শিল্প এবং বাণিজ্য। এই শিল্প আধুনিক শিল্পের মতো এতটা অগ্রসর নয়। দাস সমাজেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবির্ভূত হয়নি কেননা দাস এর মালিকানা বৃহত্তর সমাজের হাতে, সুতরাং এই মালিকানা সম্পদায়গত যদিও শ্রেণী বিভক্তি ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু দাস সমাজে ক্ষুদ্র কৃষকের উপস্থিতি লক্ষণীয় মার্কস এর বর্ণনায়। কিন্তু কৃষি, দাস উৎপাদন ব্যবস্থায় নগরকেন্দ্রিক শিল্প ও ব্যবসার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যে আবির্ভূত। দাস ভিত্তিক রোম স্বারাজের শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের উৎপাদন ও সীমিত হতে থাকে। এমন দুর্বল অবস্থায় জার্মানীয় বর্বর গোষ্ঠীর আক্রমণ ও বিজয়। এই গোষ্ঠীটি নতুন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থার পতন ঘটায় যা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। কৃষি হয়ে উঠল এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য ক্ষেত্র। আবির্ভূত হল সামন্ত প্রভু ও সামন্ত

Ideology (Progress publisher, USSR, 1968); Manifesto Of The Communist Party (first published in 1847, Marxists Archive 2000); A Contribution To The Critique Of Political Economy (first published 1859, Progress Publisher: USSR, 1976).

দাস। এই সামন্ত দাস ক্ষুদ্র কৃষকের অধিন্তন অবস্থান। সামন্ততন্ত্রে আরও যুক্ত হলো যাজক সম্প্রদায় যারা ওই উৎপাদন ব্যবস্থায় ছিল ধর্মীয় ভাবাদর্শের ধারক। সামন্ততাত্ত্বিক কাঠামোয় ক্রমাগত ভাবে শহর কেন্দ্রীক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বিকশিত হতে থাকে, যা এক সময় নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা আবর্ভাবের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা পরবর্তীতে পুঁজিবাদ রূপে আত্মকাশ করে। উপরে অতি সংক্ষেপে কয়েক সহস্র বৎসরের সমাজ পরিবর্তনের একটি সারাংশ প্রদান করা হলো, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। তা হল সমাজের দ্বান্দ্বিক অবস্থার চিত্র বর্ণনা করা এবং কিভাবে শ্রেণী আধিগত্য সমাজকে স্থিতিশীল রাখে সেই বঙ্গব্যটি প্রনিধান যোগ্য করে তোলা। মার্কসবাদ সমাজবিজ্ঞানে শক্ত আসন নিয়ে বিরাজমান যা এলভিন গোল্ডনার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানে দুটি বিপরীত মুখ্য ধারার সরব উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি।

মার্কস তার পুঁজি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার আগে সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক বক্তবাদ তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে গ্রহিত করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ অপরিহার্যভাবে উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে যাদের কোন উৎপাদন যন্ত্রের উপর মালিকানা নাই তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত হতে হয় উৎপাদন যন্ত্রের মালিকদের সাথে যাদের বুর্জোয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে মার্কসীয় সাহিত্যে। এভাবে রচিত উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির সমন্বয়ে তৈরি হয় উৎপাদন ব্যবস্থা। উৎপাদন শক্তির বিকাশ অপরিহার্য কেননা সমাজের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। যদি উৎপাদন শক্তির বিকাশ বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় তখন প্রয়োজন হয় উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন। এই প্রেক্ষিতটিই তৈরি করে সমাজ বিপ্লবের বিষয়টি। এখানে শ্রেণী দ্বন্দ্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। এই প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত, যেমন এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজে মৌল ভিত্তি রচনা করে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা। ব্রহ্মতর সমাজের রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ বিরাজমান উৎপাদন সম্পর্কের প্রয়োজনেই তৈরি হয় রাজনীতি ও মতাদর্শ ব্যবস্থা। যেমন সামন্ততন্ত্রে অভিজাত শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ। বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণী সম্পর্ক একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ, সর্বাহারা শ্রেণী এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষিত ও বিছিন্ন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যখন সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে উৎপাদন যন্ত্রের ওপর, সমাজ হবে দ্বন্দ্ব মুক্ত, অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে সমাজিক সম্পর্ক তৈরি হবে শোষণমুক্ত ভাবে। মার্কস মনে করেন যে পুঁজিবাদী সমাজে ক্রমাগত পুঁজি সংঘর্ষের প্রক্রিয়ায় অর্জিত লাভের পরিমাণের হার ক্রমাগত পতনের মধ্যে দিয়ে সংকট তৈরি হবে, তখন অবশ্যস্তাৰী ভাবে সমাজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে, যার নেতৃত্বে থাকবে সর্বাহারা শ্রেণী, এই প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজ।

মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তার পুঁজি গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও সেই শতকে অনেকগুলো সহিংস শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয় কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের পতন পরিলক্ষিত হয়নি। বরং বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায়, যা পুঁজিবাদ বিকাশের ধারায় অতটা অগ্রবর্তী ছিল না, সেখানে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই ইতিহাস মার্কসবাদ এর ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে। এর আলোকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ চিন্তাবিদগণ পুঁজিবাদের টিকে থাকার ওপর তাঁদের মতামত ও তথ্য প্রদান করেন। এই নতুন তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিতর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এই এই ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কাঠামোবাদী মার্কসীয় চিন্তাবিদগণও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ প্রদান করেন।

কাঠামোবাদী মার্কিসবাদ প্রসঙ্গে দুঁজন তাত্ত্বিকের আলোচনা করব: তারা হলেন আন্তেনিও গ্রামসি ও লুই অ্যালথুসার। কাঠামোবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করার পেছনে একটি যুক্তি আছে। ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোবাদের সূত্রপাত ফার্দিনান্দ সসিঁওর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। যে কোন শব্দ একটি মূর্ত বা বিমূর্ত বাস্তবতাকে উপস্থাপন করে, তাই এটি একটি প্রতীক বা চিহ্ন। এই চিহ্ন নির্মিত হয় একটি প্রতীক ও তৎসংলগ্ন ভাবনাকে জোড়া দিয়ে। দুঁটোর কোনটাই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সুতরাং যে কোন কাঠামো তার অন্তভুক্ত উপাদানের সম্বন্ধিত সম্পর্ক দিয়ে তৈরী হয়, একটি বাদ দিয়ে আরেকটি অর্থপূর্ণ করা সম্ভব নয়, সতরাং এখানে একক আধিপত্যের কোন সুযোগ নেই। এই মতামতকে যদি আমরা মেনে নেই তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শকে এক সাথে করে সমাজ কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। একই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, মতাদর্শকেন্দ্রীক যে চেতনা তা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর যে বিপ্লবী আকাংখা তাকে অবদমন করা যেতে পারে বা নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে। তাহলে চেতনার যে সেতুবন্ধন নির্মাণের ভূমিকা তাকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। ব্যক্তির মনন-চিন্তা এবং তার সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে চেতনা, সেই চেতনাকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে দিয়ে মনন-ও চিন্তাকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে ধারিত করা যেতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের অঞ্চলগামী পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে সর্বহারা শ্রেণীর মনন-চিন্তাও চেতনাকে প্রভাবিত করে নিয়ন্ত্রন করা যায়। গ্রামসি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের দীর্ঘজীবনের অর্তনিহিত প্রেক্ষিতটি বুঝতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সম্পৃক্ত করে বা বুর্জোয়ার নির্বাচিত ভাবনা যেমন ভোগবাদকে সর্বহারার মনন ও চিন্তার মধ্যে প্রথিত করে স্থিতিশীলতার পক্ষে এক্রয়মত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বুর্জোয়া ভাবনাকে যখন শাস্তিপূর্ণ বা সমরোতার মাধ্যমে সমাজে বিস্তৃত করা হয় এবং তার মাধ্যমে শ্রেণী বৈরিতার ওপর একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয় তখন শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব আকাংখাকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করা সম্ভব। যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন পুঁজিবাদী সমাজের শাসকশ্রেণী বল প্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদীকাঠামোকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

অ্যালথুসার বলেছেন মতাদর্শগত রাস্তীয় কৌশলের এবং নিপিড়নমূলক রাস্তীয় কৌশলের কথা, যা দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ তার তীব্র শ্রেণী বৈষম্য বা শোষণকে আচ্ছাদিত করে চলমান থাকতে পারে। পাঠ্যপুস্তক সমাজের মূল্যবোধ বা সমাজের প্রাচলিত ভাবনা একটি শিশু ও কিশোরের মনন ও চেতনায় প্রবিষ্ট করে। শৈশবের সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে এই আচ্ছাদকরণ করা সম্ভব। সর্বহারা শ্রেণীর সত্ত্বান-সন্ততি পুঁজিবাদী সমাজের আকর্ষণীয় বিষয় যেমন ভোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, একইভাবে সম্পদ আহরণের আকাংখায় উদ্দীপিত হতে পারে। এখানেও বুর্জোয়া সমাজ চেতনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, ফলে চেতনা আপেক্ষিক অর্থে সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। শ্রেণী অবস্থানগত কাংখিত চেতনা এবং সর্বহারার প্রকৃত চেতনার মধ্যে দূরত্ব নির্মিত হতে পারে, যা পুঁজিবাদী সমাজকে টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এভাবে মতাদর্শ প্রভাবিত করার কৌশল যদি কাজে না লাগে, তবে নিপিড়নমূলক রাস্ত কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে প্রতিপক্ষের সম্মতি নিশ্চিতকরণে।

9. এখানে উপস্থাপিত আলোচনা নিম্নলিখিত দুটি গ্রন্থ ভিত্তিক করা হয়েছে:

Antonio Gramsci (1992), Selections From The Prison Notebooks, (eleventh printing), Lawrence Wishart: UK. (originally published in 1991). Louis Althusser (1993), Ideology and Ideological State Apparatuses, Verso: UK (originally published in 1990).

ফ্র্যানকফুর্ট চিন্তা প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর সূচনা লঞ্চে আবির্ভূত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজ চিন্তা সমূহকে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের চলমানতা বা টিকে থাকার অস্তর্ভিত কারণের উপর আলোকপাত করে। হার্বার্ট মারকুজ গুরুত্ব দেন এক বৈরোধিক চিন্তার উপর। পুঁজিবাদ সফল ভাবে বহুরৈখিক চিন্তাকে, যার মধ্যে বিদ্রোহ নিহিত থাকতে পারে, একবৈরোধিক চিন্তা পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই একবৈরোধিক করণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে ভোগবাদী সংস্কৃতি বিস্তৃত করনের মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এই চিন্তা প্রতিষ্ঠানের একজন জুরগেন হ্যাবারমাস আরও গভীর বিশ্লেষণ করেছেন একটি সমাজে আঙ়কাঠামোর চলমানতা বুঝতে, যা কিনা মার্কিসবাদকে নতুন প্রশ্নের মুখোযুথি করে। আধুনিক সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীলতার বিস্তৃতি একটি বড় বিষয়। ভেবার এই যুক্তিশীলতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন আধুনিক সমাজ নির্মাণের প্রশ্নে। ভেবার মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাখ্যা ও শ্রেণী বিভাজন করার সময় উদ্দেশ্যকেন্দ্রীক যুক্তিশীল কাজ, মূল্যবোধ কেন্দ্রীক যুক্তিশীল কাজ, গতানুগতিক কাজ এবং ভাবাবেগ প্রসূত কাজের কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীক যুক্তিশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। আমরা বৈজ্ঞানিক ভাবে তখনই যুক্তিশীল যখন আমাদের কার্মের লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য পৌঁছাবার নির্বাচিত পথের মধ্যে বিরাজ করবে বোধগম্য সম্পর্ক। যেমন আকাশে মানুষের বিচরনের জন্য দরকার উড়েজাহাজ, কোনো কল্পিত বাহন নয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য কেন্দ্রীক যুক্তিশীলতা জ্ঞানের মর্যাদার কাঠামোয় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু যুক্তিশীলতা বলতে শুধু আমরা উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর পথের সঠিকক্তাকেই বুঝাবো? আমর যখন কথাবার্তা বলি তখন আমাদের মাঝে যে সমবোতা বা বোঝাপড়া তৈরী হয়, সেটি কে কি আমাদের যৌক্তিক মনে হয় না? একজন দুঃস্থ লোকের প্রতি কারও সমবেদনা তৈরী হয়, তাকে কি আমাদের যৌক্তিক আচরণ বলে মনে হয় না? তাহলে তো আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনের পরতে পরতে যুক্তির আলাপচারীতা ছড়িয়ে আছে। আমরা যুক্তিশীলতা ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে থাকি। কার্যকরন সম্পর্ক বিশ্লেষণে আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তির শরনাপন্থ হই আর অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের যুক্তিশীলতার কথা বলে থাকি। তাহলে যুক্তিশীলতার সাথে সমবোতা বা একমত হওয়ার একটা বিষয় জড়িয়ে আছে। বক্তব্য প্রদানকারী ও বক্তব্য শ্রবণকারীর মধ্যে যদি সমবোতা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে একটি বক্তব্যের যৌক্তিক হয়ে উঠা দুর্কুল হয়। এই দৃষ্টি কোণের আলোকে হ্যাবারম্যাস আমাদের সাধারণ জীবন এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির সমবয়ে গড়ে উঠা কাঠামোবদ্ধ জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের ভাষাকেন্দ্রিক সাধারণ জীবনে ঐক্যমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় যা যুক্তিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় চলমান। কিন্তু সাধারণজীবন থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ কৌম সমাজে সমস্ত কর্মকাণ্ডে একসাথে গ্রাহিত থাকার পর তা ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অর্থনীতি ও রাজনীতি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং নতুন

-
10. Herbert Marcuse (2002), One Dimensional Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Routledge: London & New York (originally published in 1964).
 11. Jurgen Habermas (1984), The Theory of Communicative Action, Reason And The Rationalization of Society, Vol-1. Beacon Press: USA. (originally published in 1981).
 - ঞ. (1987) The Theory of Communicative Action, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, Vol-2, Beacon Press: USA. (originally published in 1981).

মাধ্যমের সৃষ্টি হয়েছে সমাজে, যা হলো অর্থ বা টাকা পয়সা এবং ক্ষমতা। আমাদের একাধিক কার্জকর্ম শুধু অর্থ ও ক্ষমতাকে ঘিরে হয় না। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ চালিত করার জন্য অর্থ ও ক্ষমতা একই আধিপত্য লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক নির্মিত হয়েছে চমৎকার বোৰাপড়া দিয়ে, ভাষা ব্যবহার যা অন্যতম উদাহরণ। আমরা এক সাথে চলতে পারি বা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি এই সমূহোত্তা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তা কি একই মানদণ্ডে নিরূপিত হয়? আমরা কি আমাদের স্বার্থাত্ত্বিত কাজ বা আধিপত্য বিস্তারের যে কাজগুলো করি, যেখানে আমরা সুস্থ বিশ্বেষণ করে আগাই, লক্ষ্য পৌঁছাতে যাতে ভুল না হয়। সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি, সেখানে কি আমরা সমূহোত্তা নির্মানের ধার ধারিয়ে কিন্তু যদি ধার না ধারি তাহলে তো বনিবনা হওয়াই দুঃখ হয়ে উঠবে? কিন্তু সমাজ জীবন তো সমূহোত্তা ছাড়া টেকা সম্ভব নয়। হ্যাবারমাস মনে করেন আমরা প্রতিনিয়ত বোৰাপড়ার কাজ করে চলেছি। আধুনিক জীবন যেমন অর্থ ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি নতুন ক্ষেত্র নির্মান করেছে যেখানে প্রতিনিয়ত তর্ক বিতর্ক হচ্ছে যুক্তিশীল সমূহোত্তা পৌঁছানোর। সেটি খবরের কাগজ থেকে শুরু করে উন্মুক্ত বক্তৃতা সব জায়গাতেই আমরা তা করে চলেছি এবং জনমত তার একটি বড় প্রতিফলন, তাহলে বুর্জোয়া সমাজকেও এই জনমতের সাথেও বোৰাপড়া করতে হবে সব ধরণের অসংগতিকে সহনীয় করে তোলার ক্ষেত্রে।

সমাজবিজ্ঞানের ধ্রুপদী পর্যায়ে অন্যতম তাত্ত্বিক এমিল দুর্কেইম ও ম্যাকস্ ভেবার। গোল্ডনার দৃষ্টিবাদী সমাজবিজ্ঞান ও ধ্রুপদী পর্বের তত্ত্ব সমষ্টিকে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু অভিহিত করেছেন। সমাজ বিভাজিত না সমাজ আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সমন্বিত, এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ শুরু থেকেই এবং তর্ক বিতর্কের একটি অন্যতম বিষয়। ক্রিয়াবাদ ও দৃষ্টিবাদের সমন্বয়ে জোড়ালো যুক্তি দাঢ় করানো হয় সমাজের আন্তঃনির্ভরশীলতা, ছিত্রিশীলতা সহ একটি ভারসাম্য যুক্ত সমষ্টি হিসেবে সমাজকে পরিচিত করে তুলতে। দুর্কেইম ইতিহাসের দিকে তাকান কিন্তু ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছান¹²। তিনি কৌম সমাজে দেখতে পান শক্ত বাঁধন, কেননা সেখানে সবার চিন্তার বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। সামাজিক চেতনা প্রকল্পাবে বিভাজন প্রাথমিক পর্যায়ের কৌম সমাজে। তিনি নাম দিলেন যান্ত্রিক সংহতি। কর্মকান্ডের দিক থেকে সমাজ বিভাজিত নয়। সামাজিক চেতনার সাদৃশ্যের বদলীতে সমাজের বাঁধন বা সংহতি শক্ত। এটি কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্যও প্রযোজ্য। কাজ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন খুবই সীমিত। এন্দিকে ধর্ম একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে সমজাতীয় চেতনা ভিত্তিক সংহতি নির্মাণে। দুর্কেইম সরল সমাজ থেকে জটিল সমাজের যে রূপান্তর, তা ব্যাখ্যা করেছেন জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির একটি ফলাফল হিসেবে। মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে শ্রম বিভাজন এসেছিল। এই শ্রম বিভাজনে কাজের সুযোগ বেড়ে গিয়েছিল এবং সমাজে ভালো একটা কিছু হলো, সুতরাং নেতৃত্ব ঘনত্ব বেড়েছিল। দুর্কেইম সমাজকে মনে করেন নেতৃত্বকার অর্থে ভালোর প্রতীক। সমাজ অন্তর্নিহিতভাবে পরিবর্তার আরক। শ্রম বিভাজনের ফলে অনেক নতুন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত, এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক যেন জৈবিক সূত্রে গ্রাহিত, তাই জৈবিক সংহতি। এই সমাজের বাস্তব উদাহরণ হল শিল্পায়িত সমাজ। ফরাসি বিপ্লবের পর শিল্পায়িত সমাজে নতুন মূল্যবোধ যুক্ত হয়, তা হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা। প্রশ্ন হল ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপ্তি কতটা হবে? এতটাই কি ব্যাপ্তি হবে যেখানে অভিন্ন কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা ন্যায়বোধ থাকবেনা? এমনিতেই গতানুগতিক সমাজ

12. Emile Durkheim (1994), The Division of Labour in Society, Macmillan: Printed in China. (Macmillan edition was first published in 1986).

পরিবর্তনের ফলে একটি নৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আর নৈতিক শূন্যতা সামাজিক সংকট নির্মাণ করে যা এক সময়ে বিশ্বজীবনের পরিণত হয়। সামাজিক স্থিতিশীলতার বিষ্ণ ঘটে এই প্রক্রিয়ায়। ডুর্ধিম এক্ষেত্রে ন্যায় বিচার বা ভালো-মন্দ যাচাই করার সংস্কৃতির ওপর জোর দিলেন। অর্থাৎ সমাজে একসাথে থাকতে গেলে ভালো-মন্দের একটি মানদণ্ড থাকতে হবে না হলে তৈরি হবে এক ধরণের নৈরাজ্য। সমাজের আন্ত-নির্ভরশীলতা চূড়ান্ত অর্থে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, দরকার নৈতিক মানদণ্ডের। এভাবেই ডুর্ধিম সমাজের নতুন সংজ্ঞা দিলেন, এবং সব কিছু ব্যাখ্যা করলেন চাহিদার বা প্রয়োজনের নিরিখে, এভাবে আমরা দেখতে পাই ক্রিয়াবাদ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার।

ধ্রুপদী পর্বের আরেকটি বিশিষ্ট নাম ম্যাকস ডেবার¹³। তর্ক-বিতর্কের তিনটি সূত্র তার বিশ্লেষণে দেখতে পাই। প্রথমটি হল সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির যে স্বাতন্ত্র তা তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত: সমাজ কি তা বিশ্লেষণে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়া সামষ্টিক সমাজের চাইতে, তৃতীয়ত: সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেয়া। প্রথম বিষয়টি ইতিমধ্যে কিছুটা বিশ্লেষিত হয়েছে এবং শেষের দিকে আরো কিছুটা নজর দেয়া হবে। দ্বিতীয় বিষয়টিও আরো কিছুটা পর দৃষ্টি দেয়া হবে। ইউরোপের গতানুগতিক সমাজ যা প্রিস্টধর্ম কর্তৃক জোরালোভাবে প্রভাবিত ছিল, একসময় উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়। নতুন সমাজ আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ। এই নতুন সমাজে মানুষের আচরণ যুক্তিশীল হয়েছে এই মর্মে যে তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মনোযোগী সঠিক পথ বেঁচে নেয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকরণ সম্পর্কের আলোকে যে যুক্তিশীলতা তা হলো যুক্তিশীলতার মানদণ্ড, এতে করে মানুষের অন্যান্য আচরণ সমূহ যেমন মূল্যবোধ তাড়িত বা আবেগ প্রসূত তার গুরুত্ব অনেকটাই প্রাপ্তিক হয়ে গেলো। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিস্টায় ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার আবির্ভাব। এই ধারা প্রাচীন ক্যাথলিক ধারা থেকে আলাদা। এ ধারায় পরলোকের পাশাপাশি ইহলোকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ শুধু প্রার্থনা থেকে আসবেনা, ইহলোকের সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমেও সৃষ্টিকর্তার আনুকূল্য ও আশীর্বাদ পাওয়া যাওয়ার কথা এই নতুন ধারায় বলা হয়েছে। এই নতুন মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানদণ্ড পুঁজিবাদের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হল। পুঁজিবাদী কর্মকান্ড এক ধরনের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পেলো। এই ধরনের ব্যাখ্যায় ইউরোপীয় ভাববাদের কিছুটা হলেও প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষ যখন নৈতিক বলে অনুপ্রাণিত হয় তখন আবেগাশ্রিত হয়ে কাজটি সে করে, তার উদ্দীপনা তো থাকেই আরো ধর্মের অনুমতি থাকাতে তা আরও বেগবান হয়। আমরা সহজেই বস্তবাদী বিশ্লেষণ থেকে এই ধরনের বিশ্লেষণের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারি।

গোল্ডনার চতুর্থ পর্ব হিসেবে দেখিয়েছেন ক্রিয়াবাদী কাঠামোবাদ। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করেছেন¹⁴, ক্রিয়াবাদের প্রধান যে সমস্ত ধারণা তা সবই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তৎকালীন মার্কিন সমাজে এই তত্ত্বের প্রাপ্তিকর্তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন গোল্ডনার। ক্রিয়াবাদ

-
- 13. Max Weber (1947), *The Theory of Social and Economic Organization*, Free Press; USA
ঐ (1992) *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Routledge: USA. (originally published in 1930).
 - 14. Talcott Parsons (1940), *The Structure of Social Action*, Free Press: USA. (originally published in 1937).
ঐ (1991) *The Social System*, Routledge: UK. (originally published in 1951).

সমাজবিজ্ঞানে সূচিত হলেও ন্বিজান শাস্ত্রে এর বিশেষ বিকাশ ঘটে বিশেষ করে র্যাডক্লিফ ক্রাউন ও ম্যালিনাওফ্কীর হাতে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ এর আগে মিথস্ক্রিয়াবাদের বিশেষ বিকাশ ঘটে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগকে কেন্দ্র করে। ইউরোপে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ধারায় সমাজের কাঠামোগত চরিত্র বা সমাজের প্রভাব সৃষ্টি করার প্রভৃতি ক্ষমতার ওপর বিস্তর লেখা হয়েছে, সেই তুলনায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ পেয়েছে। ব্যক্তি সমাজকে তার মত করে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং বাস্তবতার আলোকে সে তার কর্মপদ্ধা নির্ধারণ করে- এই বক্তব্য মিথস্ক্রিয়া বাদের সাথে সংগতিপূর্ণ। সমাজের নীতিমালা নিজ থেকে বাস্তবায়িত হয় না বরং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে মিথস্ক্রিয়া হয় সেই বাস্তবতায় সমাজের নীতিমালা টিকে থাকে। প্রতি মন্তুর্তে সমাজ পুনর্নির্মিত হয় তবুও একইভাবে নয়, বরং বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে, যেখানে ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতার অভিনবত্ব ইর্ষণীয়। যদি সহজে বলি, অকারণের মধ্যে কারণ খুঁজে ফেরার যে ক্ষমতা তা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ, সে সমাজের হাতে নিয়ন্ত্রিত কোন যন্ত্র নয়। সমাজকাঠামো-বাস্তবতা-ব্যক্তি এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে যে প্রেক্ষিত নির্মিত হয়, তাই নির্ধারণ করে সমাজের চলমানতা। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা আছে, যা উপযোগিতা তত্ত্বে বলা হয়েছে। হোমানের বিনিময় তত্ত্ব মানুষের একান্ত চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং আচরণবাদের আলোকে মানুষের কর্মকাণ্ড ও সামাজিক সম্পর্ক বুবাতে চেয়েছে। বিনিময় তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে পরবর্তীতে এই মর্মে যে এখানে সমাজ কর্তৃক যে প্রতিবন্ধকর্তা সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তির ইচ্ছাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করে, তা উপেক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যৌক্তিক পছন্দের তত্ত্ব উল্লেখ্য। প্রাতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ আরও বিস্তৃতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিস্বত্ত্ব নির্মিত হয়, তা বিশ্লেষণ করেছে। তবে বোঁকটা হচ্ছে এমন যে, সমাজ টিকে থাকছে ব্যক্তির পরিসীমায়, সুতরাং চূড়ান্ত বাস্তবতা হলো ব্যক্তি। আমরা ব্যক্তির আয়নায় সমাজকে দেখি। ব্যক্তিত্ব নির্মাণে সামাজিক প্রেক্ষিত একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু শেষ ফলাফল ব্যক্তির স্বত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব।

পারসপ ১৯৩৭ সালে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কাঠামো সংক্রান্ত পুস্তকটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়টি ছিল, একজন ব্যক্তি কি প্রক্রিয়ায় তার একটি কাজ বেছে নেয় এবং তা সম্পন্ন করে। বলা প্রয়োজন যে পারসপ তার এই তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে একাধিক বিরাজমান তত্ত্বের সমাহার ঘটাননি শুধু, সমাজবিজ্ঞানের দেখার যে স্বক্ষয়তা তা চিহ্নিত করেছেন। একদিকে অর্থনীতির উপযোগিতাবাদ, অন্যদিকে সমাজের সংক্রান্তিক কাঠামো এই দুইয়ের সমন্বয় করে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি নিজস্ব চাহিদা কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা হতে পারে না। সমাজের যে ভালো মন্দের ধারণা তার সাথে একটা বোঁকাপড়া করতেই হয়। ব্যক্তি তার অন্তর্গত প্রেরণার ফলশ্রুতিতে উদ্যোগী হয় একটি উদ্দেশ্য সাধনে। আধুনিক যুক্তিশীলতা অনুসারে সে সবচাইতে সঠিক পথটি বেছে নেয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। নির্বাচিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিজস্ব স্বার্থ তাড়িত হবে, কেননা ব্যক্তি সেই কাজটি করতে চায় যাতে তার ব্যক্তিগত লাভ সবচাইতে বেশি হতে পারে। ঠিক এই জায়গাতেই পারসপ আঙুল তুললেন। তিনি বললেন মানুষের চাওয়া পাওয়ার যে চেতনা তৈরি হয় তা তো সমাজের মধ্যে বসবাসরত অবস্থাতেই হয়। তাহলে সমাজের ভালো-মন্দের ধারণা থেকে সে নিজেকে কিভাবে সরিয়ে রাখতে পারে? ডুর্খিমের কথার সূত্র ধরে যদি আমরা বলি যে সমাজ একটি নৈতিক সমষ্টিও বটে। অর্থাৎ ভালো খারাপের ধারণা বিহীন মানুষ একত্রিত হতে পারবে না, তখন ব্যক্তির স্বার্থ তাড়না আকাশচুম্বী হওয়াটা একটি কঠিন বিষয়। ব্যক্তির উদ্যম, উদ্যোগ বা ইচ্ছাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু তা কোন শূন্যতার মধ্যে ঘটে না, একটা সামাজিক বেঁচোনীর মধ্যেই সংঘটিত হয়। পারসপ যখন ব্যক্তিভিত্তিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছিলেন, তখনই তাকে সমাজে বিদ্যমান একাধিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিবিধ পেশা,

সেগুলির মর্যাদা, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ইত্যাদিকে সঠিক গুরুত্ব দিয়ে তত্ত্বটিকে গ্রহণযোগ্য করতে হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে যে পারস্পরিকতা থাকে তা দিয়ে সমাজের স্থিতিশীলতাসহ ভারসাম্য রচিত হয়। কিন্তু ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনীতি সমন্বয়ে যে সমাজব্যবস্থা সোটির বাস্তবতা আরো বিস্তৃত এবং জটিল। সুতরাং একই শতাব্দীর ৫০ এর দশকে তিনি রচনা করলেন পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থার ওপর তাঁর গ্রন্থ। কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ একটা সম্পূর্ণতা অর্জন করল। এই সমাজ ব্যবস্থা অন্তর্গত ভাবে ভারসাম্য যুক্ত, তাই যখনই কোন ঝুঁকি তৈরি হয়, এই ব্যবস্থা তা মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন নতুন প্রতিষ্ঠান, এখানে জীবিত মানুষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, একই সাথে বিমূর্ত সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বা রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে মানুষের কর্মকাণ্ড করতগুলো সুনির্দিষ্ট ধরনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সমাজ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত করতগুলো প্রয়োজনকে নিশ্চিত করে, যেমন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, নির্বাচিত উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন, সমাজের বাঁধন ধরে রাখা বা সমাজ কি প্রশালীতে সক্রিয় থাকবে তা নির্দেশ করা। সমাজতন্ত্রের বিপুরী ধারার যারা অনুসারী তাদের দৃষ্টিতে পারস্পর এর বিশ্লেষণ পুঁজিবাদী সমাজের স্বপক্ষের মতাদর্শগত বয়ান। তিনি যে সর্বজনীন প্রকরণ প্রবর্তন করেছেন, যেমন অর্জন ভিত্তিক সমাজ বনাম আরোপিত বিভাজন ভিত্তিক সমাজ, তাতে সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণী দ্বয় বা রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্঵য় থেকে উৎসারিত সামাজিক ঘটনাবলী গৌণ মনোযোগ পেয়েছে বা পাইনি একেবারে। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বয় ভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলি প্রাণিক মনোযোগ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সমাজতন্ত্রে রক্ষণশীল এবং বিপুরী ধারা সমান্তরাল ভাবেই চলমান।

ফ্রপদী সমাজবিজ্ঞানের আমল থেকেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক আলোচনা ও সমষ্টি কেন্দ্রিক আলোচনা চালু আছে। এই তর্কটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনেক কারণে। ব্যক্তি কর্তৃত স্বয়ম্ভু, এই প্রশ্নটি ব্যক্তিস্থাত্ত্বের প্রচারক যারা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিস্থাত্ত্ব তত্ত্বের চূড়ান্ত রূপে সমাজকে একটি নিছক কল্পনা বলে দাবি করা যায়, দৃশ্যমান হলো জৈবিক ব্যক্তি। এই ব্যক্তির অনুভূতি, আকাংখা, উদ্যম ইত্যাদি দৃশ্যমান। সমাজ দৃশ্যমান নয় সেই অর্থে। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাই মূলত সমাজের ইচ্ছা অনিচ্ছা। এর উল্লেখ ভাবনায় সমাজকে প্রাচন্দ শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। যদিও ব্যক্তি সমষ্টির সমন্বয়ে সমাজ কিন্তু চরিত্রগতভাবে এটি আলাদা। রসায়ন শাস্ত্রে এই ধরনের অনেক উদাহরণ আছে, দুটি মৌলিক গ্যাস মিলিত হয়ে যে যৌগিক গ্যাস তৈরি করে তার গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা হয়, যদি এক একটি মৌলিক গ্যাসের সাথে তুলনা করা হয়। সামাজিকীকরণ একটি বড় উদাহরণ সমাজের ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্য। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে এই বিষয়টি একটি বড় ধরনের অভিমানসিত বিতর্ক। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ্যান্থনী গিডেস এই বিতর্কের একটি সুরাহা করতে চাইলেন^{১০}। তিনি ব্যক্তি অন্তর্নিহিত উদ্যমকে সামনে নিয়ে আসলেন। এই উদ্যম ব্যক্তির যে শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ। একজন ব্যক্তি অন্তের মত চলেন। সে তার পচন্দ-অপচন্দ, ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তার কাজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটায়। অবশ্যই সমাজের রীতিনীতিকে আমলে নিয়েই তার বিচরণ, কিন্তু তাকে পুতুলের সাথে তুলনা করা চলে না, তার নিজস্ব চলার কোন ক্ষমতা নেই। ব্যক্তি আছে বলেই সমাজের রীতিনীতির বাস্তবায়ন আছে আবার ব্যক্তি তার বাইরের সমাজের ভালো-মন্দকে আমলে নিয়েই চলতে অভ্যন্ত। তিনি কাঠামোবাদী এবং মিথ্যাবাদী বা ব্যক্তিস্থাত্ত্বাদীদের মধ্যে একটি ভারসাম্য নির্মাণের চেষ্টা করেছেন বলা যায়। তত্ত্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাহন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই দৃষ্টি ভঙ্গ বস্ত্বাদী চেতনা থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস সম্পদ আর রাজনৈতিক ক্ষমতার

15. Anthony Giddens (1984), *The Constitution of Society*, Polity Press: UK.

উৎস বৈধ কর্তৃত। ব্যক্তির অভিনিহিত শক্তি এই সম্পদকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। সমাজ প্রতিদিন নবায়নের বা পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে চলমান থাকে, আর সেই নবায়নের কাজটি সম্পাদিত হয় ব্যক্তি কর্তৃক। সমাজের মতাদর্শ সহ প্রাচীক বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠান অর্থপূর্ণ কি তা ধরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। যেমন ধর্ম তার মতো করে অর্থপূর্ণ কাজের তালিকা প্রদান করে, রাজনৈতিক মতাদর্শ কাঁথিত সমাজের অর্থ নির্মাণ করে। আর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানদের কাজগুলো সম্পূর্ণ করার প্রাসংগিক সহায়তা। সমাজে যে আধিপত্য তৈরি হয়, তাকেও অর্থপূর্ণ ভাবেই পরিচালিত হতে হয়। অর্থাৎ আধিপত্য যদি অর্থপূর্ণ ও বৈধ না হয় তবে তা দীর্ঘায়িত হয় না। সুতরাং সমাজের নীতিমালাগুলো বিমৃত সহায়ক হিসেবে ক্রিয়াশীল আর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় তা রূপান্তরিত হয় প্রকৃত সমাজ বাস্তবতায়, তা কখনও প্রাথমিক মুখোমুখি সম্পর্কে, কখনও বা অদ্য বন্ধনের মধ্যে দিয়ে, যা থেকে তৈরি সামাজিক সংহতি বা বন্ধন এবং সমাজ ব্যবস্থা কেন্দ্রীক সংহতি বা বন্ধন।

দ্রষ্টব্যাদী সমাজবিজ্ঞানকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে আরও জোরালো ভাবে¹⁶। ফ্রাঙ্কফুট চিন্তা প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজ বিশ্লেষণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবিকল ব্যবহার নিয়ে সংশয় প্রকাশ ও সমালোচনা দুটোই করেছিল। মানুষের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে কি প্রাকৃতিক বস্তুর সাথে তুলনা করা চলে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ না ব্যাখ্যা, এই দৈত্যতার জটিলতাকে মাথায় রেখে অনেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি সমাজ বিশ্লেষণে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বলেছেন। আমরা ইন্দ্রিয় উপলক্ষ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি বটে, কিন্তু তারপর যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তার নামকরণ করা হয় অনেক সময় নৈতিক অর্থে যা সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে তোলে। যেমন সামাজিক বৈশম্য কি একটি নিরপেক্ষ নামকরণ না নৈতিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত নামকরণ তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সমাজে সমাজে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং সমাজ পরিবর্তনে ইতিহাসের প্রভাব সমাজবিজ্ঞান ভাবনার মধ্যে আপেক্ষিকতা যুক্ত করেছে, অর্থাৎ মানুষের দ্রষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস যদি এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে আলাদা হয় তাহলে একই তত্ত্ব কি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে? যেমন: বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা আর পাশ্চাত্যের নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা কি একই হবে? একইভাবে আধুনিকতার ধারণা পাশ্চাত্যে যা প্রচলিত তা কি দক্ষিণ এশীয় সমাজের জন্য একই থাকবে? না এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতি তা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করবে? এই জাতীয় প্রশ্ন সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনীন তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছে, যেমন আধ্যাত্মিকতার সংস্কৃতি বাংলাদেশের শ্রেণিভেদিক রাজনীতিকে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করেছে। একই ভাবে ঐতিহাসিক ভিন্নতাও সমাজতত্ত্ব প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ইংগিত করেছে। এ সমস্ত কারণে উত্তর দ্রষ্টব্যদের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বাস্তবতা যাচাই চলবে কিন্তু পর্যবেক্ষকের মনন, সংস্কৃতির ভিন্নতা বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিন্নতাকে ঝীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এই প্রবন্ধে উদ্বৃত্ত সর্বশেষ বিতর্ক উত্তর আধুনিকতা প্রসঙ্গ। সমাজবিজ্ঞানেও উত্তর আধুনিকতার বিতর্ক অনেকটা গুরুত্ব লাভ করেছে। যে কোন তত্ত্বের সর্বজনীনতার দাবী প্রশ্নবিদ্ধ করেছে উত্তর আধুনিক চিন্তা। এই মতবাদ প্রবর্তন করেছে বহুত্ববাদের চিন্তা। ফরাসী দু'জন চিন্তাবিদ দেরিদা এবং লিওতার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, যাঁরা কাঠামোবাদকে এবং মহাআখ্যানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, এবং তাঁদের মতামত উত্তর আধুনিক তত্ত্বের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে¹⁷। ভাষাতত্ত্বের কাঠামোবাদ বাক্যের কাঠামোর মধ্যে অর্থের অনুসন্ধান করেছে।

16. Morrow এবং Brown (1994), প্রাঞ্চিক

17. Jacques Derrida (1981) Dissemination, The Athlone Press: USA. (originally published in 1972); Jean-Francois Lyotard (1984), The Post Modern

একটি শব্দ একই সাথে একটি প্রাতীক এবং তা নির্মিত হয় নির্মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী। এভাবে অভিধানের অঙ্গর্গত শব্দাবলী বিভিন্ন অর্থের প্রাতীক রূপ হিসেবে স্বীকৃত। এভাবে নির্মিত প্রাতীক সমূহ নিয়ে নিয়মসিদ্ধ বাক্য গঠনের মধ্যে দিয়ে ভাষা কাজ করে যা প্রাত্যহিক ভাব আদান প্রদানের একটি অন্যতম মাধ্যম। দেরিদা দেখালেন যে ভাব বা অর্থ একটি বাক্যে যতটা প্রাকাশিত অনেকটাই অপ্রাকাশিত। যেমন কোন বিষয়ে মতান্বেততা, প্রকারান্তরে প্রাথমিক মতের প্রয়োগকে স্থগিত করে দেয়। আবার অক্ষরমালার মধ্যে এই অপ্রাকাশ্যের বিষয়টিও নির্দেশনযোগ্য। আমরা যখন 'ক' অক্ষরটি ব্যবহার করছি তার সাথে অপ্রাকাশিতভাবে 'খ' উপস্থিতি আছে। দার্শনিকভাবে বললে অনুপস্থিতির উপস্থিতির সন্ধান বা উল্টটা। তাহলে কাঠামোর মাঝে যতটা উপস্থিতি ততটাই অনুপস্থিতি। সুতরাং অনুপস্থিতির কার্যকারিতার স্বীকৃতি কাঠামোবাদকে দুর্বল করে দেয় এবং উভর আধুনিকতার একটি তাত্ত্বিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যেমন দীর্ঘদিন ধরে একজন ব্যক্তির পরিচয় বর্ণণায় তার নিজের নাম ছাড়া শুধু পিতার নাম অত্রুভুক্ত করাটাকে পুরুষতাত্ত্বিক মানসিকতার অনুপস্থিতি প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিতর্কের সারমর্মকে অনেক সময় কাঠামো বনাম ব্যাখ্যার প্রতিযোগীতা হিসেবেও দেখা যায়। সমাজবিজ্ঞানী গিডেন্স অনুপস্থিতির মতামতকে গ্রহণ করলেও, ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত অর্থ নির্মাণ করে বা অর্থের নিজস্ব কোন ভাস্তব নেই, এমনটা মেনে নিতে নারাজ এবং ব্যাখ্যা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি দৃশ্যমান সামাজিক প্রেক্ষিত এর প্রসঙ্গ টানলেন। তার মানে ব্যক্তির মননে যেমন ব্যাখ্যা নির্মিত হয়, তা অর্থবহ করতে প্রয়োজন দৃশ্যমান সমাজ প্রেক্ষিত। অনুপস্থিতি বা ব্যাখ্যা এই জাতীয় বিষয়কে যদি কোন তত্ত্বের অর্থ অনুধাবনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় হয় তবে এমন প্রশ্ন অমূলক নয় যে, এতদিন ইতিহাস যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার পাল্টা ব্যাখ্যা নির্মাণ করা সম্ভব এবং সেইভাবে সমাজতত্ত্বের ভিত্তি ব্যাখ্যা দেওয়াটাও সম্ভব।

সমসাময়িক সমাজের সার্বিক জ্ঞান-চর্চার পর্যালোচনা করে লিওতা তাঁর উভর আধুনিক বিষয়ক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। আধুনিক সমাজ জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বলেও পরিচিত। মানুষ তার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে কার্যক শ্রম যুক্ত করে, জড় বন্ধুর সমাগম ঘটায়, প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগায়, এতেসব করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার চিন্তা, মনন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। জ্ঞান-চর্চা সব যুগেই পরিলক্ষিত, কিন্তু এর প্রকারভেদ আছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। আমরা কিভাবে আমাদের জীবনকে, সমাজকে, বিশ্বব্যাপ্তকে ব্যাখ্যা করি তাকে যিরে তৈরি হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীনকালে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল, পরবর্তীতে তা বিশৃঙ্খল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আরও পরে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বের মাত্রায় ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিশীলতাকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। আবার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান শত্রিকে প্রাধান্য দিয়ে পরম জ্ঞানের ধারনার জন্য দিয়েছে এবং দেখাতে চেয়েছে যে যাবতীয় জ্ঞান-চর্চা কোন না কোন ভাবে এই পরম জ্ঞান হতে উৎসারিত। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা আছে একই ভাবে বিতর্কও বিদ্যমান। একেকটি দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা বলে অভিহিত করি তাহলে আমাদের জ্ঞান জগৎ নির্মাত হয়েছে বিবিধ বর্ণনার সময়ে। আমাদের জীবন, সমাজ বা জগৎ নিয়ে যেমন, আছে ধর্মীয় বর্ণনা, তেমনি আছে বিজ্ঞান

Condition: A Report on Knowledge, Minnesota Press: USA. (originally published in 1979); Ben Agger (1991), 'Critical Theory, Post Structuralism, Post Modernism: Their Sociological Relevance', *Annual Review of Sociology*, Vol. 17; Michele Lamont (1987), 'How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida', *American Journal of Sociology*, Vol 93, No. 3.

ভিত্তিক বর্ণনা। আবার প্রতিটি বর্ণনার একটি মৌলিক ধারনা আছে, যাকে ভিত্তি করে আমরা ব্যবহারিক বর্ণনা নির্মান করি। যেমন প্রগতির ধারনা একটি মৌলিক ধারনা যার মাধ্যমে আমরা বিগত শতাব্দীর বিবিধ ঘটনাবলীকে একত্রিত করে একটি অভিন্ন ইতিহাস রচনা করেছি। যদি দেখানো যায় যাকে আমরা প্রগতি বলে ধারনা করছি, তা মূলত প্রগতি তো নয়ই বরং উল্টো কোন কিছু হবে, তখন মৌলিক ধারনার প্রত্যয়টি দুর্বল বা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। যেমন বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববুদ্ধ মানুষের চেতনার প্রগতির দাবীকে প্রশংসিত করেছে। আবার একেকটি বর্ণনার একটি অভিন্ন কাঠামো আছে। এখানে একজন বঙ্গ ও একজন শ্রোতা। যে কোনো বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে বঙ্গ ও শ্রোতার একটি বিষয়ে ঐক্যমতের ওপর। যদিও বিজ্ঞান প্রমাণভিত্তিক একটি শাস্ত্র কিন্তু বঙ্গ-শ্রোতা বা প্রস্তাবক এইভাবে কাঠামো এখানেও প্রযোজ্য। সুতরাং সব বর্ণনার একটা অভিন্নতা আছে যা তাদের প্রাসঙ্গিকতাকে স্থাপন করে। তার ওপর একটি বর্ণনার প্রনালী দিয়ে আরেকটি বর্ণনার প্রনালীকে পরীক্ষা করাটাও বাস্তবসম্মত নয়। আমরা জিনিসের ওজনকে ভেটাবে মাপতে পারি মানুষের ভালোভাবে একই ভাবে মাপতে পারিনা, যদি আমরা ভালো মানুষ বলে একটি প্রত্যয়কে গ্রহণও করি সর্বসম্মতভাবে। অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চা যতটা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত তার চেয়ে বেশি ব্যাপৃত তার প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ে। কোন জ্ঞানকে প্রয়োগ করে যদি অর্থনৈতিক সম্বন্ধি ঘটানো যায় তবে সেই জ্ঞান কতটা সত্যের মাপকাঠিতে উন্নীন তা অপ্রধান, বরং তার ব্যবহারিক মূল্য সেই জ্ঞানকে মহিমাপূর্ণ করে তোলে। এই ভাবে উভর আধুনিক যুগের জ্ঞান-চর্চার মানচিত্র নির্মান করেছেন, যা কিনা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিচ্ছে জ্ঞানসমূহকে মূল্যায়নের ব্যাপারে। যেমন প্রায়োগিক সমাজবিজ্ঞান অনেক বেশি আদৃত তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানের চাহিতে।

উপসংহার:

প্রবন্ধের একটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে কিছু মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হলো। পাঠক বিতর্কের সমাধান প্রত্যাশা করে। এই প্রবন্ধ সেই উদ্দেশ্যে রচিত নয় এবং বিশেষ বিতর্ক বা বিতর্কসমূহের বিশদ বিশ্লেষণেও উদ্যোগী নয়। বরং লেখকের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রশ্ন উঠতে পারে এই বর্ণনার উপকার কি? ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি উপকৃত হবে বলে আমার ধারনা। আমার দীর্ঘদিনের শ্রেণীকক্ষের পাঠদান প্রক্রিয়ায় যে তাত্ত্বিক উপলব্ধি সমূহ তার একটি সংকলন বলা যায়। পাশাপাশে অনেক তাত্ত্বিক মনে করেন যে সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ সংক্রান্ত মৌলিক ধারনার বা অনুমানের ওপর যে সব বিতর্ক তার চূড়ান্ত সমাধান সম্ভব নয়, কেননা নুন্যতম অনুমানহীন সমাজবাস্তবতার বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বসমূহের সমান্তরাল যাত্রার চূড়ান্ত অবসান ঘটানো একটি দুর্ক কাজ আজ-অদী।

সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রারম্ভিক গ্রন্থে একাধিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় যে দেখবাব আপেক্ষিকতা এখনও বিরাজমান। ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নামকরনের বেলায়, সামাজিককরন প্রক্রিয়ার উপস্থিতির বেলায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন এর বেলায় বা সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায়। যেখানে ঐক্যমত নেই সেটি হলো প্রতিষ্ঠানের আন্তর্সম্পর্ক আলোচনায়, সামাজিকীকরনে বিভাজন সংক্রান্ত আলোচনায় বা সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ভিন্নতর আলোচনায়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান আলোচনা বিতর্ক কেন্দ্রীক হবে, এমনটাও একটি তাত্ত্বিক উপলব্ধি বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়।

Building Sociological Theory in the Global South: Problems and Prospects

Dr. Lipon Mondal*

Abstract

This paper explores the historical and contemporary status of sociological theory in the global south. In doing so, it examines three research questions. First, what social forces did contribute to making, remaking, or ending sociological theory in the global north? Next, what societal factors did impede the development of sociological theory in the global south? Third, how can sociologists in the global south build sociological theory? This article surveys northern sociological theories best known to date to examine the first question. In particular, it explores the complete trajectories (their birth, development, and crisis) of two grand theories in northern sociology called Functionalism and Marxism. In investigating the second and third research questions, this paper traces the historical status of southern sociological theory by surveying the extant sociological literature from Asia, Africa, and Latin America. It deploys historical and comparative methodological approaches to scrutinize the global literature on sociological theory. One of the article's central findings is that while northern sociological theories emerged, expanded, and ended due to the structural necessities of northern societies, southern sociological theories were unseen because of the absence of such needs in southern societies. Another finding shows that although southern sociology lacks sociological theory, it may produce new sociological theory by drawing on indigenous philosophies, postcolonial studies, and emerging global realities. Overall, this study critically examines the theoretical trajectories in western sociology and the challenges and possibilities of theory building in southern sociology.

Keywords: Sociological Theory, Theory Building, Western Sociology, Southern Sociology, Functionalism, Marxism, Asia, Africa and Latin America.

* Associate Professor, Department of Sociology, University of Dhaka.
Email: lipon@du.ac.bd

Introduction

This study¹ investigates the historical and contemporary status of sociological theory in the global south². In doing so, the article examines three research questions. First, what social forces did contribute to making, remaking, or ending sociological theory in the global north? Next, what societal factors did impede the development of sociological theory in the global south? Third, how can sociologists in the global south develop sociological theory? To examine these questions, this paper surveys northern sociological theories best known to date. In particular, I follow the trajectories (their birth, development, and crisis) of the two most influential northern sociological theories called Marxism and Functionalism. The article also traces the historical status of southern sociological theory by inspecting the extant global literature³. It deploys historical and comparative methodological approaches to scrutinize the literature on global sociological theories.

This study has several key findings. First, the paper shows that northern sociological theories emerged, developed, and declined due to the internal demands of northern societies. However, the article explores that southern sociologists still need to trace such needs that could produce new theories in southern sociology. In all cases, southern sociologists used “ready-made” northern sociological theories to understand their societies. Southern sociology, more particularly South Asian sociology, lacks indigenous sociological theories for several reasons. I explore nine such reasons for South Asia. These included (1) long-lasting agrarian practice, (2) oral epistemological tradition, (3) lack of systematic

-
1. The idea of this article originated from a theory course paper (*The Status of Sociological Theory in Non-Western Societies*) at Virginia Tech in 2016. Later, I reworked the article in June 2023 to give a public lecture for the Nazmul Karim Study Centre at the University of Dhaka. I further revised the paper by incorporating valuable feedback from the discussants/audiences and the reviewers to submit it to the *Journal of Sociology*.
 2. Here, the global south refers to non-western societies (Asia, Africa, and Latin America), and the global north denotes western societies (primarily Western Europe and North America). In this paper, I use northern sociology to refer to western sociology and southern sociology to indicate non-western sociology.
 3. This article is part of an ongoing book project and is still confined to the literature survey. I plan to collect primary evidence from 20 selected countries of the three continents (Asia, Africa, and Latin America), using the International Sociological Association’s list of 43 non-western nations with robust sociology programs. I will interview 50 prominent sociologists from those sampled countries. Additionally, I will conduct a short survey to collect data from a wide range of theory stakeholders from northern and southern countries.

philosophy and generalization, (4) absence of social reformative and technological revolution, (5) despotic formation of the intellectuals, (6) the land of hybridized worldview, (7) dependent industrialization and urbanization, (8) displaced epistemology in society and academia, and (9) epistemological fault lines in the knowledge system.

This article offers six guidelines for building sociological theories in the global south, particularly in South Asia. The prescriptions are as follows. First, South Asian sociologists may build on local philosophical schools to develop macro⁴ sociological theory. This practice is found in how Marx drew on Hegelian philosophy, Durkheim on British empiricism, and Weber on Kantian philosophy. Next, South Asian sociologists may draw on the critical insights of contemporary postcolonial studies to build sociological theory to explain northern and south societies and their historical connections. Third, they may integrate all forms of southern and northern Marxist traditions⁵ to frame a unified Marxist sociological theory. Next, they may work on developing middle-range theories, as suggested by Merton (1968), based on local or global empirical evidence. Fifth, they may produce new ideas to understand the emerging AI-dominated society or AI capitalism. Lastly, South Asian sociologists may study the relationship between human society and the universe, knowing about the current trend of commodification and privatization of space or space capitalism.

The rest of the paper consists of four sections. In the next section, I will discuss the significant traditions of northern sociological theories that emerged to explain western societies. The following section will identify major obstacles to producing sociological theories in southern societies. The fourth section will offer insights into the possibility of developing sociological theories in southern societies, including South Asia. The last section will hold a concluding comment on the paper.

Sociological Theory in The Global North: Origin, Development and Crisis

We all know that sociology—a specialized branch of knowledge that systematically studies human society—emerged in the western world due to significant social forces, such as the Renaissance, Enlightenment,

-
4. I cast doubt on postmodern or poststructural ideas regarding the end of grand theories. Like Wallerstein (1997, 2001), Burawoy (2007, 2011), and Ritzer (2011), I believe that a serious intellectual effort by a passionate group of scholars can build new grand theories in sociology. I also posit that each society has its own theory, but some people need to be there to discover it.
 5. I find at least 11 Marxist traditions listed in the subsection on Marxism.

French Revolution, Reformation Movement, Industrial Revolution, and The United States Bill of Rights. These forces brought massive social changes to western societies. The formal father of this discipline—often credited to French historian of science August Comte—was heavily attracted by these changes. Comte felt the demand for a new science to explain the changing western world. He created this new discipline by drawing primarily on the ideas of the socialist intellectual traditions of France. He labeled the discipline as a new religion of human society—a religion that would produce systematic knowledge to understand societies in order to maintain social order and peace. Comte's major contribution to sociology is his positivist approach to studying social order (i.e., social statics) and social changes (i.e., social dynamics). He deployed historical, comparative, and observational methods to study such social phenomena.

Contemporary to Comte, Herbert Spencer came with an evolutionist approach to interpreting society, powerfully showing how societal communities and institutions (or social organs) evolve from simple to complex entities. Later, three major sociologists appeared with their theoretical perspectives to explain modern capitalist society: Karl Marx with his positivist/conflict approach, Weber with his historical/interactionist approach, and Durkheim with his positivist/functionalist approach. Together, we see five major traditions⁶ of classical sociological theory: positivist, evolutionist, functionalist, conflict, and interactionist. These schools of thought primarily drew the massive attention of European and American scholars to understand their societies. Although European sociologists dominated the discipline up to the 1920s, they were less successful in institutionalizing sociology as an academic discipline. American sociologists did the job with great success after the 1920s. In particular, American sociologists revitalized the discipline by studying American cities and city life from the evolutionist and functionalist perspectives.

Due to the Russian Revolution, WWI, and the Great Depression, American sociology heavily concentrated on the functionalist approach. This approach soon became synonymous with Academic Sociology in the USA (Gouldner 1970). However, Marxism became a prominent school of thought in the Soviet Union and the colonial world. The eventual outcome was the appearance of two most competing sociological schools of thought in global sociology: functionalism—or

6. In an elaboration, we see at least ten reputed theoretical perspectives (from positivist to structuration) produced by sociologists of different northern countries, such as France, Germany, Italy, the UK, the USA, and Canada, and of different generations, from Comte to Parsons to Giddens.

Academic Sociology, and Marxism—or a school of thought for political parties and organic intellectuals. In the following, I will discuss the origin, development, and crises of these two schools by reflecting on some critical works, including Marx's original writings, Neo-Marxist scholarship, and Gouldner's (1970) seminal piece on the coming crisis in the western sociological theory.

Functionalism and Its Life Cycle as A Grand Sociological Theory

Functionalism gained its status as a grand theory in sociology mainly through the writings of American sociologist Talcott Parsons (1937, 1951, 1964, 1967, 1971, 1977, 1978, 1979). This theory traced its origin to early English anthropology. Later, it gained more strength by engaging with the writings of Durkheim (1964) and Weber (1961, 1978). In the 1930s, Parsons built on these earlier intellectual traditions to build his own theoretical canon. He offered a robust theorization on understanding social systems: how society can maintain its order and how to produce social equilibrium in social systems. As such, early Parsonian functionalist theory rested on analyzing social systems and their roles in maintaining social order. Parsons did so to preserve stability in American or global society, making progress towards a better and prosperous world after the crisis of the great depression.

Due to WWII, international communist threats, and decolonial movements in the 1940s and 1950s, Parsons changed his social system theory by adding the role of the state⁷ in maintaining social order. He advocated a welfare state system regulating the market and performing welfare activity. He then saw the state as the “master source of power.” This welfare system had put a lot of money into social science research, popularizing Academic Sociology (or Functionalism) all across American universities. Parsons⁸ even assisted the government in making new education bills to increase funding and opportunities for social scientists. One example showed that public money for social science research increased from 118 million in 1960 to 200 million in 1964 (Gouldner 1970). Then, dozens of applied social science programs appeared at university levels. Parsons' colleagues also began developing three new action research theories: decision-making, cybernetics, and operation research. They also suggested offering social statistics courses all across social science programs. This time sociologists began reading more about economics than ever before. Heightened government pressure on social

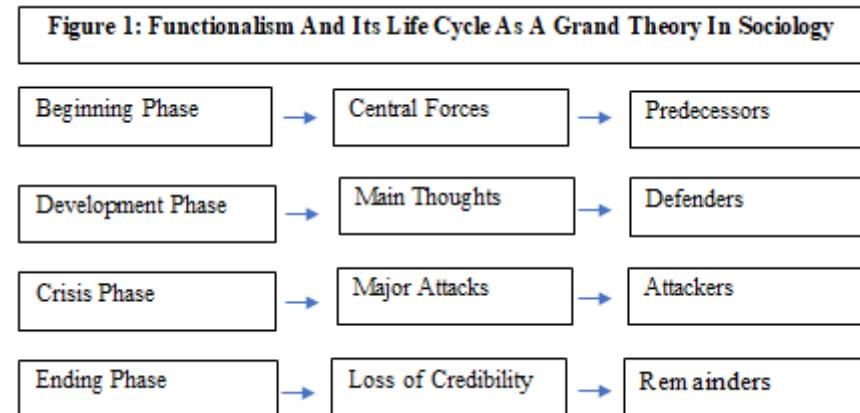
-
7. In his earlier theory, he shows no role of the state in maintaining social order.
 8. Parsons and his colleagues at Harvard also provided vital guidelines to the US state to modernize southern societies.

scientists forced sociologists to study social problems (rather than doing theory) to find solutions. The government launched “War on Poverty” campaign to discourage becoming poor and punish the poor. The Sociology of Poverty course was then offered by hundreds of universities. Gouldner (1970) called this state project a “sociological version of Keynesianism!” During this time, a nationwide survey of sociologists explored that some 80% of American sociologists showed “favorable disposed toward functional theory” (Gouldner 1970). What a successful theory!

Earlier, Parsons explained that every sub-system has its own internal mechanisms to address emerging social tensions, keeping social stability intact in the greater social system. However, this theory faced a severe crisis during the 1960s when the civil rights movement, student movement (New Left), feminist movement, urban riots, and Vietnam War destabilized the American and global order. This time a further modification of his theory was needed. As such, he added a powerful concept to his theory called “dysfunction” (Radcliff Brown originally developed this idea). He also returned to Spencer’s concept of “social differentiation” to explain the tensions in the American social order. A “seed group” of functionalism also appeared to save the functionalist approach from the emerging threat created by the New Left of young Marx, conflict theorists, and scholars of the critical school. Merton then came up with an updated theory to defend functionalism by exploring two functions of a social action (manifest and latent), offering a functionalist theory of crime and deviance, and creating the idea of middle-range theory—a shift from a grand theory with a world hypothesis to a middle range theory with empirical support. Some other functionalists (e.g., K. Davis, W. Moore, and A. Inkless) also came forward to save Academic Sociology. Some functionalists even took the Marxist perspective to defend functionalism—Gouldner (1970) saw it as a convergence between functionalism and Marxism.

Continued attacks on functionalist theory came from other powerful fronts. Such as C.W. Mills’ (1956) theory of power elites, E. Goffman’s (1957) dramaturgical analysis of social action, R. Dahrendorf’s (1959) neo-Marxist analysis of the capital and class, Smelser’s (1959) general theory of social change, G. Homans’ (1961) and P. Blau’s (1964) exchange theory, Garfinkel’s (1967) idea of ethnomethodology, and New Left’s radical idea of social reformation. All these theoretical fronts value “social change” over the Parsonian model of “social order.” Then the New Left—the “growing radicalization of the students” primarily based on Columbia University and UC Barkley —were even ready to go to jail for their thoughts against functionalism. The defenders of functionalism deeply felt these threats against their ideas. Parsons then declared that

developing a “complete” or “general” theory in social science is not always possible. Here I show (Figure 1) the colorful life cycle of functionalism from the beginning to the end.



Marxism and Its Life Cycle as A Grand Sociological Theory

Marxism is another case examining how a grand sociological theory emerged, flourished, and declined. Many scientists and social thinkers influenced Marx’s ideas. However, in most cases, he modified their thoughts to build new theories. In Table 1, I summarize how Marx drew on numerous scholars to build his ideas (1853a, 1853b, 1867, 1894, 1961, 1963, 1964, 1970, 1977).

Table 1: Theoretical Roots of Marx's Ideas		
Approaches	Key Thinkers	Karl Marx
Philosophical Approach	Aristotle: Aristotelian logic and empiricism.	Marxian logic: Truth (appearance) and real are different.
	Vico: Constructivist epistemology: Truth itself is fact, or the truth itself is made.	Distinction between true and real; make duality between facts.
	Hegel: Dialectical idealism (extension of the method of reasoning by Kant).	Dialectical materialism; Subject and object are dialectically interlinked.
	Feuerbach: Religious idealism- God is superior to humans,	Historical materialism; ⁹ notion of alienation: Inspired

9. Marx summarized the materialistic aspect of his theory of history in the Preface to *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1970 [1859]): “In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations

	though human made their God.	by Feuerbach's critique of the alienation of humans from God; religion for oppression.
	Rousseau: Inequality: natural and social; inequality as a major cause of social injustice.	The ultimate goal of capitalism is to create and sustain social disparities.
	Spinoza: Theory of the universe: Freedom and free will of humans that comes from God.	Marx was inspired by Spinoza's account of the universe, interpreting it as a materialistic idea.
	Robespierre: Key proponent of the French Revolution.	Marx was inspired by Robespierre and took an egalitarian philosophy for humanity.
Economic Approach	Epicurus: Atomism and materialism: The world is ultimately based on the motions and interactions of atoms moving in empty space.	Capital is a process having the principle of motion; capital is the unit of analysis of the capitalist world order.
	Locke: Theory of property: Most of the value of a product comes through work (90 percent comes from work and 10 percent from natural resources).	However, Marx showed that 100 percent of value comes from work (or human labor power).
	Adam Smith: Invisible hand: Individual selfish endeavor creates greater welfare for society- a general capital accumulation system.	Marx's invisible hand: Individual benevolence creates social welfare; Marx's idea of primitive accumulation is an upgrade of Smith's general accumulation system.
	Locke and Ricardo: The labor theory of value.	Marx's modification: A commodity consists of three things: value, use-value, and exchange-value; commodity fetishism- a mysterious character of a commodity that resembles dead labor power of humans (or a fetish figure).

of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production of material life conditions the general process of social, political and intellectual life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness".

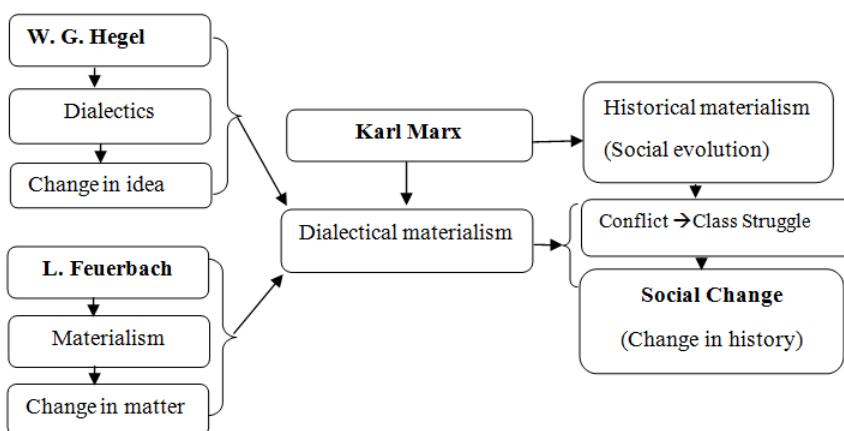
Political Approach	Vico: The class struggle is a condition of a society that can make a relatively egalitarian society (though he posited that complete equality would lead to chaos and a breakdown in society).	Marx was fundamentally influenced by Vico's socialist ideas: Overthrowing unequal capitalist system to create an egalitarian socialist/ communist system.
	Robert Owen: Founder of utopian socialism and the cooperative movement.	The notion of surplus value and alienation; social change through class struggle.
	Proudhon and Saint Simon: Utopian socialism.	Marx (with Engels) reversed their ideas into scientific socialism.
	Lorez Von Stein: The concept of the proletariat and class struggle, but no revolution.	The history of all hitherto existing societies is the history of class struggles.
	Moses Hess ¹⁰ : Humans created history through their active consciousness; religion as the "opiate of the people."	Marx was able to convert the Hegelian dialectical theory of history into dialectical materialism with the help of Hess; religion is the opium of the people.
	Fourier: Human-emancipation through struggle; new world order based on unity of action and harmonious collaboration.	Theory of class struggle: the victory of the proletariat over the bourgeois when they are united; unite all the workers of the world.
	Biblical humanism: Justice.	Human emancipation from capitalist repression.
Evolutionary Approach	Voltaire: Freedom of religion, freedom of expression, separation of church and state, and historiography- scientific ways to look at the past.	A scientific framework for explaining human history by the materialistic notion; linear progression of human societies.

10. Moses Hess's (1846) words on Marx: "Here is a phenomenon who has made an enormous impression on me although I work in the same field. In short prepare to meet the greatest, perhaps the only genuine philosopher now living who will soon have the eyes of all Germany upon him wherever he may appear in public, whether in print or on the rostrum. Dr. Marx, as my idol is called, is still quite a young man (aged about 24 at most) and it is he who will give medieval religion and politics their coup de grace, he combines a biting wit with deeply serious philosophical thinking. Imagine Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine and Hegel combined into one person—and I say combined, not blended—and there you have Dr. Marx."

Approach To Human Psychology, Labor Power	Morgan: Societal typologies.	The framework for social evolution: From primitive communism, slavery, Asiatic society, feudalism, socialism to communism.
	Darwin: Evolution in a linear way.	Social change in a linear way
	Shakespeare: Human behavior- rational vs. emotional; kind vs. brutal.	Capitalist society: Progressive, brutal, and ruthless.
	Goethe: Duality in the soul.	Duality in value: Use-value vs. exchange-value; duality in materialistic consciousness: freedom vs. alienation.

By critically drawing on his predecessors, Marx developed some crucial theories: the theory of social evolution, the theory of scientific socialism (along with Engels), the theory of capitalist accumulation, the labor theory of value, the theory of surplus value, the theory of capital, the theory of class, the theory of the state, the theory of the capitalist ideology, and the theory of social change (see Figure 2). Scholars have merged these theories into a grand theory of modern capitalism—i.e., Marxism. Marxism came into practice (with distortion) in the Soviet Union, led by political groups and parties. Lenin was the first prominent Marxist scholar who put Marx's ideas into practice (i.e., praxis) to make a successful (arguably) Socialist Revolution to build a communist empire.

Figure 2: Marx's Theory of Social Change— An Analytical Model



After Marx and Lenin, Marxism as a grand theory continued to extend its boundary when scholars from all over the world contributed to Marxist

thoughts—either through critiquing/ altering Marx's views, rejecting Marx's ideas, or offering new theories. These groups are identified as Classical (orthodox/vulgar) Marxists, Radical Marxists, Critical Marxists, Structural Marxists, Neo-Marxists, Cultural Marxists, New Left, Analytical Marxists, Libertarian Marxists, Feminist Marxists, and Post-Marxists. In this paper (Figures 3-6), I briefly outline the central contributions of four renowned Neo-Marxists¹¹—who offer influential ideas of both social change and social stability (or no change) under the advanced phase of western capitalism.

Figure 3: A. Gramsci— An Independent Marxist

Theory of no change: Late capitalism → control over capital, state, and ideology → fascism → new forms of domination or hegemony → no element of opposition → no struggle → **no change** (Gramsci 1971:53-57).

Theory of change: Late capitalism → deprivation → conscientization through education, organic intellectuals, and civil society → catharsis- lived experience of the workers → counter hegemony → historical block/strategic alliance → breaking down ruling class hegemony → organizational ideology → revolution or ideological struggle → **social change** (Gramsci 1971:56-59).

Figure 4: G. Lukács— An Independent Marxist

Theory of no change: Late capitalism → welfare state/state capitalism (Keynesian model) → consumer goods → false needs → false consciousness → reification → [propelled class consciousness] → no struggle → **no change** (Lukács 1923:39-47).

Theory of change (Lukács): Imputed class consciousness (by communist party and civil society) → praxis → proletarian epistemology → proletarian class consciousness → revolution → **social change** (Lukács 1923:51-53).

Figure 5: H. Marcuse— Hegelian Marxist

Theory of no change: Advanced industrial capitalism → automation and enslavement → flexibility in work and mass consumerism → false needs → shared the same world → socio-cultural integration → repressive or institutionalized desublimation → rise of one-dimensional man and culture → no movement → **no change** (Marcuse 1964:24-57).

Theory of change: Advanced industrial capitalism → rise of instrumental reason and technological rationality → greater domination over man → Ambiguity (because of conflicting tendencies, forces of freedom and social cohesion) → repression and deprivation for unhappy consciousness → breakdown one-dimensional culture → revolution → **social change**-progressive, regressive and cyclical (Marcuse 1964: 57-76).

11. I first became aware of these Neo-Marxist theories of change and no change while studying a course in the MS program at the University of Dhaka with Professor Mahbub Uddin Ahmed. I later read those scholars' original texts and used their ideas in my teaching and writing.

Figure 6: R. Dahrendorf—An Analytical Marxist

Theory of no change: Advanced industrial capitalism → decomposition of capital and labor → distribution of capital between owners and non-owners → sense of belongingness → lack of leaders and ideologies → emergence of new social classes → relative participation in decision making → relative deprivation (instead of absolute one) → emergence of the disassociated institutional norms → disappearance of class conflict → no movement → **no change.** (Dahrendorf 1959:241-248).

Theory of change: Advanced industrial capitalism → decomposition of capital and labor → workers as owners of capitals through stock → conflict between big owners and petty owners → imbalance in authority → new patterns of class conflict → potential class war → (small scale) **social change** (Dahrendorf 1959:241-248).

Marxism has faults; thus, it has faced numerous attacks and crises throughout its journey since the mid-19th century. Some scholars declared the death of Marxism after the fall of the Soviet Union. However, most of its ideas are still valuable for scholars of new generations and this contemporary world. New theorization on Marxism is continually being observed in various fields of knowledge in social science and humanities. A life cycle of a grand theory—e.g., Marxism—in social science never ends¹², as it is observed by T. Kuhn (1962). Its utility remains forever for human society.

Problems Of Building Sociological Theory in The Global South

Southern sociologists have deployed or modified many western sociological theories throughout the twentieth and twenty-first centuries to explain their societies. Most of their efforts have remained confined to offering new analyses of their societies, but they could not develop any comprehensive sociological theory parallel to western one. A brief discussion on such atheoretical sociological tradition in southern societies is placed below.

The first sociological practice can be traced back outside the west in 1854 in the writings of Argentinian sociologist D. F. Sarmiento (Gibert 1952:128, 131). However, sociology as an academic discipline in Argentina began its formal journey in 1896. Since the mid-1890s,

12. While some sociologists are worried about the crisis in sociological theory (Gouldner 1970; Siedman 1994; Stinchcombe 1994; Denzin 1995; Abbott 2000; Turner 2006; Islam 2005; Szelenyi 2015), other sociologists are hopeful (with cautions!) for the new theorization of global societies (Wallerstein 1997, 2001; Burawoy 2007, 2016; Ritzer 2011; Islam 2005; Islam 2010).

sociology has reached Brazil, Mexico, Chile, Cuba, and other Latin American countries. Between the 1890s and 1960s, sociology was vibrant in Latin America. However, scholars observed a “sociological syncretism” in this region instead of new theorization (Gibert 1952). After the 1960s, Latin American sociology turned its attention to studying internationalism (Tavares-dos-Santos and Baumgarten 2006), postcolonialism (Bortoluci and Jansen 2013), and developmentalism (Faille 2013). However, these views never gained the status of a sociological theory.

Sociology reached South Africa in 1903, and the first sociology course was taught at the University of Cape Town in 1919 (Magubane 2000; Jubber 2007). Some scholars contributed to sociology by studying poverty and racial discrimination using western sociological theories (Wagner 1938, 1939; Irving 1958; Cilliers 1982). However, they failed to produce any significant sociological theory (Jubber 2007). In post-apartheid South Africa, public sociology has made a strong foothold (Burrawoy 2004; Webster 2004), but one can find no significant contribution to sociological theory (Hendricks 2006; Sooryamoorthy 2016:3). Sociological theory also has no trace in other African countries, including Egypt, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria, Tunisia, and Zambia (Akiwowo 1980; Erinosho 1994).

Someone can again fail to detect any robust theoretical contribution to sociology in Asian countries, including East Asia, South Asia, and the Middle East (Mukherjee 1977; Alatas 2006; Modi 2009; Hasegawa 2014; Alatas and Sinha 2017). Though Japanese sociology began its journey in 1893 with the help of German and American sociologists, it failed to produce a new theory (Hasegawa 2014). Thus, Sato (2012) claimed that Japanese sociology resembles a “black hole,” which absorbed western sociology without emitting its bright fruits to the world. In the Middle East—a space created by the western mind (Said 1978)—one can also trace no significant theoretical approach to formal sociology (Alatas 2011; Alatas and Sinha 2017).

In India, some important theoretical works in sociology can be found in the areas of social stratification (caste, class, etc.), Hinduism, village community, kinship, joint family, mode of production, Marxist sociology, mobility, urbanization, feminism, social suffering, and postcolonialism (Mukherjee 1977; Deshai 1981; Sen 1982; Oommen 1983; Singh 1986; Srinivas 1994; Mukherji 2006; Modi 2009; Islam 2010; Madan 2011). However, any such systematic and comprehensive sociological theory is unfound. Thus, Modi (2009:8) mentioned that India fails to produce widely acceptable theoretical models in sociology.

The atheoretical tradition in sociology is a norm in Pakistan (Gardezi 1966, 1994; Hafeez 2001; Hafeez 2005; Shah et al. 2005). Although Hamza Alavi and his colleagues produced some good sociological work from the Marxist perspective (Alavi 1972, 1982; Alavi and Harriss 1989; Halliday and Alavi 1988; Alavi and Shanin 2003), Shah et al. (2005) claimed that “Pakistani sociology has been mostly ahistorical, eclectic, atheoretical and thus narrowly empirical.” Sociology in Sri Lanka as an academic discipline started its journey in 1942. However, major sociological contributions to any field are rarely observed (Hettige 2010). Beginning in 1953, Nepalese sociology has been facing major crises, including a lack of theoretical framework and the institutionalization of sociology (Bhandari 2003; Pyakurel 2012).

In Bangladesh, “the emergence of sociology has been a case of borrowing from abroad” (Khan 2008:30). Thus, Islam (2010) claimed that Bangladeshi sociological research has remained confined to testing three western theories: modernization, structural functionalism, and Marxist. Most early sociologists followed these perspectives, which remotely sense a type of ‘hybrid sociology’ (see also Kais 2010). Nazmul Karim (1956, 1980) produced important sociological work on social change and social stratification by drawing on those perspectives. Later, we find many critical sociological works by Bangladeshi sociologists on local and indigenous communities, social stratification, development, social change, mode of production, sociological theory, democracy, globalization, political culture, urban and rural society, nationalism, climate change, forestry, dispossession, land, apparel industry, gender, and health. However, a systematic or widely accepted sociological theory is absent in these works. Islam and Islam (2005:388) thus claimed that “it is no wonder that sociology has remained a marginal and archaic discourse in Bangladesh” (see also Khan 2008). Islam (2010:10) also commented that “sociologists of the country had very little interest in pure theory.”

Why does southern sociology lack any significant theorization? Are the western-type social forces (e.g., Renaissance, French Revolution, Reformation Movement, and Industrial Revolution) necessary to do comprehensive theorization in sociology? Or what else? In answering these questions, this study traces the following reasons (i.e., problems) for the atheoretical tradition in southern societies, particularly in South Asia.

1. Long-lasting Agrarian Tradition

By the mid-19th century, western society had reached the climax of modern civilization with advanced technology, capitalism, and numerous systematic knowledge bases including sociology. However, South Asia

had a long-standing tradition of agricultural society from 6,000 BCE, continuing up to the mid-1960s. Due to this agrarian social system—where theoretically only kings were the owners of all the land—Asian society failed to develop the notion of private property and the idea of individualism (the core message of the Renaissance), keeping people in enduring enchantments (Weber 1961). Along the same line, orientalists blamed that Asian people lack reasoning, scientific worldview, democratic values, and the power of self-ruling (Said 1978). Marx (1853a) also claimed that “Asia fell asleep in history.” Since sociology is a science of modern urban capitalist society, it is not easy to see the development of any grand sociological theory under the traditional agrarian social system.

2. Oral Epistemological Tradition

Many noted scholars in South Asia never wrote anything, though they had a rich oral tradition of knowledge. Thus, we lost some fundamental philosophical discourses that could influence other epistemological areas of human society. Moreover, because of this tradition, very few people in modern South Asia felt encouraged to engage in critical knowledge production. Since theory building in sociology rests on a long tradition of written documents on a society, South Asian sociologists lack proper documentation on earlier societies or intellectual traditions to develop any systematic theory.

3. Lack of Systematic Philosophy

Many western scholars argue that Eastern or South Asian philosophy is not secular and systematic because it is spiritual and lacks the power of generalization, methodological innovation, and empirical support (Russell 1945; Weber 1961). Due to this non-scientific character of philosophy on which a society’s core knowledge systems rest, we find no such secular and systematic epistemological discourse in South Asian philosophy. Since philosophy is the mother of sociological thoughts and we lack such philosophy, we, too, lack systematic sociological theory.

4. Absence of Social Reformatory and Technological Revolution

We find dozens of social and religious movements in South Asia throughout history. However, this territory has yet to see any western-type reformation or scientific revolution. Moreover, we cannot trace intellectual movements like the Enlightenment and Renaissance. We find some social reformation movements to rectify some wrong societal practices. One of them was the *Satidah* practice—a convention that forced a widow to sacrifice her life on her deceased husband’s funeral pyre. However, reformation movements could have been more helpful in

developing any philosophical or sociological school of thought. They did not effectively introduce science and reasoning to the mass population, which could have brought fundamental changes to society. Such a lack hindered the development of sociological theory in South Asia, even the institutionalization of sociology.

5. Despotic Formation of the Intellectuals

In ancient and medieval South Asian societies, Brahmin—the upper social class or priests—had access to produce and disseminate knowledge. They maintained a super control of philosophical and religious schools, keeping all other social classes out of the knowledge system. As such, public intellectual exchanges or critical intellectuals were unseen. And then mass education was unthinkable; even any such attempt was prohibited and punishable. Under this despotic control over knowledge, no philosopher or social thinker can create a systematic, liberated, and sustained tradition of knowledge system. This control also prevented the creation of critical social scientists for many centuries. With this closed practice, we can see no such formation of intellectuals who can dedicate their life building new theories in social science or sociology.

6. External Penetration and Hybridized Worldview

Since 1500 BCE, dynasties after dynasties from the ancient Middle East came to rule the South Asian territory. They brought particular kinds of worldviews at different times to this society, often eliminating the indigenous worldview and knowledge base. Since 400 BCE, European civilization also brought their worldviews to this territory. After 1756, the British Raj offered the most influencing worldview, threatening the existing worldviews. We see hundreds of dynasties, extremely diverse sections of the population, thousands of spoken languages (more than 3,000), thousands of caste types (over 2,000), and hundreds of other social divisional markers. An extraordinary mixing of different kinds of worldviews thus created and sustained a land of diversity or hybridized worldview. This worldview prevented the creation of a western-type modern nation-state with its dominant and uniform ideology or worldview. Accordingly, no such systematic knowledge base was developed with the support of the state. This worldview also discouraged building a civilizational project (European or American type) outside the territory, which could need new knowledge to rule the external world. A lack of civilizational creed—science, technology, knowledge, and reason—kept this territory out of innovation and a secular knowledge base. As such, systematic study of society has never become a tradition, keeping social thinkers from developing any solid and comprehensive idea.

7. Dependent Industrialization and Urbanization

Under British colonial rule (1757-1947), small-scale industrialization and urbanization occurred in South Asia. Then, there was no favorable environment to give birth to a capitalist economy by the indigenous bourgeoisie or create a modern education system for the masses. Colonial rulers did not attempt to build educational institutions that could produce a solid knowledge base. So, there was a severe lack of research money for attracting or making scholars to create new knowledge. Moreover, due to insignificant industrialization and urbanization, colonial society could not produce such demand for skilled workers or high thinkers. After the 1950s, South Asia entered a new phase of urbanization and industrialization with the help of American and European dollars and technical support, mainly by the IMF and WB. After the 1980s, urbanization and industrialization took a neoliberal turn, making urbanization and industrialization dependent on foreign money and resources. This dependent urbanization and industrialization never helped produce a serious demand for social scientists to produce solid knowledge (or make theories) to explain their own societies. Neither could they create any research culture in academia or society. This dependent practice never developed a sense of “urbanism”—a way of living a permanent urban life with a meaningful interpretation of urban worldview (Wirth 1938). So dependent urbanization and industrialization evidently prevented producing any significant theoretical work in South Asian sociology.

8. Displaced Epistemology in Society and Academia

The British rule in the Indian subcontinent produced a new English-educated middle class, who had displaced the traditional knowledge system from society and academia. A relevant quote by Lord Macaulay (1835) can tell us about this:

“I propose that we replace her [Indian] old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture and they will become what we want them, a truly dominated nation.”

The British policy eliminated the possibility of knowledge production by their newly created middle class. These English-educated people separated themselves from traditional philosophy as well as mainstream society. Since the southern states have little money to invest in producing new knowledge, a dedicated middle-class group can do it. So, without a passionate, educated, self-liberated, and secular middle class (in selective cases—university teachers or independent scholars), it is impossible to begin any big intellectual project to produce new knowledge under the

southern capitalist world order. We do not have a great tradition of the systematic philosophical or social school of thought because we lack such middle-class communities, or our colonial or postcolonial societies have derailed that intellectual community.

9. Epistemological Fault Lines in the Knowledge System

Throughout the history of the Indian Subcontinent, we find a strong presence of discontinuity in knowledge production and dissemination, which I call epistemological fault lines. Thus, we see a couple of important fault lines in this region, such as (1) discontinuity in ancient philosophical discourses due to Aryan invasion, (2) discontinuity in Aryan philosophy due to Greek intrusion and the rise of Hindu and Buddhist philosophical discourses, (3) discontinuity in Hindu and Buddhist philosophical discourses because of the Islamic invasion, and (4) discontinuity in Islamic philosophical discourses because of the British intervention. Due to these epistemological discontinuities, we do not find well-developed philosophical schools or a systematic knowledge structure in this region. And consequently, we are still looking for a robust attempt to produce a sociological theory.

Prospects of Building Sociological Theory in The Global South

Alvin Goulder (1970:404-405) claimed that every social theory rests on some sentiments, observations, experiences, assumptions, mutual encouragements, social realities, and dissatisfaction with old theories. With Goulder's guidelines, can we look into South Asian societies to build a new theory? How possible would it be to do that task? Keeping both questions in mind, I would offer some preliminary guidelines to build sociological theories in the context of South Asia. The outlines are as follows.

1. Building on Local Philosophical Schools

A globally-renowned German philosopher Max Müller (1883:6) made a celebrated statement in a lecture titled "*India: What Can it Teach Us*":

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow – in some parts a very paradise on earth – I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant – I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the

thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life – again I should point to India.”

If Max Müller can be proud of seeing such realities in Indian society, why did South Asian scholars turn their eyes blind to such treasures that could have been tremendous sources of developing systematic philosophical schools similar to the west? At least 12 classical philosophical schools of South Asia might be invaluable resources for South Asian sociologists to build the skeletons of macro sociological perspectives. These schools included: (1) *Nyaya* (rules/logic), (2) *Vaisheshika* (perception and inference), (3) *Samkhya* (enumerationist), (4) *Yoga* (physical, mental, and spiritual), (5) *Mīmāṃsā* (critical investigation of the world), (6) *Vedanta* (knowledge about the nature and cosmos), (7) *Jain* (non-violence, method of gaining extra sensory knowledge), (8) *Nirvana* (Buddhist), (9) *Ajivika* (absolute determinism, rule of nature), (10) *Ajñana* (skepticism), (11) *Charvaka* (skepticism and empiricism) and (12) *Sufism/mysticism*.

Identifying the relevant indigenous philosophical schools might be the first step towards developing sociological theory. In other words, sociologists must build on local philosophical schools (those might have global appeals) to develop any macro/systematic sociological approach. This tradition is found in Marx, who drew on Hegelian philosophy; in Durkheim, who relied on British empiricism; and in Weber, who rested on Kantian philosophy. One more example may attract our attention here. Amartya Sen's (2009) new theorization of justice—one of the worlds' greatest philosophical works—is heavily built on the ideas and examples of Indian moral philosophy.

2. Drawing on the Critical Insights of Postcolonial Studies

Southern scholars may follow another path for doing sociological theory. They may build on the insights of postcolonial studies—a branch of knowledge that challenges Eurocentric epistemologies and offers new theories to explain the exploitative and oppressive relationships between the global north and global south. Since the 1960s, postcolonial theorists of the global south have produced an extremely rich volume of literature. They are mostly known as Marxist historians, literary critics, psychoanalysts, and feminists. Some pioneering contributors to postcolonial studies are Aimé Césaire (2001[1950]), Frantz Fanon (1961), Albert Memmi (1991 [1965]), and Kwame Nkrumah (1970). This school gained momentum

after the publication of Edward Said's *Orientalism* in 1978. Along with Said, some other noted scholars included Ranajit Guha (1993), Homi Bhabha (1994), Gayatri Spivak (1999), Dipesh Chakraborty (2000), Partha Chatterjee (1993), and Sara Ahmed (2000).

3. Integrating All Forms of Southern and Northern Marxist Traditions

In the above, we have seen eleven types of Marxism. It is difficult to produce any new theory by any particular kind of Marxism. So, what hope for theory building then remains for us? Here I see that Marxists of various fronts may collaborate to produce a grand theory for the survival of this planet, not just attack the capitalist system as a whole. Our world is on the verge of collapsing because of wage wars, wars for power and money, continued wealth concentration in a few hands, climate change, and the threats of nuclear weapons. So, to save the planet from a hundred different threats, we need an integrated theoretical practice of Marxism. This attempt can be seen as a re-theorization of the west and east. I may call for this: Marxists of the world unite!

4. Focusing on the Development of Middle-Range Theories

Merton (1968:68) defined middle-range theory this way: "Middle-range theories consist of limited sets of assumptions from which specific hypotheses are logically derived and confirmed by empirical investigation." Similar to many other scholars (such as Hans Zetterberg, Andrzej Malewski, Peter Blau, Alvin Gouldner, S. Selznick), I believe that this is a practical path that southern sociologists may follow to produce new theories grounded in empirical realities. We may find some examples of such theorization in South Asian sociology, but I need more time to find and include such works in the next project. I can only mention my three recently published research works following such a theorizing path (Mondal 2021, 2023, 2024).

5. Framing Ideas for A New Society Dominated by the AI

Gouldner (1970) argued that every social theory has some infrastructural bases, including man, society, and culture. I elaborate on this idea to show how sociologists need a new theorization to explore a new relationship between humans, society, and AI capitalism. A sociological theory of such kind may need to integrate various social systems into one unified framing. This frame may examine AI-dominated capitalist society from a post-functionalist perspective: humans/AI and their personality systems + society and its social system + culture and its societal representations + political system and its location in human action + economic system and its presence in human reproduction.

6. Exploring New Ideas About the Relationship Between Human Society and The Universe

Our capitalist world order has already operated missions to commodify and privatize outer space of this planet as well as some planets of this solar system. SpaceX has been trying to make outer space a commercial tourist spot. China sent its own space station to monitor this planet and explore further possibilities of commodifying space. America created a specialized branch called the space military to control space. Above all, NASA has been generating new knowledge for decades for further market expansion to space. What can these examples tell us? A new group of sociologists would need to study these commercial interventions in space, which would soon reorganize our social world by creating a new relationship between space and society. A new space for sociological theorization is yet to be constructed.

Conclusion

This study has examined the historical and contemporary status of global sociological theory. In doing so, it has investigated the origin, development, and decline of sociological theory in the global north. Moreover, it has identified the problems and prospects for developing sociological theory in southern societies. It has explored the reasons for the lack of systematic sociological theory in southern societies and offered guidelines for southern scholars to produce new sociological theories. Its arguments have been built on the global literature on sociological theory. It has used historical and comparative methodological approaches to identify the problems and prospects for doing sociological theory in the global south, particularly in South Asia.

When the capitalist world order observed a major restructuring in its system during the 1970s, Bottomore and Nisbet (1979) noticed a decisive “comatose” in sociological theory. Denzin (1995) declared the death of sociological theory and sent an SOS to save it (see also Siedman 1994; Stinchcombe 1994; Abbott 2000; Turner 2006; Islam 2010). However, other sociologists, including Wallerstein (1997, 2001) and Burawoy (2007, 2016) showed hope for new theorization in sociology. So, while the northern sociological theory is in crisis and southern sociological theory is absent, this research hopes that sociologists from both societies will work ardently to theorize human societies in the twenty-first century and beyond. This new theorization is much expected for understanding the macro structure of the global society—which is now dreadfully unequal, environmentally crumbling, intellectually techno-dependent (e.g., AI), economically dysfunctional, politically authoritarian, legally abusive, morally decaying, and culturally dispossessed. This theorization is possible if a group of people wholeheartedly invest their time and

talent as well as mobilize the financial and moral support of the state and social institutions.

References

- Abbott, Andrew. 2000. Reflections on the Future of Sociology. *Contemporary Sociology*, 29(2): 296-300.
- Ahmed, Sara. 2000. *Strange Encounters: Embodied Others in Post-Coloniality*. London: Routledge.
- Akiwowo, Akinsola. 1980. Trend Report: Sociology in Africa Today. *Current Sociology*, 28(2).
- Alatas, Syed Farid. 2006. *Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism*. New Delhi: SAGE.
- , 2011. Middle East Sociology on the Move. *Global Dialogue*, 1(5), July.
- Alatas, Syed Farid and Vineeta Sinha. 2017. *Sociological Theory Beyond the Canon*. London: Palgrave Macmillan.
- Alavi, Hamza. 1972. The State in Post-Colonial Societies Pakistan and Bangladesh. *New Left Review*, Jul 1, 74.
- , 1982. *Capitalism and Colonial Production*. London: Croom Helm.
- Alavi, Hamza and J. Harriss. 1989. *Sociology of Developing Societies: South Asia*. Basingstoke: Macmillan Education.
- Alavi, Hamza and Theodor Shanin. 2003. *Introduction to the Sociology of Developing Societies*. Monthly Review Press.
- Bhabha, Homi. 1994. *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Bhandari, Bishnu. 2003. The Past and Future of Sociology in Nepal. Retrieved (12 June 2019): http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_02_03.pdf
- Blau, Peter. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley & Sons.
- Bortoluci, Jose' and Robert Jansen. 2013. Toward a Postcolonial Sociology: The View from Latin America. *Political Power and Social Theory*, 24:199-229.
- Bottomore, Tom and Robert Nisbet. 1979. Introduction. In *A History of Sociological Analysis*. Edited by Tom Bottomore and Robert Nisbet. London: Heinemann.
- Burawoy, Michael. 2004. Public Sociology: South African Dilemmas in a Global Context. *Society in Transition*, 35(1):11-26.
- , 2007. The Future of Sociology. *Sociological Bulletin*, 56(3):339-354.
- , 2016. The Promise of Sociology. Global Challenges for National Discipline. *Sociology*, 949-959.
- Césaire, Aimé. 2001. *Discourse on Colonialism*. Monthly Review Press.
- Chakrabarty, Dipesh. 2000. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton University Press.

- Chaterjee, Partha. 1993. *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.
- Cilliers, S. P. 1982. *Urban Growth in South Africa 1936—2000*. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Denzin, Norman. 1995. Postmodern Social Theory. In *Readings in Contemporary Sociological Theory: From Modernity to Postmodernity*. Edited by Donald McQuire. New Jersey: Prentice -Hall.
- Deshai, A. R. 1981. Relevance of the Marxist Approach to the Study of Indian Society. *Sociological Bulletin*, 30(1):1-20.
- Durkheim, Emile. 1964. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Erinoshio, Olayiwola. 1994. Thirty-three Years of Sociology in Nigeria. *International Sociology*, 9(2):209-216.
- Faille, Dimitri della. 2013. Sociology on Latin America in the 1960s: Developmentalism, Imperialism, and Topical Tropism. *Springer Science and Business Media New York*, 44:155–176.
- Fanon, Frantz. 1961. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Weidenfeld.
- Gardezi, Hassan Nawaz. 1966. *Sociology in Pakistan*. Department of Sociology, University of Panjab.
- 1994. Contemporary Sociology in Pakistan. In *The International Handbook of Contemporary Developments in Sociology*. Edited by Raj Mohan and Arthur Whilke. Westport: Greenwood Press.
- Garfinkel, Harold. 1967. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gibert, P. 1952. The Rise of Sociology in Latin America. *Sociological Bulletin*, 1(2):126-139.
- Goffman E. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Gouldner, Alvin. 1970. *The Coming Crisis of Western Sociology*. Basic Books, INC.
- Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks* (trans. Q. Hoare & G. N. Smith). New York: International Publishers.
- Guha, Ranajit. 1993. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*. New Delhi: Oxford University Press.
- Hafeez, Muhammad. 2005. Sociology in Pakistan: A Review of Progress. In *Social Sciences in Pakistan: A Profile*. Edited by Inayatullah, Rubina Saigol and Pervez Tahir. Islamabad: Council of Social Sciences.
- Hafeez, Sabeeha. 2001. Development of Sociology as a Discipline in Pakistan. In *State of Social Sciences in Pakistan*. Edited by S H Hashmi Hashmi. Islamabad: Council of Social Sciences.

- Halliday, Fred and Hamza Alavi. 1988. *State and Ideology in the Middle East and Pakistan*. Monthly Review Press.
- Hasegawa, Koichi. 2014. Sociology in Japan: History, Challenges, and the Yokohama World Congress. *Footnotes*, April 2014.
- Hendricks, Fred. 2006. The Rise and Fall of South African Sociology. *African Sociological Review*, 10(1):86-97.
- Hess, Moses. 1846. *A Communist Confession of Faith*. Retrieved (23 July 2021): <https://www.geni.com/people/Moses-Hess/6000000000128895886>
- Hettige, Siri. 2010. Sociological Enterprise at the Periphery: The Case of Sri Lanka. Retrieved (5 January 2020): <http://www.ios.sinica.edu.tw/cna/download/proceedings/35.Hettige.SriLanka.pdf>
- Homans, George. 1961. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. London: Routledge.
- Irving, J. 1968. *Man, Machines and Society: Lectures in Industrial Sociology*. Grahamstown: Institute of Social and Economic Research.
- Islam, Aminul. 2010. The Sociological Theory in Bangladesh and South Asia: Search for an Asian Perspective. Conference proceedings on *Contemporary Sociological Theory (published in Japan)*, 4, pp 29-53.
- Islam, Aminul and Nazrul Islam. 2005. Sociology in Bangladesh: Search for a New Frontier. *Sociological Bulletin*, 54(3):374-395.
- Islam, Nazrul. 2005. *End of Sociological Theory and Other Essays on Theory and Methodology*. Dhaka: Ananya Press.
- Jubber, Ken. 2007. Sociology in South Africa: A Brief Historical Review of Research and Publishing. *International Sociology*, 22(5): 527-546.
- Kais, Shaikh Mohammad. 2010. Fifty Years of Bangladesh Sociology Towards a "Hybrid Sociology"? In *Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology*. Edited by Burawoy et al. Institute of Sociology at Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association, and Academia Sinica.
- Karim, Nazmul. 1956. *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*. Dhaka: Ideal Publishers.
- 1980. *Dynamics of Bangladesh Society*. New Delhi: Vikas.
- Khan, Monirul. 2008. Process of Institutionalization of Sociology in Bangladesh: Can It be Theoretically Addressed? *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 5(2):27-40.
- Kuhn, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Lukács, Gyorgy. 1923. *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*. Malik-Verlag, The Merlin Press.
- Madan, T. N. 2011. *Sociological Traditions: Methods and Perspectives in the Sociology of India*. SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Macaulay, T. Babington. 1835. Macaulay's Minute on Indian Education. 2nd of February. Retrieved (12 July 2021): (http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.html)

- Magubane, B. 2000. *African Sociology: Towards a Critical Perspective: The Selected Essays of Bernard Makhosezwe Magubane*. Trenton, NJ: Africa World Press.
- Marcuse, Herbert. 1964. *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Beacon Press.
- Marx, Karl. 1853a. The British Rule in India. *New York Daily Tribune*, June 25. Retrieved (April 1, 2017): <https://www.marxists.org/>
- , 1853b. The Future Results of British Rule in India. *New York Daily Tribune*, August 8. Retrieved (March 3, 2017): <https://www.marxists.org/>
- , 1867. *Capital: A Critique of Political Economy*, Vol. 1. Moscow, USSR: Progress Publishers. Retrieved (January 20 2017): <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf>
- , 1894. *Capital: A Critique of Political Economy*, Vol. 3. New York: International Publishers. Retrieved (March 14 2017): <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-III.pdf>
- , 1961. The Class Struggle. In *Theories of society: Foundations of Modern Sociological Theory*, Vol. I. Edited by Parsons, T., Shils, E., Naegele, K. & Pitts, J. R.. New York: The Free Press of Glencoe, Inc.
- , 1963. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. NY NY: International Publishers.
- , 1964 [1850]. *The Class Struggles in France, 1848–1850*. New York: International Publishers.
- , 1970 [1859]. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. New York: International Publishers.
- , 1977. *The Grundrisse*. Amherst NY: Prometheus Books.
- Memmi, Albert. 1991. *The Colonizer and the Colonized*. Beacon Press.
- Merton, Robert. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Modi, Ishwar. 2009. Indian Sociology Faces the World. Pp.23-26. In *Facing an Unequal World: Challenges for Sociology*, CNA Taiwan Conference, Taipei, March 23-26.
- Mondal, Lipon. 2021. The Logic of Dispossession: Capitalist Accumulation in Urban Bangladesh. *Journal of World-Systems Research*, 27(2):522-544.
- , 2023. The Political Economy of Land Expropriation in Urban Bangladesh. *Urban Studies*, 60(5):904-922.
- , 2024. The Urban Logic of Dispossession and Nomadism in Neoliberal Bangladesh. *International Journal of Comparative Sociology*. <https://doi.org/10.1177/00207152241261973>
- Mukherjee, Ramkrishna. 1977. Trends in Indian Sociology. *Current Sociology*, 25(3).

- Mukherji, Partha Nath. 2006. Rethinking Sociology in an Era of Transformatory Changes. *Sociological Bulletin*, 55(2).
- Müller, Max, 1883. What Can India Teach Us? Retrieved (13 February 2021): <https://www.gutenberg.org/files/20847/20847-h/20847-h.htm>
- Nkrumah, Kwame. 1970. *Consciencism: Philosophy and Ideology for De-Colonization*. New York University Press.
- Oommen, T. K. 1983. Sociology in India: A Plea for Contextualization. *Sociological Bulletin*, 32(2).
- Parsons, Talcott. 1937. *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.
- 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.
- 1964. *Social Structure and Personality*. New York. Free Press.
- 1967. *Sociological Theory and Modern Society*. New York: Free Press.
- 1971. *The System of Modern Societies*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- 1977. *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. New York: The Free Press
- 1978. *Action Theory and the Human Condition*. New York: Free Press.
- 1979. An Approach to the Theory of Organizations. *Organizational Science*. 13(1).
- Pyakurel, Uddhab Prasad. 2012. The State of Sociology in Nepal. *ISA Global Dialogue*, September 21.
- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Russell, Bertrand. 1945. *A History of Western Philosophy*. American Book-Stratford Press.
- Said, Edward. 1978. *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Sato, Yoshimichi. 2012. Internationalization of Japanese Sociology and Its Identity Crisis. *Footnote* 40(1): 1-2.
- Sen, Anupam. 1982. *State, Industrialization, and Class Formation in India*. London: Routledge.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Shah, Gulzar H., Asif Humayun Qureshi and Bushra Abdul-Ghaffar. 2005. Sociology as a Discipline in Pakistan: Challenges and Opportunities. *Sociological Bulletin*, 54(3):348-374.
- Siedman, Steven. 1994. *The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*. Cambridge University Press.
- Singh, Yogendra. 1986. *Indian Sociology: Social Conditioning and Emerging Concerns*. New Delhi: Vistar Publications.
- Smelser, Neil. 1959. *Social Change in the Industrial Revolution: An Application of Theory to the British Cotton Industry*. Routledge.
- Sooryamoorthy, R. 2016. Sociology in South Africa: Colonial, Apartheid and Democratic Forms. In *Sociology Transformed*. Series Editors: J. Holmwood and S. Turner.

- Spivak, Gayatri. 1999. *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Harvard University Press.
- Srinivas, M. N. 1994. Sociology in India and Its Future. *Sociological Bulletin*, 43(10).
- Stinchcombe, Arthur L. 1994. Disintegrated Disciplines and the Future of Sociology. *Sociological Forum*, 9 (2):279-291.
- Szelenyi, Ivan. 2015. The Triple Crisis of Sociology. *Contexts*. Retrieved (12 April 2020): <https://contexts.org/blog/the-triple-crisis-of-sociology/>
- Tavares-dos-Santos, J. Vicente. and Maira Baumgarten. 2006. Latin American Sociology's Contribution to Sociological Imagination: Analysis, Criticism, and Social Commitment. *Sociologias*, 1(se). Porto Alegre.
- Turner, Stephen. 2006. The Future of Sociological Theory. In *The New Blackwell Companion to Social Theory*. Edited by Bryan Turner. Oxford: Blackwell.
- Wagner, O. J. M. 1938. *Social Work in Cape Town*. Cape Town: Maskew Miller.
- Wagner, O. J. M. 1939. *Poverty and Dependency in Cape Town*. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
- Wallerstein, Imanuel. 1997. Euro-centricism and Its Avatars: The Dilemmas of Social Sciences. *Sociological Bulletin*, 46(1):21-39.
- 2001. *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms*. Philadelphia: Temple University.
- Weber, Max. 1961. On Protestantism and Capitalism. In *Theories of society: Foundations of modern sociological theory*, Vol. II. Edited by Parsons, T., Shils, E., Naegele, K. & Pitts, J. R. New York: The Free Press of Glencoe, Inc.
- 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
- Webster, Edward. 2004. Sociology in South Africa: Its Past, Present and Future. *Society in Transition*, 35(1).
- Wirth, Lewis. 1938. Urbanism as a Way of Life. *The American Journal of Sociology*, 44(1):1-24.

ক্রনো লাতুরের তত্ত্ব-ভাবনা পরিচয়
(Introduction to the Theoretical Ideas of Bruno Latour)
ড. দেবাশীষ কুমার কুসু*

সার-সংক্ষেপ

ফরাসি দার্শনিক, ন্যূবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী ক্রনো লাতুর একজন প্রভাবশালী সত্যোন্তর (পোস্ট-ট্রুথ) চিন্তাবিদ। সমসাময়িক পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীতার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য অবঙ্গন তৈরি করেছেন। লাতুরের সমাজচিন্তার সাথে বাল্লাভাবী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় থেকে এই প্রবন্ধের শুরুতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেছি। এরপর তাঁর তত্ত্ববিশ্ব থেকে সমাজবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী পাঠকদের জন্য উপযোগী বিবেচনা করে তিনি ধরণের তত্ত্বায়নের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা হাজির করেছি। তিনি ধরণের তত্ত্বায়ন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ তাঁর মৌলিক তাত্ত্বিক অবদান, সমাজবিজ্ঞান চর্চার সাথে সামঞ্জস্যতা ও সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে তত্ত্বের প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়েছে। তত্ত্বায়নসমূহ হচ্ছে: প্রথমত, সামাজিক নির্মান, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান; দ্বিতীয়ত, 'না-মানুষ' ও অ্যাক্টর-নেটওর্ক থিওরি; ও তৃতীয়ত, অ-আধুনিকতার ইত্তেহার। এই তিনি ধরণের তত্ত্বের উত্তর, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারকে প্রাথম্য দিয়ে সবশেষে জ্ঞানজগতে চালু থাকা সুবিদ্ধিষ্ঠ সমালোচনাসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের সাথে প্রাসঙ্গিক লাতুরের তিনি ধরণের তত্ত্বায়নের আরও গভীরতর পর্যালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

Abstract

Bruno Latour, a distinguished French philosopher, anthropologist, and sociologist, has emerged as a pivotal figure in the realm of post-truth discourse. This article aims to introduce Bengali readers to Latour's social thought by examining his life and intellectual contributions. To facilitate a comprehensive understanding for those interested in sociology, I will analyze three seminal theories from Latour's theoretical repertoire. These selections are informed by his foundational contributions, their relevance to sociological practice, and their broader implications for contemporary intellectual discourse. The theories under consideration include: i) Social Construction, Reality, and Science; ii) Non-Humans and Actor-Network Theory; and iii) Manifesto of Non-Modernity. This article will crystallize the origins, characteristics, and dissemination of these theories while also addressing the specific criticisms that have arisen within academic circles. I intend this critique to foster a deeper exploration of Latour's contributions and their significance for sociology.

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল: debashish.k@du.ac.bd

ক্রনো লাতুরের জীবন ও কর্ম

১৯৪৭ সালের ২২শে জুন ফ্রান্সের বারগেভির বুনেতে ওয়াইন উৎপাদনকারী এক পরিবারে ক্রনো লাতুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে একজন সত্যোত্তর (পোস্ট-ট্রুথ) দার্শনিক, ন্যূবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তিনি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও বহুল উদ্বৃত্ত তাত্ত্বিক। ফ্রান্সের সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাসমূহকে সবচেয়ে বেশি ভুলও বোঝা হয়। তিনি শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চায় আগ্রহী ছিলেন^১। ১৯৭১-৭২ সালের দিকে তিনি ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথমে দ্বিতীয় ও পরে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি তুরস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেন। তাঁর অভিসন্ধর্ভের শিরোনাম ছিলো- ব্যাখ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা: পুনর্গুরুত্বের মূল পাঠ বিশ্লেষণ।

আইভোরি কোষ্টে কাজ করার সময় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে তিনি বিউপনিবেশায়ন, ন্যূগাষ্টী ও শিল্পসম্পর্ক নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতেও মাঠকর্ম পরিচালনা করেন। লাতুর পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ন্তৃত্বে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞানীতি ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৮২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে অবস্থিত ইকোলে ন্যাশনাল সুপারিয়র দে মাইনের সেন্টার ডি সোশিওলজি ডি ইনোভেশনে অধ্যাপনা করেন। এর মধ্যে ২০০৭-২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সায়েন্স পো প্যারিসে গবেষণা সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন^২। ২০২২ সালের ৯ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে তিনি মারা যান।

এ পর্যন্ত তিনি বিশ্বটিরও বেশি পুস্তক ও ১৫০টিরও বেশি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার মধ্যে বেশি কয়েকটি রচনা চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। এসব পুস্তকে তিনি এমন কিছু প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, যা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে ও বিশ্লেষণে উদ্ভাবনী মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর রচিত ল্যাবরেটরি লাইফ, সায়েন্স ইন অ্যাকশন ও পাস্টুরাইজেশন অব ফ্রান্স- এ ধরণের কাজের উদাহরণ। তিনি স্বয়ংক্রিয় ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রযুক্তির ভালবাসা নিয়ে কাজ করেছেন, যার নাম- অ্যারামিস-দ্য লাভ অফ টেকনোলজি। প্রতিসম ন্যূবিজ্ঞান নিয়ে গভীর আলোচনার পুস্তক ‘উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন’ এ অ-আধুনিকতার রূপরেখা হাজির করেছে। এছাড়াও প্যান্ডোরার প্রত্যাশা: বিজ্ঞান যুদ্ধের ফলাফল কেমন হতে পারে- তা নিয়ে সামাজিক অধ্যয়নের বাস্তবতা সংক্রান্ত প্রবন্ধ তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতীর নির্দর্শন। শেষের দিকে তিনি পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, ও প্রকৃতির পরিবেশগত রাজনীতির রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কাজ করেছেন। কোভিড-১৯ নিয়ে তাঁর প্রকাশিত বইটিও যথেষ্ট আলোচিত হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে লাতুরের প্রধান তিনি ধরনের তত্ত্বাবধানের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোকপাত করা হলো।

সামাজিক নির্মাণ, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান

লাতুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান দিয়াগোতে সান্ক ইনসিটিউট ফর বায়োলজিকাল স্টাডিজের নিউরোএন্ডোক্রিয়োলজি ল্যাবরেটরিতে স্টিভ উলগারের সাথে দুই বছর ধরে এখনোগ্রাফি করেছেন। লাতুর পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ (এক্সপেরিমেন্টেশন) দেখেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নামে এগুলো কিভাবে আয়োজিত হয় -তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আবার লক্ষ্য করেন কীভাবে মাত্র একটি পরীক্ষণের আলোকে তত্ত্বের উত্থান-পতন ঘটে, যার সাথে হয়ত পরীক্ষাগারের অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মিল সামান্যই, অথবা একটু পাল্টে দেয়া হয়েছে। গত শতকের নবাইয়ের দশকের শুরুতে ক্রনো লাতুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞান

জার্নালে প্ৰকাশিত হওয়া বৈজ্ঞানিক সত্যেৰ প্ৰচলিত ধাৰণাকে প্ৰশ্নবিদ্ধ কৰেছেন। বৈজ্ঞান আসলে কি? কেবলমাত্ৰ পৱৰ্ক্ষাগাৰে যন্ত্ৰপাতিৰ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যবহাৰেৰ মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য উৎপাদিত হয়? এই ধৰণেৰ প্ৰশ্নসমূহ বিজ্ঞানচৰ্চাৰ সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীৰা তাৰ আগে খুব বেশি শুনেছেন বা উথাপন কৰেছেন বলে মনে হয়না। লাতুৱেৰ এই প্ৰশ্নগুলো কি জ্ঞানৱাজে বিজ্ঞানেৰ যে একচৰ্ছত্ৰ আধিপত্য ও উচ্চাসন- তা কি টলিয়ে দিয়েছে খানিকটা? লাতুৱ কেবল এই প্ৰশ্নগুলো উথাপন কৰেই ক্ষান্ত হলেন না, এসব প্ৰশ্নেৰ একটা ব্যাখ্যা দেওয়াৱও চেষ্টা কৰলেন। এই ব্যাখ্যা নিয়ে তৈৰি হলো (সিভ উলগাৰেৰ সাথে ঘোৰভাৱে রচিত) বিখ্যাত বই, ল্যাবৱেটোৱি লাইফ। এই বই মূলত বৈজ্ঞানিক সত্য/ প্ৰমাণেৰ বিভিন্ন ধাপ ও সেই সময়ে উদীয়মান বিজ্ঞান অধ্যয়ণেৰ বিভিন্ন উভ্রূত বিষয়কে কিভাবে ফ্ৰেম কৰা যায়- তাৰই দলিল।

যে বিজ্ঞান পৱৰ্ক্ষাগাৰেৰ ঘেৱাটোপে বন্দী, বিজ্ঞানীদেৰ ভাৰী চশমাৰ কাঁচ পেৰিয়ে সমাজ কোনদিন সে বিজ্ঞানেৰ প্ৰতিষ্ঠিত (উৎপাদিতও বটে) সত্যেৰ সৰ্বজনীনতা ও চিৱতনতা নিয়ে প্ৰশ্ন কৰতে পাৰতো না। জ্ঞান জগতে বিজ্ঞানেৰ সেই নাকচু ও একগুয়ে অবস্থানকে নিশানা কৰে লাতুৱ বৈজ্ঞানিক সত্যেৰ সামাজিক নিৰ্মাণঃ এৰ ধাৰণা দিলেন। পৱৰ্ক্ষাগাৰে বিজ্ঞান আসলে কি কৰে- সেই প্যান্ডোৱাৰ বাস্তুটাকে লাতুৱ মেন সাধাৰণ মানুষেৰ সামনে উন্মোচন কৰে দিলেন। তাতে প্ৰাথমিকভাৱে বিজ্ঞানীৰা বিৱৰণ কৰে হলেন, অবিজ্ঞানীৰা আশৰ্য হয়ে ভাৱলেন, বিজ্ঞানীৰা বিজ্ঞানেৰ নামে তাৰলে এসবই কৰেন। বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে হেয় প্ৰতিপন্থ কৰা লাতুৱেৰ উদ্দেশ্য ছিলো। তবুও তাৰ খুব বদনাম হলো বিজ্ঞানীদেৰ তৰফ থেকে। আসলে লাতুৱ পৱৰ্ক্ষাগাৰেৰ ঘেৱাটোপ থেকে নানা বিদ্যায়তনিক পৱিভাৱৰ নিচে চাপাপড়া বিজ্ঞানকে উন্মুক্ত কৰে দিলেন অবিজ্ঞানীদেৰ জন্য। পৱৰ্ক্ষাগাৰে কৰ্মৱত বিজ্ঞানী, প্ৰশাসনিক ও গবেষণা কৰ্মকৰ্তা, পৱৰ্ক্ষাগাৰ সহকাৰি, পৱৰ্ক্ষাগাৰেৰ যন্ত্ৰপাতি ব্যবহাৰেৰ নিয়মকানুন ও বাজেটেৰ উৎসসহ বিজ্ঞানী কিংবা ফাস্টি এজেন্সিৰ পৱিচয়, কোন এলাকাৰ গবেষণাগাৰ, ধৰ্ম-বৰ্ণ-পৱিচিতি, রাজনৈতিক দৰ্শন ও পিতৃতাৰিক মতাদৰ্শ প্ৰভৃতিৰ যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিৰ্মাণে ভূমিকা রাখে -তা নিয়ে কথা বলাৰ ক্ষেত্ৰে যুগেৰ পৱ যুগ এক ধৰণেৰ অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আৱোপিত ছিলো। ফলে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানেৰ নৈৰাগিক জ্ঞান নিয়ে কোন প্ৰশ্ন তোলা সম্ভব ছিলো না। বিশেষ কৰে, যে পৱিসৱেৰ মধ্যে ও যেভাবে এইসব জ্ঞান তৈৰি হয় -তা নিয়ে।

পৱৰ্ক্ষাগাৰে এখনোগ্ৰাফি কৰতে নিয়ে লাতুৱ দেখলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ নামে এখানে অনিদিষ্ট বা সুস্পষ্ট নয় কিংবা কোন নিদিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সম্ভব নয়- এমন উপাত্তও তৈৰি হয়। এগুলো সাধাৰণত পৱৰ্ক্ষণ পদ্ধতিৰ অসাড়তা কিংবা কোন যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৰ্থতাৰ সাথে সম্পৰ্কিত। কখনো কখনো এগুলো পৱৰ্ক্ষণপৱিকল্পনাৰ দুৰ্বলতা হিসেবেও মনে হয়। আবাৰ দেখা গেছে, পৱৰ্ক্ষাগাৰে প্ৰাপ্ত সব উপাত্ত ব্যবহাৰ কৰা হয়না। কোন উপাত্ত ব্যবহাৰ কৰা হবে, আৱ কোন উপাত্ত ছুঁড়ে ফেলা হবে -এই সিদ্ধান্তেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে এক ধৰণেৰ বিষয়গত বা প্ৰেক্ষিতনিৰ্ভৰ উপসংহাৰ টানা হয়। কাজেই সৰ্বজনীনতা বা বৈজ্ঞানিক সত্যেৰ নামে প্ৰতিষ্ঠিত নিৰপেক্ষতা ও সঠিকতা নিয়ে অবিজ্ঞানীৰা যতই মাতামাতি কৰেন না কেন, গবেষণায় প্ৰাপ্ত উপাত্তেৰ মধ্যে কোনগুলো ফেলে দিলে বা আমলে না নিলে বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্ত যথেষ্ট পৱিমানে ‘বিজ্ঞানসম্মত’ হয়ে উঠিবে- বিজ্ঞানীৰা সেই অনুশীলনই কৰেন। লাতুৱ একেত্ৰে খুবই ভিন্ন ধৰণেৰ ও বিতৰ্কিত মতামত দিয়েছেন- তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই মূল প্ৰশ্নেৰ উভৰ দিতে গিয়ে লাতুৱ বলেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাৰ বিষয়বস্তুসমূহ পৱৰ্ক্ষাগাৰেৰ নিয়ন্ত্ৰিত পৱিবেশেৰ মধ্যে সামাজিকভাৱে নিৰ্মিত হয়েছে। সৌকাল হক্সেৰ অ্যালান সৌকাল মনে কৱতেন যে, লাতুৱ সম্ভবত বলতে চাইছেন, পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ সূত্ৰগুলো

এক ধরণের সামাজিক বিধি ছাড়া আর কিছু নয়। লাতুরের চিন্তাপন্থতি অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে বিশ্বাস, মৌখিক প্রথা ও সংস্কৃতি (রাজনৈতিকও বটে) নির্ভর অনুশীলন বলে মনে করা হয়। এগুলো পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতির বাইরে গিয়ে প্রকাশ্য হতে পারেনা, কারণ এসবের মধ্য দিয়েই তাকে মাপা হয়, আবার বিজ্ঞানীরাই এগুলোকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত লাতুরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই, সায়েস ইন অ্যাকশন: হাউ টু ফলো সায়েন্টস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারস থ্রি সোসাইটি⁴ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলীরা একটা নতুন ধরনের সহযোগী সংগঠনের নামে কথা বলে থাকেন, যে সংগঠনকে তারাই তৈরি করেছেন এবং নিজেরাই তার সদস্যপদ নিয়ে থাকেন, প্রতিনিধি নিয়োগ করেন ও প্রতিনিধিত্ব করেন। আবার ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে অপ্রত্যাশিত সম্পদের ব্যবহারও করে থাকেন। এই বইতেই লাতুর প্রথম না-মানুষ (নন-হিউম্যান অ্যাক্টর) এর কথা বলেন।

বাস্তবতা কি? এই প্রশ্ন লাতুরকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস⁵-এর এক লেখায় সে প্রসঙ্গই ঘুরেফিরে এসেছে। কোন জিনিস যে বাস্তব -তা বোবার গৰ্বাধা রাস্তা আছে। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান থেকে আমরা এটাই জেনে এসেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্য/ প্রমাণ ও বন্ধ এখানেই এই পৃথিবীতে ছিলো (বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ার আগে), বিজ্ঞানের বদৌলতে বিজ্ঞানীরা সেই সত্য উন্মোচন করেছেন বা আমাদের সামনে হাজির করেছেন মাত্র। লাতুর একটু দ্বিমত করে বললেন, বৈজ্ঞানিক সত্যকে বরং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল হিসেব দেখা উচিত। সত্য/ প্রমাণ সবসময় নেটওয়ার্কের মধ্যে অবস্থান করে। এটা তাদের অপরিহার্য অক্তিমতার শক্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড়ায় না, বরং প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই সত্যগুলো তৈরি হয় ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। এই নেটওয়ার্ক না থাকলে এই সত্যও আর দাঁড়িয়ে থাকেনা। গত শতকের মধ্য নবহইয়ের দশকে পুরো দুনিয়া যখন বিজ্ঞান যুদ্ধে মাতোয়ারা, তখন বাস্তববাদ ও সামাজিক নির্মাণবাদ নামের দুই তাত্ত্বিক ঘরাণার মধ্যে কঠিন বাহাস হয়। বাস্তববাদীরা মনে করেন, সত্য/ প্রমাণ নৈব্যক্তিক ও একা একা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক নির্মাণবাদীরা মনে করেন, এই ধরণের সত্য/ প্রমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। লাতুর দ্বিতীয় ঘরাণার অনুসারী।

লাতুরের ল্যাবরেটরি লাইফ বই থেকে উৎপাদিত ‘সামাজিক নির্মাণ’ দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে, যা পরবর্তীতে সায়েস ইন অ্যাকশন বইয়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। ‘বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড এক ধরণের সামাজিক বিধি’- এই দাবী প্রচল সমালোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানকে বোবার এই ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ‘সেক্ষ সার্ভিং ফিকশন’ বলেও দাবী করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দীর্ঘদিন আলাদা হয়ে ছিলো। নানা সমালোচনা সত্ত্বেও, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার সাথে দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচ্ছেদকে সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে লাতুর প্রথমে একত্র করার চেষ্টা করেন। প্রবল সমালোচনার মধ্য দিয়ে হলেও সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য তারপর থেকে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, ও পরীক্ষাগার নিয়ে আলোচনার পরিসর তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানের সত্য নির্মাণের কলাকৌশলকে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করা সেই লাতুর আবার বিজ্ঞানেই ফিরে এসেছেন।

‘না-মানুষ’ ও অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি

প্রাকৃতিক দুনিয়া কি কি শক্তি ও বন্ধুগত উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি তা নিয়ে এক ধরণের সর্বজনমান্য বোধগম্যতা আছে। আবার সামাজিক দুনিয়ার শক্তি ও বন্ধুগত উপাদান সম্পর্কে প্রায় সবারই কিছু ধারণা আছে বলে মনে করা হয়। ব্যক্তি মানুষ কীভাবে তার দুনিয়াকে

ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোকে আমলে নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা তৈরি করা হয় -এই দুই বোধগম্যতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে ত্রুটির পরিমাণ।

২০০৫ সালে মিশেল ক্যালন ও জন ল এর সাথে যৌথভাবে লাতুর রিএসেমেন্ট দ্য সোশাল: এন ইনস্ট্রোডাকশন টু অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি নামের বইটি প্রকাশ করেন⁶। এই বইটিকে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরির অন্যতম প্রধান প্রকাশনা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। আর একারণে অবধারিতভাবেই লাতুর এই তত্ত্বের প্রধান বুদ্ধিগতিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। লাতুর এই বইতে, অনুশীলনধর্মী অধিবিদ্যার কথা বলেছেন। যার মানে, বাস্তব হচ্ছে তাই, যা একজন কারক (অ্যাক্টর) তার কাজের জন্য প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন। কেউ একজন অলৌকিক কোন অনুপ্রেরণায় গরীব লোকজনকে সাহায্য করতে পারেন। এখানে এই অলৌকিকতার উপস্থিতির একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে, তবে এটা কোনভাবেই সামাজিক বিষয় নয়। লাতুর এ ক্ষেত্রে নানান মানুষকে এক পরিসরে নিয়ে আসা ও কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধারণার দিকে প্রত্যক্ষণধর্মী নজর দেওয়ার কথা বলেছেন।

এই তত্ত্বে বুদ্ধিগত অ-বস্তুগত প্রত্যয়সমূহ যেমন, সমাজ, পুজিবাদ ও অর্থনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। বলা যায়, এসব প্রত্যয়কে ব্যবহার না করে বিকল্প কি ব্যবহার করে এসবের মানে তৈরি করা ও তা সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে যৌথভাবেই তৈরির জন্য ব্যক্তি বা বস্তুর একক ভূমিকার প্রতি নজর দেয়া হয়। যে কারণে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরিকে সমতল জ্ঞানতত্ত্ব (ফ্ল্যাট অনটেলজি) বলা হয়, যার মানে হচ্ছে, মানুষ, না-মানুষ (নন-হিউম্যান), প্রত্যায় ও কল্পনাত্মক স্বাইকে এখানে একই রকমভাবে দেখা হয়। এইসব সত্তাকে এখানে কারক (অ্যাক্টর/ অ্যাক্ট্রেন্ট) নামে ডাকা হয়। এসবের পরিচিতি ও মর্যাদা সমাজে যাই হোক না কেন, প্রত্যেককেই অন্য বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দিয়ে বোঝা বা চিহ্নিত করা হয়। এদের বাস্তব কর্মকাণ্ডের পেছনে আর কোন অতিরিক্ত বস্তুগত সারমর্মতা লুকায়িত থাকেন। তবে পরবর্তীতে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি নিয়ে লাতুরের অবস্থান পাল্টেছে। এই পাল্টানোর একটা কারণ বিভিন্ন রকমের আসল বা সত্য পরিস্থিতির মধ্যে অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি পার্থক্য করতে সক্ষম নয়, যা ভিন্নভিন্ন ধরণের বাস্তবতা তৈরি করে। এই সমস্যা সমাধান করার ইচ্ছা নিয়ে লাতুর পরবর্তীতে ‘অস্তিত্বের নানান ধরণ’ প্রকল্পে কাজ করেছেন।

অ্যাকটর-নেটওয়ার্ক থিওরি অনুসারে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটা সর্বব্যাপী নেটওয়ার্কের অংশ। এই নেটওয়ার্কের প্রত্যেক উপাদান একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। কিভাবে একটা বিষয়ী (অবজেক্ট) এই নেটওয়ার্কের মধ্যে মানুষের মতো বা সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? এই ধারণাটাই সনাতনী সমাজবিজ্ঞানকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরিতে লাতুর সমতল জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহার করে একটা পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যর (মেথডোলজিক্যাল সিমেট্রি) ধারণা আমাদের সামনে নিয়ে এলেন। নেটওয়ার্কে উপস্থিত থাকা মানুষ, প্রত্যায়, বস্তু, দর্শন, অর্থনৈতিক প্রপৰ্যাণ ও মতবাদ -স্বাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলো। কে মানুষ আর কে মানুষ নয় কিংবা কম্পিউটার, সুনামি, তালিবান, মার্কিন, চেয়ার, টেবিল, তরবারি, কলম, ইলেক্ট্রন ও প্রোটন -স্বারাই এজেন্সি আছে। কেউ বড় বা কেউ অতি ক্ষুদ্র, তবে নগণ্য নয়। কেউ হয়ত কাউকে তৈরি করেছে। কোন কিছু হয়ত অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারছেন। কাউকে হয়ত খালি চোখে দেখাই যায় না। কেউ হয়ত এত বড় যে পুরোটা একবারে দেখাই সম্ভব নয়। এগুলোই লাতুরের কারক (অ্যাক্টর)। তবে লাতুরের সমতল জ্ঞানতত্ত্ব অনুসরন করে ‘অ্যাকটেন্ট’ বললে মানুষ ও না-মানুষের প্রভেদ লুপ্ত হয়। এই তত্ত্বে সকল সত্তা একই রকমভাবে ক্ষমতাশালী নয়, কিন্তু তারা একইরকম বাস্তব⁷। না-মানুষেরও

এজেন্সি আছে, মানুষের মতোই। যেখান থেকে লাতুর মূলত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও জ্ঞানপদ্ধতিগত অবদান রেখেছেন। এই অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি একই সাথে তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতিও। অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরির যে পদ্ধতিগত পাটাতন তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারার ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক জটিলতা আছে। সেই জটিলতার মূল কারণ হচ্ছে যে এতদিন পর্যন্ত এজেন্সির ব্যাখ্যায় কেবলমাত্র মানুষ বা মানুষস্থানীয় বিষয়সমূহেরই এজেন্সি আছে বলে আমরা ধরে নিতাম। লাতুর প্রথম আমাদের সামনে “নন-ইউম্যান অ্যাক্টর” প্রত্যয় আমাদানী করলেন, যারা মানুষ না। এদের নাম দিলেন ‘অ্যাকটেন্ট’, যাদের এজেন্সি আছে। যখনই লাতুর মানুষ ও না-মানুষের প্রভেদ মিলিয়ে দেওয়া ‘অ্যাকটেন্ট’কে গুরুত্ব দিলেন, তখনই সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথাগত চিন্তা সাংঘাতিক রকমের ধার্কা খায়।

অ-আধুনিকতার ইঙ্গেহার

ন্যূবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে ‘আধুনিকতা’ একটি তত্ত্ব নির্ধারক প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির আলোচনা অনেকটা প্রাক-আধুনিক, আধুনিক ও উত্তর-আধুনিকতার ক্রমবিকাশ অনুযায়ী প্রচলিত আছে। এই দুই বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রে তত্ত্ব বিকাশের পরম্পরাও সরাসরি আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা দ্বারা চিহ্নিত করার রীতি রয়েছে। এই দুই শাস্ত্রে ধরেই নেওয়া হয়েছে- আধুনিকতা আছে, আধুনিকতার সমালোচনাও আছে, তবে তা হয় প্রাক-আধুনিক (অনেকে গতানুগতিকতা দিয়েও এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করেছেন) ও উত্তর-আধুনিকতার বাতাবরণে। এই ধরণের আলোচনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আধুনিকতার সমালোচনা করতে গেলেও আধুনিকতার অস্তিত্ব মেনে নিয়েই করতে হয়। এই ব্যান অনুসারে, উপনিবেশিকতার হাত ধরে বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) উন্নয়নশীল ও অনন্ত এলাকায় আধুনিকতা প্রবেশ করে। প্রাক-উপনিবেশিক সমাজকে প্রাক-আধুনিকতার সমার্থক মনে করার জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রয়েছে। একটা সময়ে প্রতি-আধুনিকরা আধুনিকতার সমালোচনা করা শুরু করলে সেই আলোচনা এক সময় প্রাক-আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে যাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো, সেই বৈশিষ্ট্যকে আর ফেলে রাখা গেলো না। নৌকা, গরুর গাড়ি থেকে রেলগাড়িতে কিংবা ডিজেলচালিত বাসে উত্তরণকে আধুনিকতা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই জলবায়ু পরিবর্তনের কালে বলা হচ্ছে, আধুনিকতার মানে কার্বন পোড়ানো। ইউরোপ জুড়ে আবার ফিরে এসেছে বাই-সাইকেলের মতো ‘লো-টেক’ জ্ঞানার যানবাহন, যা পরিবেশবান্ধব। জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ায় না। নদীতে, পুরুরে ডিঙি নৌকার আদলে ফিরে এসেছে ‘কায়াক’ নামের বৈঠাচালিত জলযান। এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করে সেই প্রাক-উপনিবেশ যুগের সমাজ ও প্রযুক্তিকে অ-আধুনিক বলে খারিজ করি?

লাতুর স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি এই জ্ঞানতাত্ত্বিক দশা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টারই ফসল, তাঁর বিখ্যাত বই, উই হ্যাভ নেভার বিন মডার্ন। ১৯৯১ সালে ফরাসি ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়, বছর তিনিকে পরে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে^৪। এই বইতে লাতুর আমাদেরকে একদম নতুন একটা কথা জানাচ্ছেন, আমরা কখনও আধুনিক (মডার্ন) ছিলাম না। এর আগে সম্ভবত আমাদের বোঝা দরকার, আমরা আধুনিক বলতে আসলে কী বুঝি। আধুনিকতা নিয়ে বলতে চাইলে একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে বলতে হয়। শুরু করতে হয়, গতানুগতিক (ট্র্যাডিশন) দিয়ে, যা অনেক বছর ধরে বহমান, এটাই রীতি, এমনটাই হয়ে এসেছে, এমন সব কায়দা-কানুন ও জীবনচার। বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শর্তপূর্ণ সাপেক্ষে ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গতানুগতিকতা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যুক্তি -সে ধরণের কিছু শর্ত। আধুনিক হওয়ার মোটামুটিভাবে একটা সর্বমান্য একরৈখিক পথ রয়েছে, যেটাকে অনুসরণ করে আধুনিক হওয়া যায়। এরপর উত্তর-আধুনিক (পোস্ট-মডার্ন) একটা প্রবণতা

এসে আধুনিকতাৰ একৱৈধিকতাকে প্ৰশংসিত কৰেছে। তাৰপৰ থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে আধুনিকতা ও উত্তৰ-আধুনিকতা ডিসকোৰ্সেৰ যুগপথ সহাবস্থান।

উল্লেখিত বইতে লাতুৰ দেখাচ্ছেন, যদি বিজ্ঞান অধ্যয়ন ঠিকঠাক প্ৰকৃতি ও সমাজেৰ প্ৰভেদকে মুছে ফেলতে পাৰে, তাহলে একটা কঠিন বৈপৰীত্য মেনে নিয়ে আমাদেৱ পক্ষে বিপৰীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না। আমৰা সবসময় সামাজিক নিৰ্মাণবাদ ও বাস্তুবাদেৱ মধ্যেই হাৰুড়ুৰু খেতে থাকবো। লাতুৰ এই বৈপৰীত্যেৰ উৎস খুঁজতে চেয়েছেন, আধুনিকতাৰ ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন, এবং আনুপাতিক নৃবিজ্ঞানেৰ সামষ্টিকতাৰ বিকল্প কিছু আমাদেৱ সামনে হাজিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰেছেন।

আমৰা বহু শতাব্দী ধৰে চলতে থাকা প্ৰাকৃতিক দুর্যোগকে সম্প্ৰতি জলবায়ু পৱিবৰ্তনেৰ ধাৰণাৰ সাথে যুক্ত কৰাইছি। বহু বছৰ ধৰে চলমান যে বাস্তবতা তা গত ৩০ বছৰেৰ মধ্যেই পাল্টে গেছে নাকি চিন্তা পৱিবৰ্তনেৰ মাধ্যমে আমৰা একই বিষয়কে ভিন্নভাৱে ফ্ৰেম কৰাইছি? আমাদেৱ মধ্যে একটা ধাৰণা তৈৰি হয়েছে যে, অতীতকে আৱ আসলে নতুন কৰে নিৰ্মাণ কৰা যায়না। লাতুৰ দেখিয়ে দিলেন, যখন আমৰা অতীতকে কেবলমাত্ৰ বিষয়ী (অবজেক্ট) হিসেবে ভাবতে পাৰি তখনই কেবলমাত্ৰ আমৰা অতীতকে নিৰ্মাণ কৰতে পাৰি। লাতুৰ আমাদেৱ সামনে ওজনস্তোৱে ক্ষয়কে উদাহৰণ হিসেবে হাজিৰ কৰলেন। তাৰপৰ একটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰলেন, আমৰা এমন কোনো একটা গবেষণাৰ কথা ভাবতে পাৰি কি না যেটা একই সাথে প্ৰাকৃতিক, সামাজিক ও অবিনিৰ্মিত।

লাতুৰ আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা কৰতে যেয়ে চিন্তাৰ দুইটি মেৰুক বা পুলেৱ কথা বলছেন। একটি হচ্ছে প্ৰকৃতি (নেচাৰ) এবং আৱেকটি হচ্ছে সংস্কৃতি (কালচাৰ)। কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থে তিনি আসলে বলেছেন বিজ্ঞানেৰ কথা। আবাৱ সংস্কৃতি বলতে বলেছেন রাজনীতিৰ কথা। অৰ্থাৎ তিনি প্ৰকৃতি ও সংস্কৃতি নামেৱ দুইটি মেৰুৰ অন্তৰালে বলেছেন বিজ্ঞান ও রাজনীতিৰ কথা। এই মেৰু দুইটি দিয়ে আমৰা দুই রকমেৰ চিন্তা নিৰ্মাণ কৰতে পাৰি। এই দুইটি মেৰু আসলে দুটি আলাদা সত্তা, ভিন্ন ভাৱে আছে।

যখন এই দুইয়েৰ মধ্যে মিশণ ঘটে, তখন আমৰা তাকে দোআঁশলা (হাইব্ৰিড) বলতে পাৰি। এটা যখন ঘটে, তখন একটা আৱেকটিৰ মধ্যে এমন ভাৱে মিশে যায়, আমৰা আৱ আলাদা কৰতে পাৰি না। তখন এই দুই মেৰু খুব বড় প্যারাডক্স হিসেবে আবিৰ্ভূত হয় এবং এটা থেকে আমাদেৱ কোন উত্তৱণ নেই বলে ধৰে নিতে হয়। তিনি এই প্ৰবণতাকে বিষয় ও বিষয়ীৰ একটা দৈতবাদ (ডুয়েলিজম: একই অঙ্গে দুইৱৰ্কপ) বলে দেখানোৰ চেষ্টা কৰেছেন। এই দুই সত্তা এমনভাৱে মিশে গেছে যে আমাদেৱ পক্ষে এ দুই সত্তাকে আৱ কখনোই আলাদা কৰা সম্ভব হয় না। এই ধাৰাবাহিকতায় মানবতাৰাদ ও আধুনিকতাকে আমৰা গুলিয়ে ফেলবো। লাতুৰ এখানে বলতে চেয়েছেন, আধুনিকতাকে আসলে আমৰা মানবতাৰাদ দিয়েই বুৰাতে চেয়েছি। এবং এৱ বাইৱে আধুনিকতাৰ কোনো মানে তৈৰি কৰতে চাই নি। তিনি আৱও উল্লেখ কৰছেন, আধুনিকতা একটা অভ্যাস। এখানে বিষয় ও বিষয়ী আছে, তাৰে এজেসি আছে। এই দুই ধৰণেৰ বৰ্গ নিয়ে যদি আমৰা সংবিধান রচনা কৰতে যাই তাহলে কে আসলে এই সংবিধান লেখায় মূল দায়িত্ব নেবে। কম্পিউটাৰ নিজে নাকি কম্পিউটাৰেৰ পেছনে থাকা পৰিচলক। যন্ত্ৰ নাকি যন্ত্ৰেৰ পেছনেৰ মানুষটি। উত্তৰ তাহলে দুটিই। কেননা এই মিশে যাওয়া ঠেকানো যাচ্ছেনা।

আবাৱ প্ৰকৃতিকে আমৰা কেবলমাত্ৰ বিশুদ্ধ প্ৰকৃতি হিসেবে দেখতে পাৰি বটে, কিন্তু আমৰা যে প্ৰকৃতিকে চিনি, প্ৰকৃতিৰ সেই চেহাৰা বিজ্ঞান আমাদেৱ সামনে হাজিৰ কৰে। যে কাৱণে বিজ্ঞান হচ্ছে সেই লেন্স যাৱ মধ্য দিয়ে আমৰা প্ৰকৃতিকে খুঁজে পাচ্ছি। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিকে

আমরা আমাদের ভাষায় ও আলোচনায় যেভাবে দেখি, তা আসলে কী? এটি প্রাকৃতিক নাকি সামাজিক নাকি অবিনির্মিত? এই মিশে যাওয়ার ব্যাপারটাকে মূলত লাতুর চিহ্নিত করছেন হাইব্রিডাইজেশন নামে। কাজেই কোন একটি নির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন অতিক্রম করে যখন মাল্টি-ডিসিপ্লিনারিটি অথবা ইন্টার-ডিসিপ্লিনারিটির কথা বলা হয় তখন তা স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকতাকে অতিক্রম করে যায়।

এই হাইব্রিডাইজেশনের বিপরীতে লাতুর বিশুদ্ধীকরণ (পিউরিফিকেশন) এর কথা বলেছেন। এই হাইব্রিডাইজেশন থেকে বিশুদ্ধকে আলাদা করতে পারা খুব সহজ কাজ নয়। প্রকৃতি-সংস্কৃতি এই দুই মেরুর অস্তিত্ব যদি একই সাথে মিশে যায়, মিশে যাওয়ার আগে তারা আলাদা দুটো অস্তিত্ব ছিল, তাহলে আমরা ওই দুটো মেরুকে কীভাবে আবার ফেরত পেতে পারি, সেই জটিলতা রয়ে গেছে। মিশে যাওয়া অবস্থায় নিজেদেরকে তারা কীভাবে কথা বলবে, প্রতিনিধিত্ব করবে-সেই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। লাতুর এই জটিল সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে দার্শনিক ফ্রেডারিক নিংসেকে মনে করছেন। যিনি বলেছেন, এই আধুনিকতাকে সংজ্ঞায়ন করার সমস্যাটা হচ্ছে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার মতো। অর্থাৎ ঠাণ্ডা পানিতে আপনি যত দ্রুত নামবেন তার চেয়েও দ্রুত আপনি উঠে আসতে চাইবেন। কাজেই আমরা আধুনিকতার মধ্যে বাঁপ দিতে পারি বটে, বাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃন্তি এবং সংস্কৃতি মেরুর মধ্যে যে দৈতবাদ (পিউরিফিকেশন এবং হাইব্রিডাইজেশন) সেখানে আমরা প্রবেশ করবো এবং খুব দ্রুত আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকবো।

আবার এই যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতি -একজন আধুনিক মানুষের (যদি থাকতো!) পক্ষে এই দুই মেরুকে খুব স্পষ্টভাবে আলাদা করে রাখা সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীতে আমরা সম্ভবত এমন কোনো তত্ত্ব তৈরি করতে পারিনি, যার ডিসকোর্সের আওতায় দুটো প্রান্ত মিশে যায় না। মিশে যাওয়া পর্যন্ত লাতুর কোনো সমস্যা দেখেন না। তিনি বলেছেন যে, মিশে যাওয়ার পর এটিকে কে প্রতিনিধিত্ব করবে -এই সংক্রান্ত ধারনা আধুনিকতা দেয় না। কাজেই আধুনিকতার এই ধারনা নিজেই আসলে একটি অ-আধুনিক আলোচনা। লাতুর সবশেষে হাজির হয়েছেন এই ধারনা নিয়ে যে, আসলে ঐ অর্থে আমরা কখনো আধুনিক ছিলাম না। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, আধুনিকতা কখনো শুরু হয় নি, এটি হওয়া সম্ভবও ছিলো না কখনো।

পর্যালোচনা ও উপসংহার

লাতুরের সমাজচিন্তার সাথে বাংলাভাষী পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় থেকে এই প্রবন্ধের শুরুতে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেছি। এরপর তাঁর তত্ত্ববিশ্ব থেকে সমাজবিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী পাঠকদের জন্য উপযোগী হবে বিবেচনা করে তিনি ধরনের তত্ত্বায়নের উপর পর্যালোচনাধর্মী আলোচনা হাজির করেছি। তত্ত্বায়নসমূহ হচ্ছে: প্রথমত, সামাজিক নির্মান, বাস্তবতা ও বিজ্ঞান; দ্বিতীয়ত, ‘না-মানুষ’ ও অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরি; ও তৃতীয়ত, অ-আধুনিকতার ইস্তেহার। এই অংশে লাতুর প্রদত্ত তিনি ধরণের তত্ত্বায়ন সম্পর্কে জ্ঞানজগতে প্রচলিত থাকা সমালোচনাসমূহকে আমলে নিয়া হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক বাস্তবতা (সোশ্যাল ফ্যাক্ট) অনুধাবনে এমিল ডুর্ভিমকে তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়। এমিল ডুর্ভিমের সামাজিককে সামাজিক বাস্তবতা দিয়েই বোঝার কায়দাকে লাতুর অমান্য করেছেন। কারণ লাতুর মনে করেছেন, বস্তু বা প্রযুক্তির ক্ষমতাকে অগ্রহ্য করে সামাজিককে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখানে প্রাণহীন জড়বস্তুও ‘সামাজিক বস্তু’ হিসেবে গণ্য করা হয়। ‘সামাজিক বস্তু’কে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে তাই অতীন্দ্রিয় ও ছদ্ম বলে সমালোচনা আছে¹⁰। আবার বিজ্ঞান বলতে লাতুর সামাজিক ও

কৃৎকৌশলগত উপাদানকে আলাদা করেন নি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত সত্ত্বের সর্বজনীনতাকে আশ্রয় করে বিজ্ঞানের যে প্রबল ভাবমূর্তির সমালোচনা লাতুর করেছেন, তাকেও একধরণের ব্রেচ্ছাচারিতা হিসেবে বিবেচনা করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা কড়া প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞানকে সবসময় নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করার প্রচেষ্টাকে সাধারণ মানুষের সামনে বিজ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্থ করার পাগলামি হিসেবে দেখা হয়।

লাতুর রাজনৈতিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে না-মানুষদের এজেন্সি না থাকাকে জোরালো সমালোচনা করেছেন। আর তাই তাঁকে মোটাদাগে না-মানুষকে এজেন্সি দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়¹¹। এটা বলা হয়ে থাকে যে, প্রাণহীন বস্তু বা যত্নের নিজস্ব জড়সম্ভাব জন্য কোনও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা ইচ্ছাশক্তি থাকেনা, যা কেবলমাত্র মানুষেরই থাকে। কাজেই মানুষের এজেন্সি থাকলেও ও না-মানুষের এজেন্সি বাতুলতা মাত্র। লাতুরকে এখানে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে, লাতুর সমাজ গঠন সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণায় মানুষের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছেন, বস্তুকে পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যের নামে মানুষের সমান বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই সনাতনী সমাজবিজ্ঞানে ‘সমাজ’, ‘সামাজিক’, ও ‘সামাজিক সম্পর্ক’ বলতে যা বোঝানো হয়, লাতুরের সমাজ ও এর গঠন তেমনটা নয়। কারণ এটা কেবল মানুষের সমাজ নয় (দেখুন, লিনডেম্যান, ২০১১)। এই ধারাবাহিকতায়, অ্যাক্টর-নেটওয়ার্ক থিওরিকেও সমালোচনা করা যায় এই বলে যে, পদ্ধতিগত প্রতিসাম্যের দোহাই দিয়ে নামে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে এক ধরণের নৈরাজ্য চালুর চেষ্টা করা হয়েছে।

আধুনিকতা বিষয়ে লাতুরের বক্তব্য হচ্ছে, প্রকৃতি ও সংস্কৃতি বিষয়ক আধুনিকতাবাদী পার্থক্য কখনো অস্তিত্বশীল নয়, কাজেই মানুষের পক্ষে আধুনিক হওয়া সম্ভব নয়। লাতুর এই দুই মেরুর মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে গিয়ে দারী করেছেন আমরা বড়োজোর অ-আধুনিক। এই আলোচনায়, লাতুর আধুনিকতা বলতে আসলে যা বোঝায় ও আধুনিকতা বলতে আমরা যা বুঝি- এই দুইয়ের পার্থক্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে বলতে চেয়েছেন- আধুনিক হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিকতা সংক্রান্ত লাতুরের এই ভাবনা-পদ্ধতিকে এই বলে সমালোচনা করা হয়েছে যে, এটা যথেষ্ট কার্যকর নয়। বিশেষ করে যখন প্রাক আধুনিক ঐতিহ্যসমূহকে শোষণমূলক ও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর¹² বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. Tesch, Noah. "Bruno Latour". *Encyclopedia Britannica*, 18 Jun. 2021, <https://www.britannica.com/biography/Bruno-Latour>.
2. <http://www.bruno-latour.fr/biography.html>
3. Latour, Bruno and Steve Woolger (1979). *Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts*, Princeton: Princeton University Press.
4. Latour, Bruno (1987). *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*, Cambridge Mass: Harvard University Press.
5. <https://www.nytimes.com/2018/10/25/magazine/bruno-latour-post-truth-philosopher-science.html>
6. Latour, Bruno (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, New York: Oxford University Press.

7. Harman, Graham., Latour, Bruno (1947–), 2016,
doi:10.4324/9780415249126-DD106-1. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*,
Taylor and Francis, <https://www.rep.routledge.com/articles/biographical/latour-bruno-1947/v-1>.
8. Latour, Bruno (1993/1991). *We Have Never Been Modern*. Translated by Catherine Porter, Cambridge: Harvard University Press.
9. Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900 (2006). *Thus spoke Zarathustra: a book for all and none*, Cambridge: Cambridge University Press.
10. Stemenkovic, Philippe (2020). The contradictions and dangers of Bruno Latour's conception of climate science, *Disputatio. Philosophical Research Bulletin*, 9 (13): 1-34.
11. Lindemann, Gesa (2011). On Latour's Social Theory and Theory of Society, and His Contribution to Saving the World, *Hum Stud*, 34: 93-110.
12. Sassower, Raphael. 2022. Why Does Latour the Postmodern Critic Still Matter? *Social Epistemology Review and Reply Collective*, 11 (12): 1-9.

Neoliberalism and Economic Transformation in Rural Bangladesh: A Study on Palsa Village

Saraf Afra Mou¹, Dr. A.K.M. Jamal Uddin²

Abstract

The massive economic change throughout the world is highly connected to the development of neoliberalism in society since the late twentieth century. Neoliberalism mainly deals with a political economic approach involving privatized market economy, promoting free-market and consumerism, facilitating microcredit, entrepreneurial trend and so on. Bangladesh, like many other developing countries, has a lot to do with her predominant agriculture-based economy. The state has been gradually moving toward the global trend of neoliberalism through new economic and policy formations. In between these, is the rural economy still distinct? Or are they positively or negatively impacted by the neoliberal formations? The present study aims to answer these questions. The study is conducted on Palsa village under Chapainawabganj district in Bangladesh. Mixed method combining both of the qualitative and the quantitative approaches is applied here that have explored the findings from the triangulation of survey, FGDs and KIIs. In the survey work, 400 respondents were interviewed that has covered almost all of the households of the Palsa village. The findings of the study demonstrate diverse forms of neoliberal impact in Palsa including changes in the agricultural sector, growing culture of consumerism, expanding microloan programs leading to the increasing role of women in society and introducing the non-agricultural sectors, entrepreneurial initiatives and greater use of newer and advanced technologies in both of agricultural and non-agricultural sectors. In addition, it also stresses on the emerging vulnerable and victim groups and what they go through in this taking-off of the neoliberal process. The study concludes that proper policy implementation is required to limit the backlashes of neoliberalism and to widen the benefits of it in society.

Keywords: Neoliberalism, Economic Transformation, Privatization, Rural Society.

-
1. MSS Research Student, Department of Sociology and Research Associate, Nazmul Karim Study Center, University of Dhaka, Bangladesh.
E-mail: sarafmou@gmail.com
 2. Professor of Sociology, University of Dhaka, Bangladesh.
E-mail: akmjamal@du.ac.bd

DOI: <https://www.doi.org/10.62272/JS.V14.A5>

1.0. Introduction

The phenomenon of neoliberalism has emerged as a dominant force worldwide in shaping societies and economies in the wake of globalization and economic liberalization (Larner, 2009). Its impact on rural areas, particularly in developing countries, has been a subject of growing concern and scholarly interest of researchers and academicians. Bangladesh, a nation characterized by its predominantly rural population, has witnessed profound changes in the social and economic field of its rural communities as a result of the introduction of neoliberal policies and agenda. The ideological strands of neoliberalism and neoliberal agenda have become powerful and market dominating components in most of the present societies elsewhere around the world. As a result, the policies emerged from the idea of neoliberalism encompass privatization, tax cut, liberalization of trade and commerce limiting the scopes in providing services of health, education and welfare sectors. This neoliberal policy and agenda have been undergoing multiple forms of critics, debate, crisis and resistance (Cahill et al. 2012). The outcomes of the sole neoliberal measures include – ‘removal of price supports, the entry of transnational corporations and the integration of domestic production into global trade’.³ Bangladesh being a part of the ‘Asiatic mode of production’⁴, it had a subsistence peasant-based economy, which is still partially evident in the rural regions. Misra (2017) argues that a huge number of peasants were displaced and dispossessed from their land and shifted their livelihood as agricultural laborers due to the Structural

-
3. Connell, R., & Dados, N. (2014), Where in the World Does Neoliberalism Come from? The Market Agenda in Southern Perspective. *Theory and Society*, 43(2), p.130 <http://www.jstor.org/stable/43694712>
 4. In the Asiatic Mode of Production, Marx (1973) argues: “(at least, predominantly) the individual has no property, but only possession; the real proprietor, proper, is the commune—hence property only as *communal property* in land... (p.484) The Asiatic form necessarily hangs on most tenaciously and for the longest time. This is due to its presupposition that the individual does not become independent *vis-à-vis* the commune; that there is a self-sustaining circle of production; unity of agriculture and manufactures, etc.” (p.486). For more details, please see, Karl Marx, *Grundrisse: Foundations of a Critique of Political Economy*, trans. M. Nicolaus, London: Penguin Books, 1939/1973, Pp. 484-486

Adjustment Programs (SAPs)⁵ and Structural Adjustment Facility (SAF)⁶ and some associated agrarian reform projects in the global south. In this context of neoliberal movement in Bangladesh society, this research paper broadly aims to explore the impact of neoliberalism and the economic transformation in the rural vicinity of Palsa village. More specifically, this paper is trying to understand the neoliberal agenda and initiatives to economic transformation in rural agriculture of Bangladesh society. In addition, finding the pattern of income inequality and disparity among the rural classes emerged from the introduction of neoliberal initiatives, for example, intervention of microcredit in Palsa village is also of greater interest of this research paper.

2.0. Literature Review and Theoretical Framework

2.1. Literature Review

Researchers and academicians in Bangladesh and elsewhere in South Asian countries have conducted many researches on the impact of neoliberal agenda in the process of socio-economic development in society. There are limited literatures and research findings found directly related to the impact of neoliberal economic initiatives on rural societies in Bangladesh context. Alam et al. (2023)⁷ argue that, with the massive expansion in the industrial and ICT sectors, Bangladesh is within an ongoing process of shifting from the agrarian economy to a manufacture-based economy throughout the last two decades and, in addition, the raw material's availability, digital revolution and the local market capacity for coping up with the growth of economic activities led to the potential atmosphere for innovation and entrepreneurship. Iqbal et al. (2021)⁸

-
5. SAPs (Structural Adjustment Programs) are defined as some sets of macroeconomic policies, advocated by the World Bank (WB) and the International Monetary Fund (IMF), in which the states have to stick to these programs to be accessible to the loans provided by this program lending windows. For more details, please go through: Bracking, S. (2018). Structural Adjustment Policies. *The International Encyclopedia of Anthropology*, 1-9.
 6. SAF (Structural Adjustment Facility) is one kind of adjustment programs, introduced by the IMF in 1987, under which IMF allows low-interest loans to the developing and underdeveloped states. For more details, please visit the link: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/esaf/exr/>
 7. Quamrul Alam, Rizwan Khair and Asif M Shahid ed. (2023), State, Market and Society in an Emerging Economy: Development and the Political Economy of Bangladesh. First Edition, London: Routledge.
 8. Iqbal, K., Pabon, M. N. F., & Ibon, M. W. F. (2023). Examining Rural Income and Employment in Bangladesh: A Case of Structural Changes in the Rural Nonfarm Sector in A Developing Country. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*.

show that the proportion of Rural Non-Farm (RNF)⁹ in the total rural income over the years of 2000-2016 has noteworthy increased, which is basically the result of high nonfarm wage income of the solvent households. Here, it is also found that the increase in educational level of the people leads to higher tendency of shifting from agriculture to RNF sector. Misra (2017)¹⁰ presents a paradoxical view about neoliberalism stating that the neoliberal agrarian reform policies have polarized the peasant classes and simultaneously, while advocating a market-based economy in Bangladesh, delayed the extinction of the small peasant group. On the contrary, when critically viewed based on Marxism as argued by Faruque¹¹ (2018) in the Phulbari context - the state, the mining company and the western donor agencies through imposing power represent the movement from above with the neoliberal economic policy, and the locals and national activists represent the movement from below. Consequently, the situation waged political battle against the neoliberal growth. Ferdousi & Munim¹² (2023) argues that despite agriculture being the largest employment source in Bangladesh, the nonfarm activities are contributing more than before to rural income sources. In this regard,

-
- 9. The RNF (Rural Non-Farm) sector is defined as a heterogenous concept, representing anything except for agriculture, where it covers a wide range of economic activities from low productive and income generative and low technology to large scale commerce. For more details, please visit: Varma, S., & Kumar, P. (1996). Rural Non-farm Employment in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies*, 24(3/4), 75–102.
<http://www.jstor.org/stable/40795559>
 - 10. Assistant Professor, Department of UPEACE, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea. E-mail: manoj.dhk@gmail.com
5-month-long ethnographic research conducted in three Bangladeshi villages in early 2012. The three villages are located in Patuakhali, Pabna and Panchagarh districts.
 - 11. Scientific Officer (Livestock Division) at Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition (BIRTAN). Department of Sociology, University of Toronto, Canada. E-mail: o.faruque@mail.utoronto.ca
Related publications by the author: Faruque, M. O. (2017). Neoliberal resource governance and counter-hegemonic social movement in Bangladesh. *Social Movement Studies*, 16(2), 254-259.
 - 12. B Ferdousi, KMA Munim (2023). Transformation of Rural Bangladesh: Land, Labor, Credit and Agriculture, a book chapter in Quamrul Alam, Rizwan Khair and Asif M Shahin (2023) edited *State, Market and Society in an Emerging Economy: Development and the Political Economy of Bangladesh*. First Edition, London: Routledge.
Benuka Ferdousi, Senior Research Fellow, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BISS), E-mail: benuka@biiss.org, Khandaker M. A. Munim, Professor, Department of Economics, Jahangirnagar University. E-mail: munim@juniv.edu

changes like rental choice, agro-based technology and crop choice have taken place. The emergence and expansion of the micro-finance institutes is also visible in the rural credit market. Uddin¹³ (2021) explores the dynamics of formal and informal credit market including sources of the loan, recovery rate, collateral condition, reasons of non-repayment and the size and purpose of the loans in rural Bangladesh context. Keating et al.¹⁴ (2010) argue that microcredit programs - the by-product of neoliberalism do not seem to have much of an impact on boosting women's social, economic, and political agency to a point where it might be useful for enhancing intra-household gender relations and elevating their position in the neighborhood and in society at large. Instead, as argued by Al-Amin¹⁵ (2017), the stress of repayment has caused the blissful marriage to deteriorate into tense relationships. Uddin¹⁶ (2015) argued that the profit or failure of the borrowers is not something that microcredit NGOs are keen to take ownership of. Shamit¹⁷ (2016) takes a critical stance toward the notion and that through the neoliberal

-
- 13. Md Main Uddin (2021), State of Formal and Informal Credit Markets in Rural Bangladesh, a book chapter in Quamrul Alam, Atiur Rahman and Shibli Rubayat Ul Islam (2021) edited *The Economic Development of Bangladesh in the Asian Century: Prospects and Perspectives*, London: Routledge
Md Main Uddin, Professor, Department of Banking and Insurance, University of Dhaka. E-mail: mainuddin@du.ac.bd, Quamrul Alam, renowned development thinker, Professor, International Business and Strategy, Central Queensland University, Melbourne campus, Australia. Atiur Rahman, renowned development economist, Supernumerary Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka. E-mail: dratiur@gmail.com , Shibli Rubayat Ul Islam, Chairman, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSE). Professor, Department of Banking and Insurance, University of Dhaka. E-mail: shibli@du.ac.bd
 - 14. Christine Keating, Claire Rasmussen, and Pooja Rishi (2010). Keating, C., Rasmussen, C., & Rishi, P. (2010). The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 36(1), 153-176. Christine Keating, Professor, Department of Women's Studies, Ohio State University. Claire Rasmussen, Associate Professor, Departments of Political Science and Women's Studies, University of Delaware. E-mail: cerasmus@udel.edu, Pooja Rishi, Department of Political Science, Chatham University, Pennsylvania. Social Sciences Department Chair. E-mail: drossbach@chatham.edu
 - 15. PhD Researcher in Sociology and Methodology of Social Research, University of Milan & University of Turin, 29th Cycle, Academic Year: 2016-17.
 - 16. Graduate in 2018, Bachelor's degree in Social Cultural Anthropology and Sociology, *University of Toronto*, Canada.
 - 17. Professor of Sociology at Shahjalal University of Science & Technology, Sylhet, Bangladesh. E-mail: mjauddin@yahoo.com, mjauddin-soc@sust.edu

microcredit operations, Grameen Bank promotes a Western neoliberal agenda and supports corporate capitalist interests while appearing to be aiding the poor. Despite Grameen Bank's claims that it empowers poor women, it is clear that their microcredit programs primarily serve to make poor Bangladeshi women debt slaves, and their social business alliances with large corporations are merely money-making schemes designed to take advantage of defenseless women in rural Bangladesh. Therefore, Ahmed¹⁸ (2021) compares between Islamic zakat and the neoliberal microfinance methods and ended up concluding that the Islamic practice of zakat is more effective than the neoliberal approach of interest-based microfinance in reducing poverty and ensuring social welfare in Bangladesh. Nuruzzaman¹⁹ (2004) reveals that the neoliberal reform plans in Bangladesh mostly ignore other socioeconomic groups and classes including the industrial and agricultural workforce, small companies, marginal and small farmers, and the urban and rural poor. The absence of policies for equitable distribution of wealth has led to growing income and wealth gaps between the low and wealthy strata of society and a worsening of the nation's overall poverty status. Here, it is also found by Chowdhury et al.²⁰ (2019) that the BRDB (Bangladesh Rural Development Board) methods also do not favor the poor, and those who are less fortunate cannot afford transaction costs, provide volunteer services, or compete with those who are better situated. Under the neoliberal mechanisms, as Adnan²¹ (2016) argues, the incidences like land alienation and primitive accumulation may directly or indirectly be associated in the use of force in which several forms of tactics together are also incorporated. Husain²² (2022) demonstrates how the executed

-
- 18. Supernumerary Professor, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh. E-mail: muahmed@du.ac.bd
 - 19. Professor, North South University, Dhaka.
E-mail: mohammed.nuruzzaman01@northsouth.edu
 - 20. Mohammad Shahjahan Chowdhury, Faisal Ahmmmed, and Md. Ismail Hossain (2019). Neoliberal Governmentality, Public Microfinance and Poverty in Bangladesh: Who Are the Actual Beneficiaries. *International Journal of Rural Management*, 15(1), 23-48.
Mohammad Shahjahan Chowdhury, Department is Public Administration, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh. E-mail: shahjahansust.chowdhury@gmail.com , Faisal Ahmmmed, Department of Social Work, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh. E-mail: dr.faisal_ahmmmed@yahoo.com , Md. Ismail Hossain, Department of Social Work, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh, E-mail: ismailscw@yahoo.com
 - 21. Professorial Research Associate, Department of Development Studies, SOAS University of London. E-mail: sa159@soas.ac.uk
 - 22. Postdoctoral Fellow | PI: V. Firat Bozcali Anthropology, University of Toronto, Canada. E-mail: mustahid.husain@utoronto.ca

neoliberal policies increase socioeconomic disparity and external dependency of the nation. The capitalist and non-capitalist causes that intensify the production and persistence of poverty in modern Bangladesh is also responsible in promoting inequality in society. However, none of the literatures presented above does focus on the neoliberal impact on the overall economic transformation in rural Bangladesh society. Hence, the present study aims to work on that gap including economic practices, shift from agriculture to non-agriculture, microcredit involvement and the increasing disparity within the specified zone of Palsa village.

2.2. Theoretical Framework

Theoretically neoliberalism is primarily a concept of political economy. It is also, and somewhat more broadly, a principle of civilization that affects billions of lives around the globe in a variety of domains, including economics, politics, international relations, ideology, culture, and so forth. Neoliberalism is seen as a period in history that has been referred to as the ‘age of neoliberalism’ (SaadFilho & Johnston, 2005, p.1)²³. The proper definition of the term ‘neoliberalism’ is highly diffusive, and it often functions as a ‘rhetorical trope’, where the core meaning is already familiar to those interested in this concept. Lack of sufficient theorization on neoliberalism leads to confusion and uncertainty over three issues: 1) what is the proper starting point of investigation; 2) what is the proper unit of analysis; and 3) how do we measure its consequences (O'Connor, 2010). Number of mainstream scholars of neoliberalism, have proposed in three distinct directions taking neoliberalism as – a) Ideology, b) Policy, and c) Governance (Larner 2000).

The intellectual contribution of David Harvey²⁴ in his *A Brief History of Neoliberalism* explains neoliberalism to be ‘multiple determinations’ (Larner, 2006). He argues that neoliberal theory demonstrates that free markets and trade can be the best solution to the eradication of national

-
23. Saad-Filho, A., & Johnston, D. (2005). *Neoliberalism a critical reader*.
 Alfredo Saad-Filho, renowned economist, Professor of Political Economy and International Development at King's College London. E-mail: alfredo.saad-filho@kcl.ac.uk
 Deborah Johnston, economist, Former Deputy Vice-Chancellor (Academic Framework), London South Bank University.
 John O'Connor, Associate Professor in Sociology, Central Connecticut State University, USA.
 E-mail: oconnorjohn@ccsu.edu
24. British geographer, author of “A Brief History of Neoliberalism” (2005), “The New Imperialism” (2003), “The Urbanization of Capital” (1985) and so on.

and global forms of poverty. It also encourages entrepreneurial initiatives. According to David Harvey:

"Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of money. It must also set up those military, defence, police and legal structures and functions required to secure private property rights and to guarantee, by force if need be, the proper functioning of markets." (2005, p.2)

The most important arguments of the spirit of neoliberalism could be categorized into two distinct groups. The first category of almost with similar kind of arguments are presented in Harvey's famous writing *A Brief History of Neoliberalism* (2005), Barry Smart's *Economy, Culture and Society: A Sociological Critique of Neo-liberalism* (2003), Joseph Stiglitz's *Globalization and Its Discontents* (2002), Naomi Klein's *The Shock Doctrine* (2007), and in many other literatures. The second category of arguments demonstrates the economic mechanisms mainly focusing on the model of capitalism. This approach treats neoliberalism centrally as a system of ideas, amounting to a shift in the dominant ideology of capitalist society, 'the ruling ideas of the time':

"In this narrative, neoliberal doctrine sprang from a group of right-wing economists in Europe and the United States in the 1940s, 50s, and 60s, notably Friedrich Hayek and Milton Friedman. This group rejected Keynesian economics and the welfare state, seeing state economic intervention as "the road to serfdom" (in Hayek's famous phrase), and argued for free markets as the basis of decision-making in every sphere. Gradually spread via the Mont Pelerin Society, the Chicago school of economics, and corporate-funded foundations in the USA, their ideas moved from margin to center when picked up by Thatcher and Reagan as a new agenda for populist right-wing politics, and by Volker, at the US Federal Reserve, as a guide to economic policy. Thatcher led the attack on the bloated welfare state, Reagan the attack on progressive taxation" (Harvey 2005, p. 36).

In several developing countries, one of the strongest and evident institutional obstacles to economic and social well-being and development is the absence of pure private property rights. Over-exploitations on social common assets can be prevented through private ownerships on those. The theory also stresses on the market competitions where the ground rules are properly monitored and on the removal of the barriers to

the free capital movement. Here, state role and sovereignty are compromised. Neoliberal theorists propose the rule by elites and experts instead of government. It is so because, in democracy, the rule by a majority group can be a threat to the individuals' rights and freedom of choices. Yet, the neoliberals suggest some institutions, like "central bank, from democratic pressures." (Harvey, 2005). In Bangladesh, the banks, NGOs, and microcredit organizations resemble those. Harvey (2005) also talks about several controversial ground of neoliberalism. He added, in market competitions, the stronger firms defeat and drive away the weaker ones which can, very often, result in oligopoly and monopoly. Problems also become evident when private firms and owners dump their accountability outside the market arena so that they can go without compensating the damages they are responsible for, such as environmental damages and destruction of the ecosystem with industrial wastages.

According to some other group of scholars, neoliberalism is a modern and upgraded version of capitalism. Neoliberalism being a very late concept, Karl Marx never mentioned about it in his intellectual writings. Yet, some convergent and divergent tendencies between neoliberalism and capitalism is found by the Marxist and neo-Marxist groups. Nadimuddin (2021) combined neoliberalism and Marx's argument about capitalism. There he argued that capital mobility has become possible with the neoliberal advancement as the state plays a de-regularized role. That's why, investors invest on the territories of cheap labor cost and extract huge amount of profit. Surplus exploitation is still evident in those cases. The gross income in society has increased and so has the income disparity among social classes. Accumulation by dispossession is compulsorily evident in neoliberalism. Economic elites and the powerful group have a tendency to hold power on the wealth and resources depriving of the less powerful and the marginal groups. The neoliberal context, in general, associates the components of public resources through the expression of individual goods and property as a 'civic responsibility'. The trend initiates, shapes and perpetuates the entrepreneurial tendency among individual (Pollack & Rossiter, 2010).

The Keynesian consensus about reflation/ monetary deflation collapsed during the 1974-82 economic recession. At that point, state authorities stressed on the evident and rigid economic factors and loopholes in market. That economic fall basically led to ideological shifts in several western countries and reversal of economic priorities. In restructuring the ground for profit,

"…the political strategy of neo liberalism aimed to re-establish capital's structural and relational power vis -a- vis labor. Neoliberalism intended to reorder the political economy of post-

war capitalism – modifying its existing class relations, its organizing structures, and its institutions of accumulation.” (O’Connor, 2010)

Also, the financial market created by the neoliberal policies, as it was supposed to solve the problem of poverty, benefits the wealthy rather than the disadvantaged (Beckert, 2019).

Neoliberalism is not merely a state policy paradigm or a corporate resource portfolio, rather a trend in the institutionalized organizations of power, and also consists in the simple lack of categories with which to include the alternations between dominant mainstream and critical frameworks. The state theory literature has failed to sufficiently theorize the role of institutional capacities in determining state autonomy and the mode of differentiation of public and private power. Its inadequate theorization of institutions has led to an impoverished view of relative autonomy, whereby a state defined relatively abstractly intervenes into an external ‘economic sphere’ seen as a closed system governed by a fixed ‘logic of capital’ (Maher & Aquanno, 2018).

Means of Production

The very first step toward the neoliberal restructuring of the capitalist system was the reconstruction of class relations. The class system was restored in a balanced way to re-ensure the domination by and profitability for the elites. This structural restoration was evident in the production system as well as in the surplus distribution (O’Connor, 2010). The term ‘Means of Production’ can simply refer to the must needed assets and resources economic production. Murthy (2013) explores the economic shift in the neoliberal Indian sphere and argued about the diminishing process of the subsistence peasantry and rise of the small and marginal farmers. The predominant shift from agriculture to non-agriculture makes the rural small peasants migrate to urbans. The landed farmers are moving towards non-agricultural activities, and so they hand over or lease those pieces of land to the rising marginal farmers. And the notable point is that the same marginal farmers are using those lands for the commercial agriculture and production for the market, not anymore for their subsistence. Murthy (2013) concludes that in spite of several possible crises, this group is growing on.

Forces of Production

One of the key components of historical materialism is the concept of the “forces of production.” The forces of production refer to the technological and material means and abilities that humans use to produce the goods and services needed for their survival and well-being.

These forces of production include technology, materials and resources management, organization and “industrial automation” (Noble, 2017). Neoliberalism often emphasizes technological innovation and market-driven solutions. The forces of production in this context are driven by advancements in information technology, automation, and global supply chains. These changes can lead to increased productivity and efficiency. It is said, “Neoliberalism with a small 'n' is a technology of governing 'free subjects' that co-exists with other political rationalities.” (Ong, 2007).

Relation of Production

In historical materialism, a key concept developed by Karl Marx and Friedrich Engels, the ‘relations of production’ refers to the social and economic relationships that people enter into during the process of producing and exchanging goods and services. Neoliberalism tends to reinforce and intensify the concentration of ownership and control in the hands of a relatively small economic elite. Private corporations and wealthy individuals exert significant control over the means of production and economic decision-making. This concentration of ownership and control is a defining feature of the relations of production in a neoliberal society.

3.0. Methodology

The chosen methodology for this present study is a mixed method or triangulation combining the approaches of quantitative and qualitative one. In order to collect primary data from the study area, three data collection methods were involved – survey, FGDs (Focus Group Discussions) and KIIs (Key Informant Interviews). Survey is taken as the method for quantitative data collection. Survey interviews are conducted via going to households of the respondents. A structured questionnaire is applied to conduct this survey. And for qualitative approaches, FGD and KII are taken as the data collection techniques. Thematic analysis was used for the analysis of the qualitative data. The location of the research for both qualitative and quantitative approaches is Palsa village in Chapainawabganj district. Households in this area are considered to be the population of this study. In this study, purposive sampling from different occupational groups is used for data collection. First of all, different strata based on occupations have been drawn from homogenous subsets that include farmers, rickshaw pullers, government and private employees, businessmen, SME stakes, teachers, students, homemakers, laborers and so on. After that, respondents from each gender- male and female- was tried to pick up for the interview. The sample size was 400.

Table 1: Sampling

Category	Gender		
	Male	Female	Total
Farmers/Peasants	40	04	44
Businessman & SME	20	20	40
Day Laborer & Rickshaw Puller	44	-	44
Teacher	20	20	40
Shopkeepers	24	08	32
Govt/ Private Employee	32	12	44
Landlords	20	08	28
Houseworkers	-	40	40
Students	40	40	80
Others	04	04	08
Total	244	156	400

For the qualitative purpose, the same sample frame was used as like as the quantitative one. 4 FGDs were conducted, each one consists of 8 participants from representing diverse occupational categories along with gender constituents. For KII, 3 males and 3 females were interviewed individually throughout the process. FGD toolkit and KII interview schedule were used to complete this qualitative part of this study. SPSS program is used to complete data analysis and data presentation process.

4.0. Findings of the Study

4.1. General Socio-demographic Characteristics

The following table-2 of the findings illustrate the percentage and frequency (n) of the survey participants for each demographic category in which male and female are 65% and 35% respectively. Most of the respondents are falling in the age group of 18-25, 26-35 and 36-45 years that cover 22%, 32.5% and 27.5% respectively. In the educational qualifications category, 15.8%, 19%, 12.3%, 18.5% and 17.3% of the respondents belong to ‘no formal education’, PEC, SSC, HSC and graduate groups respectively. More than 80% participants have formal education ranging from PEC to post graduation level.

Table 2: Distribution of the Socio-demographic Variables of the Participants

Characteristics	Variables	Percentage
Gender	Male	61.0 (n= 244)
	Female	39.0 (n= 156)
Age Group	Below 18	3.0 (n= 12)
	18-25	22.0 (n= 88)
	26-35	32.0 (n= 128)
	36-45	28.0 (n= 112)
	46-55	11.0 (n= 44)
	56-65	3.0 (n= 12)
	Above 65	1.0 (n= 04)
Educational Qualification	No Formal Edu.	14.0 (n= 56)
	PEC	17.0 (n= 68)
	JSC	9.0 (n= 36)
	SSC	13.0 (n= 52)
	HSC	19(n= 76)
	Undergraduate	5.0 (n= 20)
	Graduate	18.0 (n= 72)
	Postgraduate	5.0 (n= 20)
Occupational Group	Student	20.0 (n= 80)
	Farmer	4.0 (n= 16)
	Fisherman	3.0 (n= 12)
	Teacher	10.0 (n= 40)
	Agri. Worker	4.0 (n= 16)
	Govt Official	2.0 (n= 08)
	Pvt. Employee	9.0 (n= 36)
	Businessman	4.0 (n= 16)
	Day Laborer	5.0 (n= 20)
	Housework	10.0 (n= 40)
	Rickshaw Puller	6.0 (n= 24)
	SME	6.0 (n= 24)
	Shopkeeper	8.0 (n= 32)
	Landlords	7.0 (n= 28)
	Others	2.0 (n= 08)
Income Level (monthly)	0-5000	28.0 (n= 112)
	5001-10,000	26.0 (n= 104)
	10,001-15,000	22.0 (n= 88)
	15,001-20,000	7.0 (n= 28)
	20,001-30,000	8.0 (n= 32)
	Above 30,000	9.0 (n= 36)

4.2. Villagers' Views on Neoliberal Economic Transformation in Palsa

Table 3: Villagers' Views and Experiences on Neoliberal Agenda

Villager's Socio-demographic Characteristics		Satisfaction Level with Occupation				Change in Food habit	
		Highly Satisfied (%)	Satisfied (%)	Moderate (%)	Unsatisfied (%)	Yes (%)	No (%)
Educational Qualification	No Formal Edu.	1 (n=4)	4 (n=16)	7 (n=28)	2 (n=8)	10 (n=40)	4 (n=16)
	PEC	1 (n=4)	8 (n=32)	2 (n=8)	6 (n=24)	11 (n=44)	6 (n=24)
	JSC	1 (n=4)	4 (n=16)	4 (n=16)	0 (n=0)	7 (n=28)	2 (n=8)
	SSC	2 (n=8)	10 (n=40)	1 (n=4)	0 (n=0)	6 (n=24)	7 (n=28)
	HSC	1 (n=4)	8 (n=32)	5 (n=20)	5 (n=20)	16 (n=64)	3 (n=12)
	Undergraduate	1 (n=4)	3 (n=12)	1 (n=4)	0 (n=0)	2 (n=8)	3 (n=12)
	Graduate	0 (n=0)	11 (n=44)	6 (n=24)	1 (n=4)	6 (n=24)	12 (n=48)
	Postgraduate	1 (n=4)	4 (n=16)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	2 (n=8)
	Total	8 (n=32)	52 (n=208)	26 (n=104)	14 (n=56)	61 (n=244)	39 (n=156)
Occupation	Student	0 (n=0)	8 (n=32)	7 (n=28)	5 (n=20)	15 (n=60)	5 (n=20)
	Farmer	0 (n=0)	2 (n=8)	2 (n=8)	0 (n=0)	3 (n=12)	1 (n=4)
	Fisherman	0 (n=0)	2 (n=8)	1 (n=4)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)
	Teacher	0 (n=0)	8 (n=32)	2 (n=8)	0 (n=0)	5 (n=20)	5 (n=20)
	Agricult. Worker	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0)	2 (n=8)	2 (n=8)	2 (n=8)
	Govt Official	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)
	Private Employee	1 (n=4)	4 (n=16)	2 (n=8)	2 (n=8)	4 (n=16)	5 (n=20)
	Businessman	2 (n=8)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	3 (n=12)
	Day Laborer	0 (n=0)	2 (n=8)	2 (n=8)	1 (n=4)	3 (n=12)	2 (n=8)
	Housework	1 (n=4)	7 (n=28)	2 (n=8)	0 (n=0)	5 (n=20)	5 (n=20)
	Rickshaw Puller	0 (n=0)	1 (n=4)	3 (n=12)	2 (n=8)	6 (n=24)	0 (n=0)
	SME	1 (n=4)	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	3 (n=12)
	Shopkeeper	1 (n=4)	3 (n=12)	4 (n=16)	0 (n=0)	5 (n=20)	3 (n=12)
	Landlords	0 (n=0)	5 (n=20)	1 (n=4)	1 (n=4)	3 (n=12)	4 (n=16)
	Others	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	1 (n=4)	2 (n=8)	0 (n=0)
	Total	8 (n=32)	52 (n=208)	26 (n=104)	14 (n=56)	61 (n=244)	39 (n=156)
Income Level (Monthly)	0-5000	0 (n=0)	14 (n=56)	10 (n=40)	4 (n=16)	20 (n=80)	8 (n=32)
	5001-10,000	1 (n=4)	12 (n=48)	9 (n=36)	4 (n=16)	18 (n=72)	8 (n=32)
	10,001-15,000	2 (n=8)	10 (n=40)	5 (n=20)	5 (n=20)	11 (n=44)	11 (n=44)
	15,001-20,000	1 (n=4)	6 (n=24)	0 (n=0)	0 (n=0)	6 (n=24)	1 (n=4)
	20,001-30,000	0 (n=0)	5 (n=20)	7 (n=28)	1 (n=4)	1 (n=4)	7 (n=28)
	Above 30,000	4 (n=16)	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)	4 (n=16)
	Total	8 (n=32)	52 (n=208)	26 (n=104)	14 (n=56)	61 (n=244)	39 (n=156)

Survey participants of the Palsa village were examined to understand their progress and level of satisfaction on different neoliberal agenda

including their present occupational status and changing food habit pattern that are displayed in the following table 3 in terms of their principal socio-demographic characteristics. Being a rural vicinity, Palsa is dominantly an agriculture-based economy. Among the survey households from diverse socio-demographic characteristics, 60% (n=240) reveal their satisfaction and high satisfaction with their present occupational status which are mostly agriculture based – be it directly or indirectly. And similarly, 61% (n=244) of the respondents express their desire to bring changes in their food habit in which they wish for a better one.

4.2.1. Satisfaction with Occupation

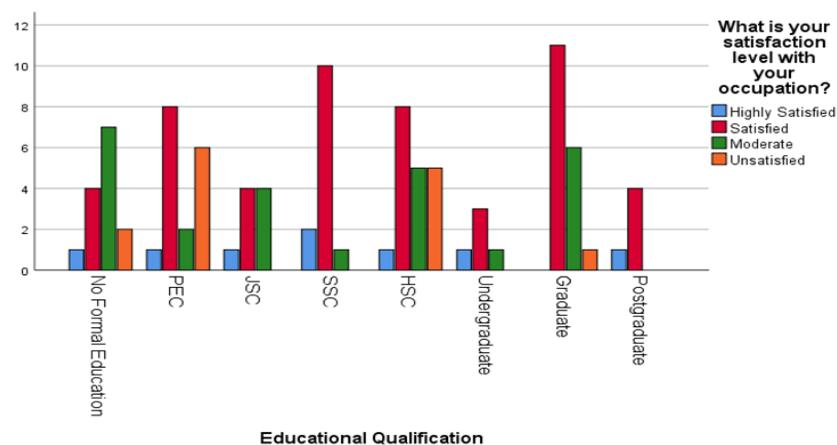
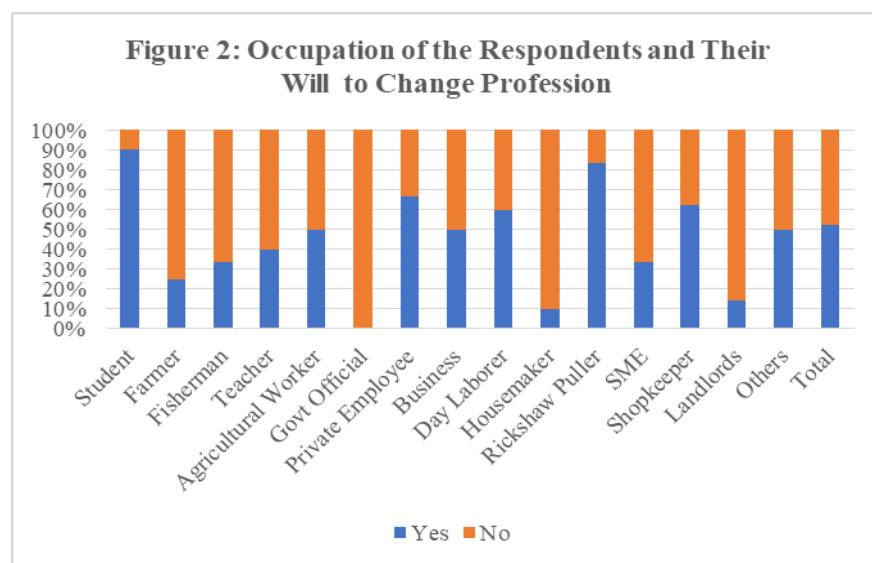


Figure 1: Satisfaction with the Occupation in terms of Diverse Educational Groups

The figure 1 shows the satisfaction level (in %) of 400 respondents, of diverse educational groups, with their present occupation. Here, the graduates (11%, n=44) are more likely to be satisfied with their jobs followed by SSC passed job holders (10%, n=40). They are more likely to engage in prestigious and dignified jobs like teaching, govt officers, private or corporate jobs and so on which is a great sign of the taking-off stage of the neoliberal agenda in Palsa village. Contrarily, the others educational groups are found to be void satisfaction in their present work status. The qualitative approach of FGDs and KII also demonstrate the similar outcomes in this regard which provide a key information that comparatively less educated and low paid job holders are unable to cope up with the increasing expenses of their households with their present income level.

4.2.2. Changing Trend of Occupation

Figure 2 below demonstrates the changing nature of occupational status of the people of Palsa village. It is found that among the students, 90% (n=72) are mostly tending to shift to an economically sound occupation. None of the government officials (0%, n=0) is willing to change their occupation. In the qualitative findings, that are extracted from the FGDs, the government officials reveal their utmost satisfaction about their salary, job security and occasional incentives. Those who are not satisfied with their present occupation and want to change their occupations have expressed some reasons; such as low profit or lower pay scale, lack of work security, unwillingness to work and so on. There are also some occupational groups who are not willing to change their occupation, even if they are not satisfied with it like farmers (75%, n=12). One of the FGDs participant argues, "My ancestors had worked on this field selflessly. They never gave up. So why should I?"²⁵



4.3. Neoliberal Agenda and Economic Activities in Palsa Village

Neoliberal economic activities in Palsa village are presented in the following table 4. Responses of the research population regarding the changes in economic activities and microloan involvement are organized in terms of their socio-demographic characteristics.

25. FGD Group 02, Participant No. 4, Name: Abu Hasnat, Age: 49, Date of Interview: 25 July, 2024

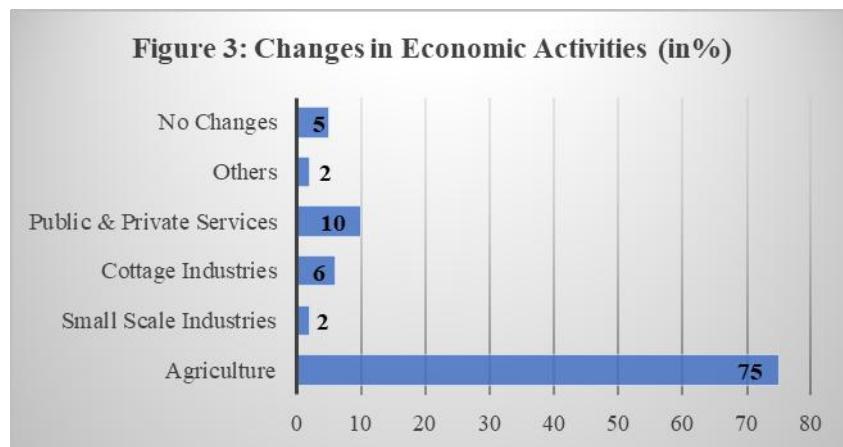
Table 4: Changes in Economic Activities in Palsa Village

Villager's Socio-demographic Characteristics	Changes in Economic Activities						Micro-loan	
	Agriculture (%)	Small Scale Industries (%)	Cottage Industries (%)	Public and Private Services (%)	Others (%)	No Change (%)	Yes (%)	No (%)
Educational Qualification	No Formal Edu.	13 (n=52)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	14 (n=56)	0 (n=0)
	PEC	13 (n=52)	1 (n=4)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	2 (n=8)	17 (n=68)
	JSC	6 (n=24)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	9 (n=36)	0 (n=0)
	SSC	12 (n=48)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	12 (n=48)	1 (n=4)
	HSC	12 (n=48)	0 (n=0)	3 (n=12)	2 (n=8)	0 (n=0)	14 (n=56)	5 (n=20)
	Undergraduate	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	4 (n=16)
	Graduate	13 (n=52)	0 (n=0)	0 (n=0)	4 (n=16)	1 (n=4)	0 (n=0)	15 (n=60)
	Postgraduate	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)
Total		75 (n=300)	2 (n=8)	6 (n=24)	10 (n=40)	2 (n=8)	5 (n=20)	90 (n=360)
Occupation	Student	11 (n=44)	0 (n=0)	2 (n=8)	5 (n=20)	0 (n=0)	2 (n=8)	14 (n=56)
	Farmer	4 (n=16)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	4 (n=16)	0 (n=0)
	Fisherman	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)
	Teacher	6 (n=24)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	2 (n=8)	0 (n=0)	9 (n=36)
	Agricult. Worker	4 (n=16)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	4 (n=16)	0 (n=0)
	Govt Official	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0)
	Private Employee	7 (n=28)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	7 (n=28)
	Businessman	4 (n=16)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	1 (n=4)
	Day Laborer	4 (n=16)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)	0 (n=0)
	Housework	8 (n=32)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	10 (n=40)
	Rickshaw Puller	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	6 (n=24)
	SME	5 (n=20)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	6 (n=24)
	Shopkeeper	6 (n=24)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	1 (n=4)	8 (n=32)
	Landlords	4 (n=16)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	7 (n=28)
	Others	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)
Total		75 (n=300)	2 (n=8)	6 (n=24)	10 (n=40)	2 (n=8)	5 (n=20)	90 (n=360)
Income Level (Monthly)	0-5000	18 (n=72)	0 (n=0)	3 (n=12)	4 (n=16)	0 (n=0)	3 (n=12)	25 (n=100)
	5001-10,000	23 (n=92)	1 (n=4)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	25 (n=100)
	10,001-15,000	14 (n=56)	1 (n=4)	2 (n=8)	3 (n=12)	0 (n=0)	2 (n=8)	20 (n=80)
	15,001-20,000	3 (n=12)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	2 (n=8)	0 (n=0)	7 (n=28)
	20,001-30,000	8 (n=32)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)
	Above 30,000	9 (n=36)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	8 (n=32)	1 (n=4)
Total		75 (n=300)	2 (n=8)	6 (n=24)	10 (n=40)	2 (n=8)	5 (n=20)	90 (n=360)
Total		75 (n=40)						

4.3.1. Noticeable Changes in Economic Activities

Among all the survey participants, 75% (n=300) see agricultural sector to undergo more changes than that of the others sectors (Figure 3 below). Being the economy in Palsa mainly agriculture based, this is the field of changes with the introduction of new technologies in the process of

cultivation, harvesting and marketing of the agricultural products noticed by most of the survey participants, which is also supported by the FGDs and KIIs data.



The small-scale industry (2%, n=8) is the least acclaimed economic activity group to change within recent times. In the FGDs, it is found that the lower visibility of changes among the groups including small-scale and cottage industry, public & private sectors and others are the result of their limited range of movement in the rural area. According to the FGDs findings, mango trees and farms are not only growing fruits for families and community but also most of those are given on lease to juice companies like Pran, Acme, Frooto and so on so that they can get a competitive price of the fruits and products. This change was not noticeable by the majority of the research population even 20 years ago in this connection. One of the FGD participant owning trees has expressed his view in following way:

“We keep 2-3 mango trees for ourselves and give the other 13 trees on lease. This now bring us a handsome amount of seasonal income. We did not have such idea even 10 years ago.”²⁶

The similar scenario is visible in some of the existing lichi gardens as well. Putting trees on lease and contracts are more profitable and growing and selling fruits in the market on own is now more evident than that of years/decade before, according to a FGD participant.

4.3.2. Microloan

Among the total 400 research population, a greater number of participants (90%, n=360) are found to take any kind of microloan or

26. Tasem Ali, Survey interviewee no. 27, Gender: Male, Age: 36-45 years, Occupation: Farmer, Date of Interview: 20 July, 2023

microcredit now as well as in the past from NGOs or other microcredit organizations (Table 4). The rest 10% (n=40) have responded as the non-receivers of microloans.

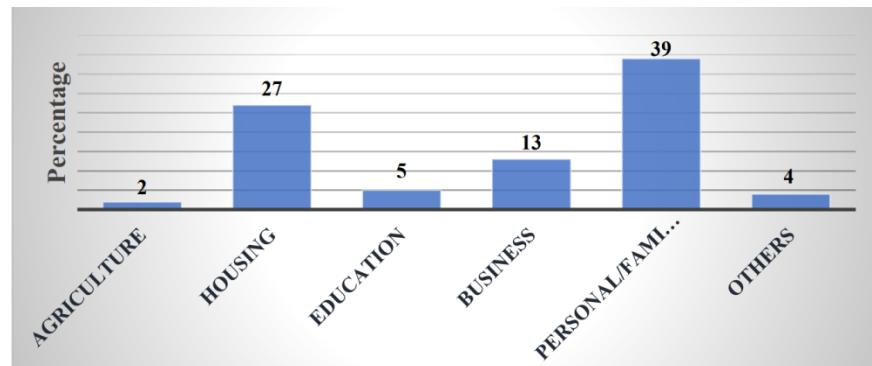
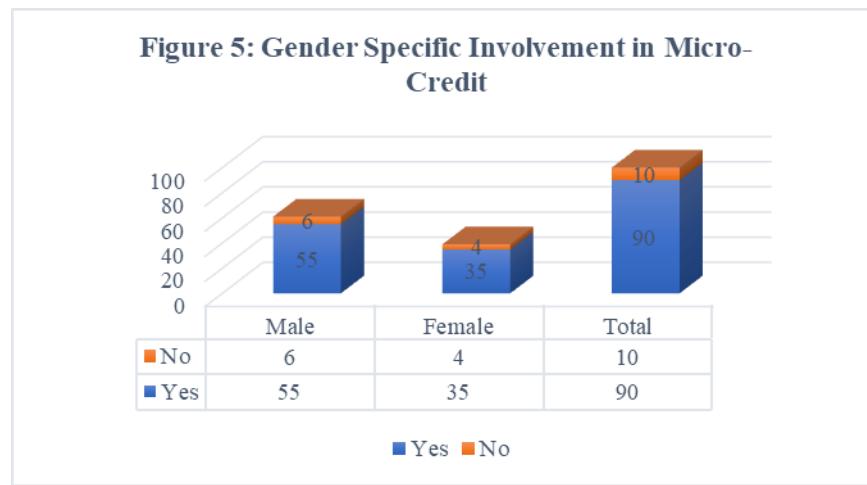


Figure 4: Purpose of Micro-Loan

Among the 90% (n=360) microloan receivers, 39% (n=156) were found to spend the credit for personal and familial need followed by housing (27%, n=108), business (13%, n=52) and education (5%, n=20) (Figure 4). The figure 5 below sketches the gender specific microloan recipients where 35% (n=140) are female and the rest are male (55%, n=220).



In FGD 3, the participants inform that although the number of female loan recipient is quite large, there are mostly a male benefiting hidden agenda behind the female money borrowers. They very often borrow and take microloan for the sake of their families, husbands' business and many other household purposes. Women borrowers, in this regard, barely know the whereabouts of the expenditure and the sources of installments while paying the loans. It is also an important finding that the loan-

recipients with middle- or low-income level are used to fall in the loop of installments. It keeps coming to them every week for each of the loan installment. The recovery of the installment is often very crucial, especially during the Covid-19 lockdown time. Humiliation and threats from the recovery agents of the NGOs make the borrowers more vulnerable.

4.3.3. Entrepreneurship

According to the survey findings (Figure 6 below), almost all of the participants (99%, n=396) have noticed the recent trend of entrepreneurship in Palsa and have claimed noteworthy entrepreneurial initiatives lately.

In the past, a sense of community belonging was present on any natural resource they have in the rural area. But, as mentioned earlier, land and trees are now under private and individual ownership. Those are now commoditized which has widened the way for individual entrepreneurship initiatives in the sectors of agricultural farming and fisheries. Similar trend is noticed in SMEs like homemade food and snacks, designed quilts & blankets, online clothing shop and many more initiatives. FGDs and KIIs have observed the technological developments like android, internet, social media etc. that contributes to expediting these initiatives, while privatization and commodification of goods have made capital for the natives leading to the creation of further economic activities. In this connection, the views of a FGD participant named Md. Munsur Uddin is worth mentioning:

“My father had two mango trees and a neem tree. I sold the neem tree to wood dealers and opened up a computer coaching. This flaunts my passion and brings earnings,”²⁷

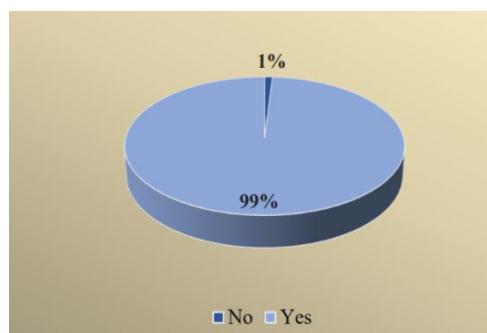


Figure 6: Notable Trend in Entrepreneurship

4.4. Vulnerability and Disparity Caused by Neoliberal Initiatives

Neoliberal initiatives in the process of social and economic transformation have been changing the rural vicinity of Palsa since the ending decade of the last century. This socio-economic change, no doubt, has led to enormous progress and development of individuals,

27. Md. Munsur Uddin, Survey interviewee no. 68, Gender: Male, Age: 36-45 years, Occupation: SME, Date of Interview: 22 July, 2023.

groups and community as well as has created vulnerability and disparity in rural society that is presented in terms of their major socio-demographic characteristics in table 5 below.

Table 5: Vulnerability and Disparity by the Neoliberal Initiatives

Vulnerability and Disparity in Palsa	Vulnerable Group					Personal Vehicle			
	Unemployed	Women	Low Income	Disabled	No Group	Motorcycle	Bicycle	Car	No Vehicle
Educational Qualification	No Formal Edu.	1 (n=4)	5 (n=20)	8 (n=32)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0) 12 (n=48)
	PEC	5 (n=20)	3 (n=12)	9 (n=36)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	6 (n=24)	0 (n=0) 11 (n=44)
	JSC	4 (n=16)	3 (n=12)	1 (n=4)	0 (n=0)	1 (n=4)	2 (n=8)	3 (n=12)	0 (n=0) 4 (n=16)
	SSC	3 (n=12)	3 (n=12)	5 (n=20)	1 (n=4)	1 (n=4)	4 (n=16)	1 (n=4)	0 (n=0) 8 (n=32)
	HSC	6 (n=24)	7 (n=28)	3 (n=12)	1 (n=4)	2 (n=8)	6 (n=24)	3 (n=12)	0 (n=0) 10 (n=40)
	Undergraduate	1 (n=4)	1 (n=4)	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	2 (n=8)	1 (n=4) 0 (n=0)
	Graduate	4 (n=16)	6 (n=24)	5 (n=20)	0 (n=0)	3 (n=12)	5 (n=20)	2 (n=8)	0 (n=0) 11 (n=44)
	Postgraduate	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0) 4 (n=16)
	Total	24 (n=96)	28 (n=112)	39 (n=156)	2 (n=8)	7 (n=28)	20 (n=80)	19 (n=76)	1 (n=4) 60 (n=240)
	Student	5 (n=20)	6 (n=24)	2 (n=8)	1 (n=4)	6 (n=24)	4 (n=16)	4 (n=24)	0 (n=0) 12 (n=48)
Occupation	Farmer	2 (n=8)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0) 2 (n=8)
	Fisherman	2 (n=8)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0) 1 (n=4)
	Teacher	0 (n=0)	3 (n=12)	7 (n=28)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0) 8 (n=32)
	Agri. Worker	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)	1 (n=4)	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0) 2 (n=8)
	Govt Official	1 (n=4)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0) 1 (n=4)
	Private Employee	1 (n=4)	0 (n=0)	8 (n=32)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	3 (n=12)	0 (n=0) 4 (n=16)
	Businessman	3 (n=12)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)	1 (n=4) 0 (n=0)
	Day Laborer	2 (n=8)	0 (n=0)	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	0 (n=0) 3 (n=12)
	Housework	1 (n=4)	5 (n=20)	4 (n=16)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0) 10 (n=40)
	Rickshaw Puller	1 (n=4)	0 (n=0)	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0) 6 (n=24)
	SME	3 (n=12)	2 (n=8)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0) 5 (n=20)
	Shopkeeper	2 (n=8)	4 (n=16)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	2 (n=8)	3 (n=12)	0 (n=0) 3 (n=12)
	Landlords	0 (n=0)	4 (n=16)	2 (n=8)	1 (n=4)	0 (n=0)	3 (n=12)	2 (n=8)	0 (n=0) 2 (n=8)
	Others	1 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	0 (n=0)	1 (n=4)	0 (n=0) 1 (n=4)
	Total	24 (n=96)	28 (n=112)	39 (n=156)	2 (n=8)	7 (n=28)	20 (n=80)	19 (n=76)	1 (n=4) 60 (n=240)
Income Level (Monthly)	0-5000	6 (n=24)	10 (n=40)	7 (n=28)	0 (n=0)	5 (n=20)	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0) 25 (n=100)
	5001-10,000	4 (n=16)	8 (n=32)	11 (n=44)	1 (n=4)	2 (n=8)	3 (n=12)	8 (n=12)	0 (n=0) 15 (n=60)
	10,001-15,000	7 (n=28)	3 (n=12)	11 (n=44)	1 (n=4)	0 (n=0)	2 (n=8)	8 (n=32)	0 (n=0) 12 (n=48)
	15,001-20,000	0 (n=0)	4 (n=16)	3 (n=12)	0 (n=0)	0 (n=0)	3 (n=12)	1 (n=4)	0 (n=0) 3 (n=12)
	20,001-30,000	4 (n=16)	2 (n=8)	2 (n=8)	0 (n=0)	0 (n=0)	4 (n=16)	1 (n=4)	0 (n=0) 3 (n=12)
	Above 30,000	3 (n=12)	1 (n=4)	5 (n=20)	0 (n=0)	0 (n=0)	5 (n=20)	1 (n=4)	1 (n=4) 2 (n=8)
	Total	24 (n=96)	28 (n=112)	39 (n=156)	2 (n=8)	7 (n=28)	20 (n=80)	19 (n=76)	1 (n=4) 60 (n=240)

4.4.1. Victimization and Vulnerability

Among the research population, 93% (n=372) has supported the existence and visibility of various forms of vulnerable and victim groups followed by only 7% (n=28) with non-existence of the similar kind of phenomena. Among the vulnerable groups (Figure 7), the largest part belongs to the low-income group (39%, n=156) following by women (28%, n=112) and unemployed (24%, n=96).

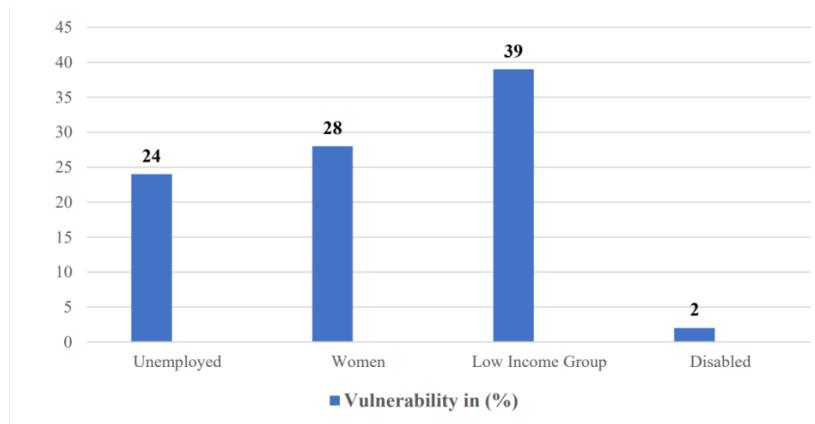


Figure 7: Groups Observed as Most Vulnerable in Palsa

Neoliberalism, being a western capitalist agenda, mostly use to maintain the benefit of upper-class via victimizing the rest of the classes in society. Palsa looks no exception to this culture of practices making the low-income group most vulnerable one, which is observed in the view of a KII participant. In the FGDs, one of the participants has showed concern as a parent with the growing use of abusing technology and availability of obscene and vulgar contents. She adds that one of her male neighbors was, reportedly, porn addicted and as a result, women in the neighborhood often faced sexual harassment from him. “Even women are commodified,”²⁸ unfolded by the same interviewee.

4.4.2. Inequality/Disparity

The figure 8 below demonstrates the possession of personal vehicle by different income groups in Palsa. The largest 60% (n=240) of the research population does not own any personal vehicle. Among those (40%, n=160) who possess personal vehicle, bi-cycle is owned by each (8%, n=32) of the two low-income groups. there is quite a huge number of research population possess bike or motorcycle (20%, n=80). Owning

28. Mortuza Begum, Survey interviewee no. 54, Gender: Male, Age: 46-55 years, Occupation: Homemaker, Date of Interview: 25 July, 2023.

a motorcycle is a sign of rich class in Palsa, according to the responses of a FGD participant. He adds that people in Palsa earn and prioritize buying a motorcycle to show their economic improvement. Private car is owned only by 1% (n=4).

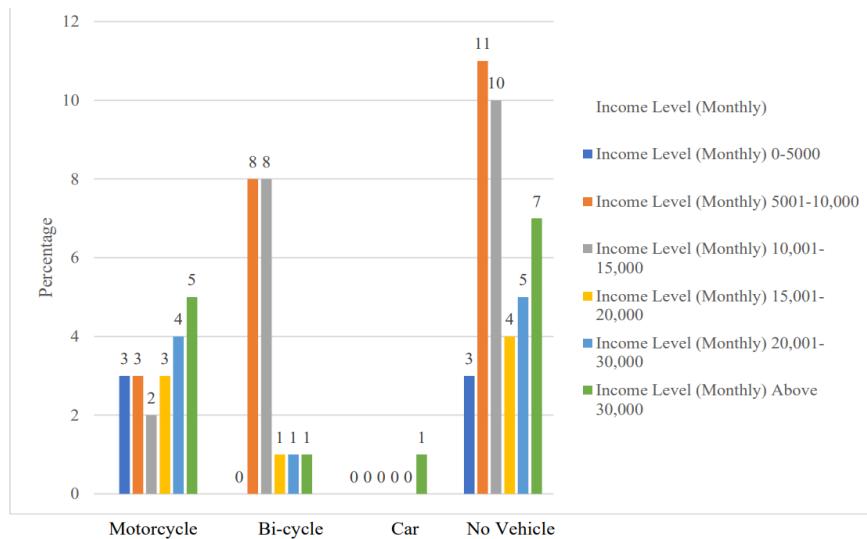


Figure 8: Personal Vehicle Possession

5.0. Conclusion

The empirical evidences presented in this paper represents the direct and indirect impact of the implementation of neoliberal agenda on rural Bangladesh society, which is reflected mostly in Palsa village. The Palsa is found in this study, more or less, a representation of the political economy of Bangladesh consisting of multiple types of economic systems in the rise of neoliberal economic movement. Palsa is mainly a unique form of mango-based agroeconomic rural vicinity where other forms of non-agricultural activities also use to take place. The present research has found a mixed outcome from diverse discourses as outlined in the idea of ‘neoliberalism at work’ pointed by Crowley and Hodson (2014), where some groups want to hold on to the traditional and cultural belonging to the occupations, some people are satisfied with their present job benefits, and however, most of them want to change their present occupation to promote the culture of consumerism and quality lifestyle. Market competition is evident here as a result of abundant supply and demand of diverse agricultural and non-agricultural products in the market.

Introduction of neoliberal agenda have also liberalized the non-agricultural economy in Palsa. Land, trees and ponds are given on lease, which means private initiatives have expanded so as to the increase of entrepreneurship. A new wave of start-ups and outsourcing employment is found according to the findings of the research where technological advancement and knowledge are important determinants resulting in online based businesses and earning sources. The flow of capital is somewhat influenced by the microcredit programs under neoliberal initiatives. Although microloans are highly facilitated here, the priorities of expenditure of these credits seem questionable as spending on the sectors like education, business etc. is less prioritized. Tendency to extract profit by the economic elites owning firms is acute in the market system that resembles surplus exploitation resulting in disparity among diverse economic groups and classes. Thus, the low-income group is seen as the most vulnerable one as they are lacking back-up to overcome their adverse conditions. The firms like brick-kilns and chemical based agro-fisheries are also often seen responsible for environmental damages, wastages and degradation. This is how, in the flip side of the neoliberal impact and benefits, the backlashes of neoliberalism become crystal clear in the economic context of rural Bangladesh society.

Healthy competitive environment, development of individual aspirations and self-esteem require necessary policy implementation to remove the backlashes of speeding up neoliberal agenda that already has taken off to bring changes in rural societies in Bangladesh. Repeating evaluation and proper monitoring model need to develop immediately to determine the prospective control and maintain equilibrium between the diverse sectors of economic activities so that sustainable development and positive changes could be ensured in diverse socio-cultural context.

References

- Adnan, S. (2016). Alienation in Neoliberal India and Bangladesh: Diversity of Mechanisms and Theoretical Implications, *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* [Online], 13 | 2016, Online since 06 April 2016, connection on 25 October 2023. URL: <http://journals.openedition.org/samaj/4130>; DOI: <https://doi.org/10.4000/samaj.4130>
- Ahmed, A. M. U. (2021). Islam, Neoliberalism and Social Inequality in Bangladesh: A Social Policy Perspective. *Social Policy in the Islamic World*, 279-315.
- Al Amin, M. (2017). Development for Whom? Neoliberalism, Microcredit and Women in Bangladesh.
- Asaduzzaman, A. S. M. (2013). *Digital Bangladesh: Information and Communication Technology for Empowerment?* (Doctoral dissertation, Goldsmiths, University of London).

- Beckert, J. (2019). The Exhausted Futures of Neoliberalism: From Promissory Legitimacy to Social Anomy. *Journal of Cultural Economy*.
<https://doi.org/10.1080/17530350.2019.1574867>
- Cahill, D., Edwards, L., & Stilwell, F. (Eds.). (2012). *Neoliberalism: Beyond the Free Market*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Chowdhury, M. S., Ahmed, F., & Hossain, M. I. (2019). Neoliberal Governmentality, Public Microfinance and Poverty in Bangladesh: Who Are the Actual Beneficiaries? *International Journal of Rural Management*, 15(1), 23-48.
- Connell, R., & Dados, N. (2014). Where in the World Does Neoliberalism Come from?: The Market Agenda in Southern Perspective. *Theory and Society*, 43(2), 117–138. <http://www.jstor.org/stable/43694712>
- Faruque, M. O. (2018). Mining and Subaltern Politics: Political Struggle against Neoliberal Development in Bangladesh. *Asian Journal of Political Science*, 26(1).
- Hess, D. J. (2013). Neoliberalism and the History of STS Theory: Toward a Reflexive Sociology. *Social Epistemology*, 27(2), 177-193.
- Husain, M. M. (2022). *Development, Neoliberalism, and Islamism in South Asia: The Case of Bangladesh*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Keating, C., Rasmussen, C., & Rishi, P. (2010). The Rationality of Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered Economy. Signs. <https://doi.org/10.1086/652911>
- Kelly, T. J. (2001). Neoliberal Reforms and Rural Poverty. *Latin American Perspectives*, 28(3), 84-103.
<https://doi.org/10.1177/0094582X0102800305>
- Larner, W. (2000). Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality. *Studies in political economy*, 63(1), 5-25.
- Larner, W. (2006). [Review of *A Brief History of Neoliberalism*, by D. Harvey]. *Economic Geography*, 82(4), 449–451.
<http://www.jstor.org/stable/30033090>
- Larner, W. (2009). Neoliberalism, Urban. *Elsevier E-Books*.
<https://doi.org/10.1016/b978-008044910-4.01094-4>
- Maher, S., & Aquanno, S. M. (2018). Conceptualizing Neoliberalism: Foundations for an Institutional Marxist Theory of Capitalism. *New Political Science*, 40(1), 33-50.
- Misra, M. (2017). Is peasantry dead? Neoliberal reforms, the state and agrarian change in Bangladesh. *Journal of Agrarian Change*, 17(3), 594-611.
- Murthy, R. V. (2013). Political Economy of Agrarian Crisis and Subsistence Under Neoliberalism in India.
- Noble, D. (2017). *Forces of Production: A Social History of Industrial Automation*. Routledge.
- Nuruzzaman, M. (2003). Peripheral Social Resistance to Neoliberal Globalization: A Study on Bangladesh.

- Nuruzzaman, M. (2004). Neoliberal Economic Reforms, the Rich and the Poor in Bangladesh, *Journal of Contemporary Asia*, 34:1, 3354,
 DOI: 10.1080/00472330480000291
- O'Connor, J. (2010). Marxism and the Three Movements of Neoliberalism. *Critical Sociology*, 36(5), 691-715.
<https://doi.org/10.1177/0896920510371389>
- Ong, A. (2007). Neoliberalism As © Mobile Technology. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32(1), 3-8.
- Önis, Z. (1995). The Limits of Neoliberalism: Toward a Reformulation of Development Theory. *Journal of Economic Issues*, 29(1), 97-119.
- Pollack, S., & Rossiter, A. (2010). Neoliberalism and the Entrepreneurial Subject: Implications for Feminism and Social Work. *Canadian Social Work Review / Revue Canadienne de Service Social*, 27(2), 155–169.
<http://www.jstor.org/stable/41669933>
- Radice, H. (2008). The Developmental State under Global Neoliberalism. *Third World Quarterly*, 29(6), 1153-1174.
- Reza, S. (2016). Hyper-individualized Recruitment: Rural-urban Labour Migration and Precarious Construction Work in Bangladesh. *Migration, Mobility, & Displacement*, 2 (2), 40-61.
- Saad-Filho, A., & Johnston, D. (Eds.). (2005). *Neoliberalism: A Critical Reader*. Pluto Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs4hp>
- Shamit, M. (2016). Rethinking Microcredit in Bangladesh: Does Grameen Bank Serve the Neoliberal Agenda?. *Inquiries Journal*, 8(09).
- Uddin, M. J. (2015). *The Micro-politics of Microcredit: Gender and Neoliberal Development in Bangladesh*. Routledge.
- Wright, J. S. (2015). The Pathway Out of Neoliberalism and the Analysis of Political Ideology in the Post-Crisis World. *Journal of Political Ideologies*, 20(2), 109-133.
- নাদিমুদ্দীন, মো. (২০২১). নব্য-উদারতাবাদ: উত্থান এবং একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা (Neoliberalism). *উন্নয়ন অনুধ্যান*।

Buddhist Currency in Ancient Period: A Comparative Study

Mst. Ummaysulaim Prethe*

Abstract

Currency is a very important element in the economic system of a society as a medium of exchange. A coin is a piece of metal that needs to have a specific purity and weight. It is also important simultaneously to consider it as a medium of exchange. In ancient India, 'cowry shells' were used as an easy means of exchange of goods. The weight of 'guñjā' seeds were used as a unit of measurement in the Indus Valley civilization. In the ancient Indian monetary system weight was measured with great precision. In Vedic literature, the word 'niśka', 'śatamāna' etc. are used to denote metal fragments. The eighth chapter of the 'Manusañhitā' mentions the 'trasareṇu' as the first unit of measurement, which actually refers to the very small mote which is seen when the sun shines through a lattice. Apart from this, the words likṣā, sarṣapa, kṛṣṇala, māṣaka, suvarṇa, paṇa/kārṣāpaṇa, pala, dharaṇa, sāhasa etc. associated with various currencies and their measurement system can be noticed in 'Manusañhitā' and 'Arthaśāstra'. However, after the discovery of coins that found in Taxila and Kabul, there is undoubtedly evidence of the circulation of metal coins in India in the 5th century BC. The 'kārṣāpaṇa' coin mentioned in the Buddhist scriptures of the Pre-Maurya era is quite similar to these. In various Buddhist texts such as Vinaya Piṭaka, Dhammapada, Jātaka, visuddhimaggo, etc., there are references to various coins and currency measurement terms such as Kahāpaṇa, Kākanikā, Dharaṇa, Pala, Pāda, Māṣaka, Aḍḍha etc. Through the said discussion, based on the information and data found in various Buddhist texts including 'Manusañhitā' and 'Arthaśāstra' etc. to provide a detailed discussion about the currency of the Ancient Buddhist era and its measurement system.

Keywords: Coin, Cowry shells, Guñjā, Māṣaka, Kārṣāpaṇa, Suvarṇa, Dharaṇa, Pala, Kākanikā, Pāda, Jātaka, Manusañhitā, Arthaśāstra.

* M. Phil. Researcher, Department of Pali and Buddhist Studies.
E-mail: ummaysulaimprethe743@gmail.com

Introduction

When the primitive people abandoned the nomadic life and started to live in groups and family, the production and storage of the necessary goods also became essential for them. Over time, a kind of division of labour began among people based on tasks related to food, clothing or shelter. Some were engaged in various professions such as textile weaving, some in house construction, some in food production etc. and as a result of this division, the practice of exchange between people can be seen. A person who made a living by producing food, when he needed clothing or other daily necessities, he would collect his own necessities in exchange for his surplus. Similarly, other professionals also used to collect their desired products or objects through barter in exchange for their surplus.

Gradually people developed a need to collect things that could not be found in certain or remote areas and bringing goods in exchange of goods from far away had also become a very difficult matter. As a result of this or to solve this difficulty people of that ancient time started to use a kind of mercantile token. Among these tokens Gold dust, Cowry Shells, Silk, Paddy, Grains, etc. became popular in different regions.

During the Vedic period, people used cows as a unit of exchange for their goods. Cows are mentioned as a unit of asset value. According to *Aitareya Brāhmaṇa*, wealth is frequently estimated in terms of cows. In the *Rigveda*, it is seen that an image of Lord Indra is offered to sale for 10 cows and in another chapter, it is seen that a sage was not willing to sell the image of Lord Indra for 100, 1000 or even 10000 cows. Also, in another chapter it is mentioned that when Indra sent his messenger to rescue his stolen treasure, his treasure was mainly cows. As said by Vedic literature, *dakṣiṇā* (fee) of priest was also given by cows. (Parmeshwari, 1996, p.2)

So, it goes without saying that the cow became one of the most important units of exchange in ancient India. Also, it has to be said that, *cowry shells* which was first used as jewellery by the ancients, became a widespread medium of exchange.

But over time the cow became a large unit as opposed to the exchange of small commodities and conservation of the cow as a resource was also quite difficult. Later people started using precious metals as a unit of exchange. Which was very convenient in terms of transportation, storage, exchange compared to other means of exchange. And later, for greater transparency, the system of exchange through metal blocks was developed based on the fixed weight system. The rectangular copper pieces with inscriptions found at Mohenjo-daro, one of the oldest sites of the Harappan civilization, are very similar to coins. So, it can be easily assumed that the history of origin and development of Indian currency is

quite old. Based on information from various Sanskrit and Buddhist literatures, this article will try to provide a clear idea about the coins of Ancient Buddhist era and their weighing system in ancient India. Moreover, since this article is based on literary information, content analysis method has been followed in this case.

Currency in Buddhism

An important piece of information about Buddhist currency can be found in the *dhammapada aṭṭhakathā* belonging to the *Tipiṭaka*. In the anecdote called 'sirimāvatthu' of this book, it is mentioned-

Sirimā was a very beautiful courtesan of the city called Rājagaha. She was also Jivaka's sister. When Jivaka's sister Sirimā died, Lord Buddha told the king that Sirimā's body should not be cremated and that sufficient fences should be made to prevent crows, dogs, etc. from eating the dead body. Then, on the advice of Lord Buddha, it was made compulsory for the common people to see the corpse in the crematorium, and the city was announced by blowing of trumpets that anyone should take away the body of Sirimā in exchange for *sahassam* (a thousand). When no one came to take the dead body, the value of the dead body was reduced to *pañcasatāni* (five hundred), *adḍhateyyāni satāni* (two hundred and fifty), *dve satāni* (two hundred), *sataṇam* (one hundred), *pannāsam* (fifty), *pañcavīsatī kahāpaṇe* (twenty-five *kahāpaṇa*), *dasa kahāpaṇe* (ten *kahāpaṇa*), *pañca kahāpaṇe* (five *kahāpaṇa*), *ekam kahāpaṇam* (one *kahāpaṇa*), *adḍham* ($\frac{1}{2}$ *kahāpaṇa*), *pādaṇam* ($\frac{1}{4}$ of *kahāpaṇa*), *māsakam*, *kākaṇikam*. However, no one was interested in taking the dead body.¹ The Great man Gautama Buddha created such events to show the fragility and mortality of human life.

But from the gradual decline in the value of the Sirimā's dead body that is shown behind this extraordinary narrative image, a sequence of values of the coins used in ancient India can be constructed.

kākaṇikam < *māsakam* < *pādaṇam* < *adḍham* < *kahāpaṇam* < *pañca kahāpaṇe* < *dasa kahāpaṇe* < *pañcavīsatī kahāpaṇe* < *paññāsam* < *sataṇam* < *dve satāni* < *adḍhateyyāni satāni* < *pañcasatāni* < *sahassam*.

1. “*sahassam* datvā sirimam gaṇhantū”ti. Rājā tathā kāresi. Ekopi ‘ha’nti vā ‘hu’nti vā vadanto nāma nāhosī. Rājā satthu ārocesi - “na gaṇhanti, bhante”ti. Tena hi, mahārāja, aggham ohārehīti. rājā “*pañcasatāni* datvā gaṇhantū”ti bherim carāpetvā kañci gaṇhanakam adisvā “*adḍhateyyāni satāni*, *dve satāni*, *sataṇam*, *paññāsam*, *pañcavīsatī kahāpaṇe*, *dasa kahāpaṇe*, *pañca kahāpaṇe*, *ekam kahāpaṇam* *adḍham*, *pādaṇam*, *māsakam*, *kākaṇikam* datvā sirimam gaṇhantū”ti bherim carāpesi. Koci tam na icchi”

Dhammapada aṭṭhakathā, Jarāvaggo (11), Sirimāvatthu (2), p.250

It may be noted here that the word *kahāpana* is probably implied after the word fifty. So, in this review it can be seen that coins **Kākanikā-Kahāpana** were common in Buddhist India and it goes without saying that coins became one of the main means of exchange in India during the time of Buddha. Along with this, coins made of precious metals such as gold, silver, copper, etc. have repeatedly appeared in various parts of Buddhist literature.

However, different *Jātaka* stories provide important information about the practice of barter which was prevalent during the time of Buddha or Buddhist era along with currency. For example-

Tanḍulanālījātakam (5) mentions the purchase of certain amount of goods by *tanḍula* (rice-grain). According to *Sunakhajātakam* (242), a man bought a dog with his clothes and one *kahāpana* of cash. So, it appears that besides coins, the practice of barter system was also common in that ancient era.

Weight System of Early Indian coins

Coin refers to easily exchangeable and transportable pieces of metal of specific weights and size, which are acceptable to all in economic transactions and are guaranteed by a certain ruling group. Metal purity and specific weight standards are very important issues in coinage. In the ancient Hindu scripture '*Manusamhitā*', there is a beautiful representation of the fact that this matter was considered with great precision in the coinage of ancient India. In the eighth chapter of the said book, the information about weight system is presented below-

8 <i>trasareṇu</i> = 1 <i>likṣā</i>
3 <i>likṣā</i> = 1 <i>rājasarṣapa</i>
3 <i>rājasarṣapa</i> = 1 <i>gaurasarṣapa</i>
6 <i>gaurasarṣapa</i> = 1 <i>yavamadhyā</i>
3 <i>yavamadhyā</i> = 1 <i>kṛṣṇala / rati</i>

Weight measurement of gold and copper-

5 <i>kṛṣṇala</i> = 1 <i>māṣa</i>
16 <i>māṣa</i> ($5 \times 16 = 80$ <i>rati</i>) = 1 <i>suvarṇa</i>
4 <i>suvarṇa</i> = 1 <i>pala / niṣka</i>
10 <i>pala</i> = 1 <i>dharana</i>
1 <i>kārṣika</i> (80 <i>ratis</i>) = 1 <i>copper kārṣāpana / pana</i>

Weight measurement of silver-

2 <i>kṛṣṇala</i> = 1 <i>raupyamāṣaka</i>
16 <i>raupyamāṣaka</i> = 1 <i>raupyadharana / rājatapurāṇa</i>
10 <i>raupyadharana</i> = 1 <i>rājataśatamāṇa</i>
(Manabendu, 2011, chapter -08, p.298)

Kautilya's '*Arthaśāstra*' also contains important information about the weight system of that time.

<i>5guñjā = Isuvarṇa māṣaka</i>
<i>16 māṣaka = Isuvarṇa / karṣa</i>
<i>4 karṣa = 1 pala</i>
<i>88 gaurasarṣapa = Iraupyamāṣaka</i>
<i>16raupyamāṣaka = Idharanā</i>

(Radhagovinda, 2023, p.161)

Sippikā or Cowry Shells

Pāli *sippikā* and Sanskrit *kapardaka* are synonymous with the English equivalent cowry shells. That can be said to be one of the most popular means of exchange in ancient India. This *sippikā* or cowry shells was used as one of the smallest units of exchange. The *kākanikā* coin mentioned as a medium of exchange in Buddhist literature was originally equivalent to 20 *sippikās* or cowry shells (Jitendra, 2016, p.34). Also 80 *sippikās* were one *paṇa* or copper *kārshāpaṇa* and 16 *paṇas* or 1280 *sippikās* or cowries were equivalent to 1 *purāṇa* /or silver *kārshāpaṇa*. (D. C., 1968, p.16)

It is mentioned in Buddhist *jātaka* stories *siṅgālajātakam* (113) that you will not get here even 100 *sippikā* (cowry shells) let alone two hundred *kaṇṣa*² (1 *kaṇṣa* is equal to four *kaḥāpaṇa*). The impression given in this description makes it quite certain that *sippikā* was in vogue in those days as a medium of exchange of very low value.

Kākanikā

In the '*sirimāvatthu*' an anecdote of the *dhammapada aṭṭhakathā*, the information previously presented under the title of 'Currency in Buddhism' shows that *kākanikā* coins were at the lowest level in terms of value. Another anecdote of *dhammapada aṭṭhakathā* is seen in *visākhāvatthu*, when asked about the total wealth of *pūṇavāḍḍhanakumāro*, his wealth is said to be forty crores. But that amount of wealth is also given the equivalent term of *kākanikā* in the said book.³ This data also proves that *kākanikā* was a currency unit of very low value. And it has been said

-
2. "Saddhāsi siṅgālassa surāpītassa brāhmaṇa.
Sippikānam satam natthi, kuto kaṇṣasatā duveti."
Jātaka, ekakanipāto, haṃcivaggo(12), siṅgālajātakam (113), p.19
 3. "Pūṇavāḍḍhanakumāro nāma mahāseṭṭhi"ti. "Dhanāṇ kittaka"nti?
"Cattālīsakotīyo mahāseṭṭhi"ti. "Dhanāṇ tāva amhākām dhanāṇ upādāya
kākanikamattam..."
Dhammapada aṭṭhakathā, paṭhamo bhāgo, pupphavaggo (4), visākhāvatthu (8), p.119

earlier that 1 *kākanikā* was equivalent to 20 *sippikās*. Information about exchange through *kākanikā* also comes from Buddhist *jātaka* stories. The *cūlaseṭṭhijātakavāṇṇanā* mentions a man who bought a dead mouse for his pet cat in exchange for a *kākanikā*.⁴ This coin was probably used during the Buddhist period as a means of small exchange.

Māsaka

According to the information given by Manu in his book '*Manusamhitā*' $1\ māṣa = 5\ kṛṣṇala / rati$ and $16\ māṣa / 80\ rati = 1\ suvarṇa$. So, it can be said that $4\ māṣa / 20\ rati = pāda$ ($\frac{1}{4}$ th of a total). This calculation was related to gold weight system. The method of weighing copper and gold is shown in the same treatise in this book. The matter was somewhat different in the case of silver. For example, in this case $1\ māṣa = 2\ kṛṣṇala / rati$ and $16\ māṣa / 32\ rati = 1\ dharāṇa$. The word *māṣa* is basically a weight indicator word.

However, one *pāda* = 4 *māṣa* in the prescribed is inconsistent with the following information in the *pārājikā* of the *Vinaya Piṭaka*. Because it is said there that at that time in Rājagaha 1 *pāda* was equivalent to 5 *māsaka*.⁵ Then 4 *pāda* or the total one can be said 20 *māsaka*.⁶

Some such differences are observed between the information given in Buddhist and Hindu literature. From this it can be inferred that there may have been some variations in weight system from time to time in coinage of India.

There are three types of this coin called *māsaka* described in Pāli literature. Namely – *lohamāsaka*, *dārumāsaka*, *jatumāsaka*.⁷ Here the Pāli word *Loha* means metal / copper, *Dāru* means wood and *Jatu* means lac. D. C. Sircar said,

“Māsaka of iron, it is said that they were made of copper, iron or some other metal. The wooden Māsaka has been interpreted as a coin made of hard wood or pieces of bamboo, palm-leaf, etc., whereas the Māsaka of lac was manufactured by impressing symbols upon small balls of lac, gum, etc.” (1968, p.8)

4. “*tam mūsikam gahetvā ekasmīm āpane biṭṭalassatthāya vikkiniṭitvā kākanikām labhitvā...*”
Jātaka aṭṭhakathā, paṭhamo bhāgo, apaṇṇakavaggo (1), cūlaseṭṭhijātakavāṇṇanā (4), p.71
5. “*Tena kho pana samayena rājaghe pañcamāsako pādo hoti.*”
Pārājikapāli, dutiyapārājikam (88), p.27
6. “Buddhaghoṣa’s *Samantapāśādikā* says: *tadā Rājagahe vīsatī-Māsako Kahāpaṇo hoti, tasmā pañca- Māsako Pādo.*” (D. C., 1968, p.56)
7. “*Rajatam nāma kahāpaṇo lohamāsako dārumāsako jatumāsako ye vohāram gacchanti.*”
Pārājikapāli, kosiyavaggo (2), rūpiyasikkhāpadam (584), p.189

There are mentions of this *māsaka* coins in various places in Buddhist literature. The *Bhikkhunī vibhaṅgo* mentions that theft refers to the taking by a woman of *pañcamāsaka* (five *māsaka*) or above or of equivalent value for the purpose of stealing.⁸ The term *addhamāsaka* is mentioned in *Petavatthu*.⁹ Then its weight was probably half of a total *māsaka* or 2.5 *rati* / *kṛṣṇala*. *Jātaka* literature also mentions the word *māsaka* to depict the transaction of goods. For example, the price of one pot of *surā* (liquor) was one *māsaka* (*Jātaka*, 78), a large fish was 7 *māsaka* (*Jātaka*, 288), etc. Kautilya's '*Arthaśāstra*' also mentions the term to show the exchange of goods. For example, the rent of a bullock cart is six *māsaka*, the rent of camels and buffalo is four *māsaka*, and the rent of a large car is seven *māsaka*. (Radhagovinda, 2023, p.190) In the context of the discussion, although the word *māṣa* is a weight indicator, it can be easily said that later the word *māsaka* (pāli) / *māṣaka* (sanskrit) was changed to the name of the coin of that weight.

Pāda

It is mentioned in a Pāli-English dictionary that there is a coin called *pāda*. Basically, 1/4th of a total weight is corresponding to one *pāda*. (Davids and Willium, 1952, part-v., p.75) It is mentioned in the *cūlavagga* - when the *Vajjiputtakā* monks asked the devotees for giving various coins for the purpose of the *saṅgha* (the Buddhist clergy), Yasa Thera told the devotees that they should not give *kahāpana*, *adḍha*, *pāda* or *māsaka* to the *saṅgha*.¹⁰

Again, it is mentioned in the *Vinaya Piṭaka mahāvagga* that a monk who takes one *pāda* or equivalent value of one *pāda* or more than one *pāda* in value of stolen goods will be considered as *assamaṇo* (non-ascetic).¹¹ According to Manu, it is previously said that 1 *suvarṇa* = 16 *māṣa* and 5 *kṛṣṇala* = 1 *māṣa*. Then, it can be said 20 *kṛṣṇalas* would be one *pāda*

8. “Corī nāma yā pañcamāsakam vā atirekapañcamāsakam vā agghanakam adinnam theyyasaṅkhātam ādiyati, esā corī nāma.”
Pācittiyapāli, *bhikkhunī vibhaṅgo*, *dutiyasaṅghādisesasikkhāpadam* (684), p.168
9. “Anāvātesu titthesu, viciniṃ addhamāsakam.”
Petavatthu, *cūlavaggo* (3), *serīṇīpetavatthu* (467), p.31
10. “māvuso, adattha saṅghassa kahāpanampi addhampi pādampi māsakarūpampi.”
Vinaya pitaka, *Cūlavagga*, *sattasatikakkhandhakam* (12), *paṭhamabhbāṇavāro* (446), p.259
11. “Yo bhikkhu pādam vā pādārahaṇi vā atirekapādam vā adinnam theyyasaṅkhātam ādiyati, assamaṇo hoti asakyaputtiyo.”
Vinaya piṭaka, *mahāvagga*, *mahākhandhako*, *cattāri akaraṇīyāni* (129), p.69

and with $4 \text{ } pāda$ (4×20) = 80 *rati* / *kṛṣṇala* which is the same of the weight of a gold or copper *kārshāpaṇa*. But it has already been shown that according to Pāli literature, one *pāda* was made in 5 *māṣakas*. If as like the information of Sanskrit literature 1 *māṣa* = 5 *rati* is followed in Buddhist era then it can be assumed that *pāda* will be in 25 (5×5) *ratis* and gold or copper *kahāpaṇa* will be in 100 *ratis* (4×25). Some of these inconsistencies are observed in Buddhist and Hindu scriptures.

Kahāpaṇa

Pāli *kahāpaṇa* and Sanskrit *kārshāpaṇa* are frequently used in ancient Indian literature. Perhaps the word is derived from the word *karṣa* which appears in both the '*Manusamhitā*' and '*Arthaśāstra*' texts in reference to weight measurement. Pañini's work also mentions this term. In his book *Aṣṭādhyāyi*, coins are also called *kārshāpaṇa* and *sāṇa*.

There are many references to this word *kahāpaṇa* in various places in Buddhist *Jātaka* literature as well as another Buddhist literary works. In the system of copper or gold weights mentioned by Manu, it is seen that 80 *rati* = 1 *kārshāpaṇa*. As the information of Sanskrit Literature this *kārshāpaṇa* meant only copper weighing of 80 *rati* and coins made of copper were called *paṇa*. But it is not always certain whether the word *kahāpaṇa* which is frequently used in Buddhist literature is used in the sense of gold, silver or copper.

In Buddhist literature, the term *kahāpaṇa* was used to denote this aspect of a coin weighing one *karṣa*. Because in Buddhist literature the word *kahāpaṇa* is used not only to refer to coins made of copper, but also to *kahāpaṇa* made of gold and silver. In *pārājika* it is mentioned that a householder gave Upananda an equivalent amount of *kahāpaṇa* in lieu of the food meat given for him.¹² *Bhikkhunī vibhaṅgo* mentions that a devotee bought and donated ghee (clarified butter) to a sick nun named Thullanandā through *kahāpaṇa*.¹³

It is also mentioned in the *Dhammapada* that desires are not satisfied by shower of *kahāpaṇa* coins.¹⁴ *Visuddhimaggo* mentions – A monk said

12. “*Atha kho so puriso āyasmato upanandassa sakyaputtassa kahāpaṇam datvā ujjhāyati khyiyati vipāceti ...*”
Pārājika, kositavaggo (2), rūpiyasikkhāpadam (582), p.189
13. “*Atha kho so upāsako aññatarassa āpanikassa gharā kahāpanassa sappim āharitvā thullanandāya bhikkhuniyā adāsi.*”
Pācittiyapāli, bhikkhunī vibhaṅgo, pattavaggo (1), catutthasikkhāpadam (748), p.186
14. “*na kahāpaṇavassena, titi kāmesu vijjati. appassādā dukhā kāmā, iti viññāya pandito.*”
Dhammapada, buddhavaggo (14), verse-186, p.13

that these vessels worth of eight *kahāpaṇa* was given by his worshiper mother.¹⁵

The size of *kārshāpaṇa* is also known from the Buddhist book *Visuddhimaggo* written by Buddhaghoso. It is said in this book that how a naive boy, a rural person, and a goldsmith see the pile of *kahāpaṇa* coins. Among them, the naive boy only knows the shape of those *kahāpaṇa* coins is long, square, round. With this description, it is clearly understood that at that time *kahāpaṇa* coins were with long, round or square etc. this type of shapes.¹⁶

Hiraṇya and Suvarṇa

Gold coins had been one of the most valuable mediums of exchange since ancient times. In the *Samhitās* and *Brāhmaṇas* the word *hiranya* mainly refers to denote gold.

According to Manu, weight of 80 *ratis* of gold is equal to one *suvarṇa* and 4 *suvarṇa* = *Ipala* / *niṣka*. In *Pārājika*, it is mentioned that Sudinna's mother built two huge piles of *hiranya* and *suvarṇa*. On the other hand, in *majjhima nikāya* father of Ratṭhapāla is also seen to have built such a grand structure of *hiranya* and *suvarṇa*.

Here, the first mentioned word *hiranya* refers to only for gold and most probably not for gold coins. But people use *hiranya* as a medium of exchange also. Again, the word *hiranya* was not only used in the sense of gold, in addition, the use of the word *hiranya* was observed in the sense of silver, wealth, precious metals, or objects etc. In Vedic literature the word *hiranya* is mentioned to denote silver. *Hiranya* was also called *harita* (yellow tinged), *rajata* (white tinged) etc. due to the variation in colour. On the other hand, the use of the word '*suvarṇa*' in Buddhist and Sanskrit literature may be a complement to the gold coin of that weight, weighing 80 *ratis* in the specific weight system prescribed by Manu. According to the Buddhist legend, once Anāthapindika wanted to build a monastery for the use of the Buddhist *sangha*. The land he selected for this belonged to a certain Kumar. When Anāthapindika asked him the price of the land, he replied that it should be covered with gold. It is said that Anāthapindika had covered the land with eighteen crores of gold coins.

15. “*ayam, bhante, aṭṭhakahāpanagghanako patto mama mātarā upāsikāya dinno dhammiyalābho ...*”

visuddhimaggo 1, brahmavihāraniddeso, mettābhāvanākathā (251), p.113

16. “*kahāpaṇarāśīm eko ajātabuddhidārako, eko gāmikapuriso, eko heraññikoti tīsu janeshu passamānesu ajātabuddhidārako kahāpaṇānam cittavicittadīghacaturassaparimāṇḍalabhbāvamattameva jānāti*”

visuddhimaggo 2, kandhaniddeso, paññākathā (423), p.15

Dharana, Purāṇa, Paṇa

With the word *Dharana* and *Purāṇa* silver coinage is denoted. But Manu mentioned the word Dharana both for gold and silver. A. R. frey said in his book that *Dharana* is silver coin of ancient India which is the same as the *Purāṇa*. He also mentioned that the name is from dhri, "to hold," and probably means, according to Cunningham, "a handful of sixteen copper Panas." (Frey, 2001, p.65)

The weighting system of *dharana* or *purāṇa* was slightly different than the weight system of *suvarna*. According to Manu, 2 *ratis* would be 1 *māṣa* and 32 *ratis* or 16 *māṣa* would be 1 *Rajata Kārshāpaṇa*, *Dharana* or *Purāṇa*. The other term *paṇa* or copper *kārśāpaṇa* was the coin of 80 *ratis* according to Sanskrit literature. In Kautilya's '*Arthaśāstra*', these coins are mentioned in various chapter. Kautilya said in his book that if someone steals small animals such as cats, dogs, etc., he will be fined 54 *paṇas*, if he steals small things of ascetic people, he will be fined 100 *paṇas* and if one's commits adultery, he will be fined 500 *panas*. (Radhagovinda, 2023, p.321-322)

Conclusion

Out of the system of barter which prevailed in India since ancient times, people gradually learned to use more modern means of exchange which emerges in this detailed discussion. One of the most important elements of historiography is the discussion of Coins. In the discussion of currency, various types of important information are available about the political life, economic life and cultural history of a nation, country or society. The later coins used in India were more informative than the earlier coins because in the later coins, the names of different rulers or the drawing of their faces, the addition of different writings, etc. can be observed. The above discussion describes the early use of various mercantile tokens as a medium of exchange among the people of ancient India, and how these gradually took the form of metal coins also represented in this article. Moreover, an attempt has been made to provide detailed information about by which name the coins were known as in India during the pre-Buddhist period and during the Buddha's time, through a comparative discussion of various Buddhist and Sanskrit literature. Besides, the difference between naming and weighting methods of coins depending on their material and weight also has presented. The overall discussion of this paper is an attempt to bring together the significant data on coins scattered in various parts of Buddhist literature, which highlights the glorious history of ancient Buddhist coins and through which it will be possible to determine the true nature of Buddhist coins used in ancient times.

Bibliography

- Khuddakanikāye Dhammapada-aṭṭhakathā (Paṭhamo bhāgo).* 2008. Vipassana Research Institute, Igatpuri, Maharastra. <https://tipitaka.org/romn/>.
- Khuddakanikāye Jātakapāli (Paṭhamo bhāgo),* loc.cit.
- Khuddakanikāye Jātaka- aṭṭhakathā (Paṭhamo bhāgo),* loc.cit.
- Vinayapiṭake Pārājikapāli,* loc.cit.
- Vinayapiṭake Pācittiyapāli,* loc.cit.
- Khuddakanikāye Petavatthupāli,* loc.cit.
- Vinayapiṭake Cūlavaggapāli,* loc.cit.
- Vinayapiṭake Mahāvaggapāli,* loc.cit.
- Khuddakanikāye Dhammapadapāli,* loc.cit.
- Visuddhimaggo (Paṭhamo bhāgo),* loc.cit.
- Visuddhimaggo (Dutiyo bhāgo),* loc.cit.
- Bandopadhyay, Manabendu. (2010-2011). *Manu-Samhitā* (Edited). Sadesha, Kolkata.
- Basak, Radhagovinda. (2023). *Kautilyas Arthashastra.* Akash (A House of Literary Publications), Banglabazar, Dhaka.
- Gupta, Parmeshwari Lal. (1996). *Coin.* National Book Trust, New Delhi.
- Sircar, D. C. (1968). *Studies in Indian Coins.* Motilal Banarsidass, Delhi.
- Barua, Jitendra Lal (2016). *Buddhist Economi.* Jatiya Sahitya Prakash, Dhaka.
- Davids, T. W. Rhys and Stede, Willium. (1952). *The Pali Text Society's Pali-English Dictionary.* The Pali Text Society, London.
- Frey, Albert R. (2001). *A Dictionary of Numismatics Names.* Bharatiya Kala Prakashan, Delhi.

Risks, Vulnerabilities and Adaptations: Exploring the Impact of Salinity Intrusion on Women in Coastal Bangladesh

Shahana Afrin Dina¹, Dilafroze Khanam², Mohammad Mufajjal Sarwar³

Abstract

The article sheds light on the salinity-induced risks and vulnerabilities of women and adolescent girls living in coastal areas of Bangladesh. Moreover, it critically analyzes the adaptation actions of coastal women and teenage girls to salinity intrusion and connects the concepts to climate governance. The paper uses secondary textual analysis as its methodology, eco-feminism, and political ecology theory as the theoretical framework and thematic analysis strategy for secondary data analysis. The article incorporates Alston's idea of radical adaptation to suggest placing gender equality as the core component of risk and vulnerability assessment of salinity intrusion, GO- NGO adaptation policies, and practices against salinization. Furthermore, this paper suggests taking context-specific and gendering-specific adaptation policies to increase the resilience power of coastal saline-prone marginal women and adolescent girls.

Key terms: Salinity, risk, vulnerability, adaptation, gender roles, climate governance.

Introduction

Salinity intrusion is a bitter truth and harsh reality for coastal women in Bangladesh. The direct risks and vulnerabilities of salinity connected with coastal women are intensified when socio-political, economic and religious issues are blended with them. So, there exists a strong bond among gender, socio-economical, environmental, and sustainability issues. To make the coastal marginalized women's voices louder, we have to bring gender issues to the discussion of salinity intrusion,

-
1. Lecturer, Department of Science and Humanities, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University, Bangladesh.
 2. Associate Professor, Department of Sociology, University of Barishal.
 3. Assistant Professor, Department of English, Barishal Govt. Women's College, Barishal.

adaptation policies and actions, risk, vulnerability, mitigation, and resilience analysis. This paper efforts to present a critical analysis of the risks, vulnerabilities, and adaptation actions taken by the coastal women, GO, and NGOs to mitigate climate uncertainties.

What is meant by salinity? Why and how is salinity intrusion increasing in Coastal Bangladesh? Salinity intrusion in Bangladesh is two-dimensional- soil and water salinity. Salinity means the saltiness of coastal soil as well as water, simply stated as the extreme quantity of salt or sodium the coastal soil and water contains. The process of salinity intrusion emerges from natural calamities like cyclones, tornadoes, storm surges, and tidal inundation, the coast's topographical location, excessive groundwater abstraction, and most importantly, sea level rise (Gobeshona, n.d.; Sarwar, 2005; Rahman et al., 2019). Salinity irretrievably contaminates waterways, aquifers, and soils (Williams, 2001; Katabchi, 2016, cited in Rahman et al., 2019). Bangladesh's natural disaster negatively affects the coastal ecology (Saroar, 2015; Alston, 2015) and the social environment (Khanam, 2019).

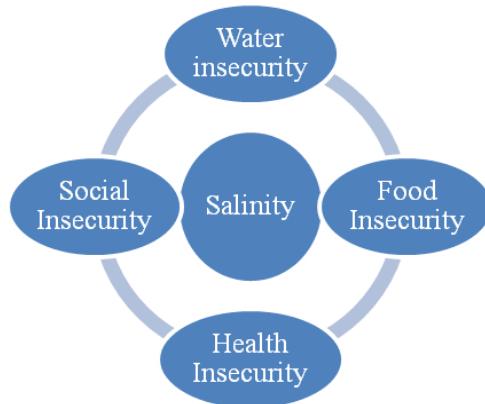
Background of The Study

Bangladesh stands at the seventh position among countries having the most risk of extreme weather conditions and the threats of climate-related natural tragedies (Global Climate Risk Index, 2020) and the report also shows that Bangladesh remains in third position among other countries that are most hit by various natural disasters yearly. Moreover, Bangladesh has 715 km long coastal areas comprising 19 districts and 31.8 million inhabitants (BBS, 2010), and the area is considered the most climate-vulnerable part of the country (Kabir et al., 2016). In coastal areas, especially Sea Level Rise (SLR), risks like soil erosion, reduced agricultural production, salinity intrusion, floods, destruction of traditional fish sources, loss of biodiversity, etc., are widespread (Sarwar, 2005). In several reports, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warned that the coastal zone of Bangladesh would experience numerous SLR-induced challenges, including salinity intrusion (IPCC, 2001, 2007, cited in Saroor, 2015).

In coastal regions of Bangladesh, rapid increases in areas contaminated by salt have been a significant problem, influenced by both climatic factors, such as geography and land formation, and non-climatic factors, like shrimp farming. These issues have created substantial obstacles for communities dependent on natural resources, threatening their overall well-being and way of life (Saroar, 2015). According to Khanam (2019), the influence of saline water pervades the daily existence of every individual in these areas. Furthermore, salinity disrupts the fulfillment of fundamental human needs including food, housing, clothing, health, and

education, essentially affecting every aspect of the coastal populations' lives and means of survival (Rahman, 2009). Salinity in these coastal areas leads to various forms of instability, encompassing water, food, health and sanitation, and societal challenges.

Figure 1: Nexus Among the Insecurities Created by The Salinity Intrusion (Source: Khanam and Dina, 2020)



Water insecurity forces the coastline people to suffer extremely from the non-saline drinking water crisis (Dasgupta, 2017), so they have to purchase drinking water that increases their poverty (Bagri, 2017). Moreover, salinity negatively affects the coastal people's food security (Ahsan, 2010; Alston, 2015) and creates various health complexities (Scheelbeek et al., 2017; Nahian et al., 2018), especially for women. Again, most social insecurities are related to coastal women as salinity has gender dimensions where women are the key vulnerable section of the problem (Rahman, 2009; Alstone, 2015). Furthermore, salinity-induced coastal women's vulnerability includes work burdens, malnutrition, health and hygiene crisis, sexual harassment, domestic violence, mental stress, disease burden, the victim of child marriage, low educational attainment, and wage discrimination (Khanam & Dina, 2020; Zaman, 2017; Habiba et al., 2014; WaterAid UK, n.d.; Alston, 2015; Rahman, 2009).

Moreover, the women living in the coastal areas are the most climate-vulnerable populace of the country (Alston, 2015) but GO and NGOs do not have any specific adaptation policies for them. However, most of the studies related to salinity intrusion explored the vulnerabilities of coastal women in terms of their health and water crisis issues as well as adaptation techniques. No study makes the nexus between risks, vulnerability, and adaptation techniques of coastal women to salinity intrusion and relates climate governance with it. So, this study is a

significant and unique one to show the holistic picture of salinity intrusion and gender issues in coastal areas of Bangladesh.

Aims of the Study

The study sets out with a comprehensive three-pronged objective: Initially, to evaluate the threat that coastal women face from the encroachment of salt into soil and water sources, a phenomenon exacerbated by climate change. The second aim focuses on delineating the specific vulnerabilities and repercussions that salinity intrusion has on the socio-economic stability and well-being of women in the coastal regions of Bangladesh. Lastly, the research intends to map out and analyze the array of adaptation strategies that these women, along with government and non-government organizations, have developed and implemented to counteract and mitigate the adverse effects of salinity intrusion, with the ultimate goal of securing their livelihoods and enhancing their resilience.

Research Questions

- i). What are the primary risks and vulnerabilities faced by coastal women due to salinity intrusion, and what adaptation strategies do they employ to mitigate these challenges?
- ii). What social protection policies do governments and NGOs implement to address climate change risks and vulnerabilities for coastal women, how are these policies linked to climate governance, what drives these risks and vulnerabilities, and how do these factors shape adaptation actions?

Structure of the Paper

The first part of the paper shows the present salinity situation in Bangladesh, a brief presentation of the case, the aim of the study, related concepts and theories, and methodological considerations. In the second part of the paper, the authors analyze the risks and vulnerabilities of coastal women due to salinity intrusion and their current adaptation strategies. In the final part, authors relate the third aim of this paper to the concept of climate governance and show how climate governance is related to it. Moreover, the paper also presents a critical analysis of the key causes of salinity-induced risks and vulnerabilities of coastal women with a special focus on the structural drivers as well as institutional attempts of those risks and vulnerabilities. Again, a brief critical discussion on the adaptation policies and coastal women's position on those policies with a distinctive focus on Enarson's view of the feminist political ecology approach also reveals here. Finally, the paper concludes by accepting Alston's concept of "radical adaptation" and narrowing

down the concept to put gender equality at the focus of risk and vulnerability assessment and adaptation strategies of salinity intrusion.

Methodology

The paper is developed by using ‘secondary data analyses’ of several books and book chapters, research reports as well as journal articles as the source of my secondary data. For example, the Global Climate Risk Index, the 2020 WaterAid Bangladesh End-line study report on Climate Resilience 2014, UNICEF’s report on better access to safe drinking water 2013, the report of UNDP, The Asia Foundation’s report on a situation analysis of climate change adaptation initiatives in Bangladesh 2012, etc. were analyzed to identify the risks and vulnerabilities as well as to bridge the gaps between existing adaptation strategies and the current condition of coastal Bangladesh.

Theoretical Concepts

For this paper, the authors analyze the concept of risk, vulnerability, and adaptation through the gender lens to comprehend the current situation of coastal women regarding climate change. Here gender refers to the social processes, practices, and relations that form our identity as men or women at a certain time or place. Enarson (2012) notes that gender is an indication of differences and inequalities; gender is also relational; it is constructed by society, it exists at individual as well as institutional levels, and also gender is protected through our social practices.

In the context of climate change, risk is identified as the potential for significant losses - affecting lives, health, livelihoods, assets, and services - that a community or society may face within a specific future timeframe (UNISDR, 2009). It's noted that disaster risk disproportionately affects those who are poorest and most marginalized within a community (UNDP, n.d.). Research indicates that women and girls are especially vulnerable to risks associated with climate-related disasters, facing higher instances of death, illness, and economic losses to their means of subsistence (UNDP, n.d.). For instance, during the catastrophic cyclone and flood that hit Bangladesh in 1991, the mortality rate among women was nearly five times higher than that of men (Rohr, 2005). Additionally, it has been found that women and children are fourteen times more likely to die in a disaster compared to men (UNDP, n.d.).

Moreover, vulnerability, as defined by Engle (2011), is the state of being prone to damage or harm, or alternatively, it represents one's ability to foresee, endure, resist, and bounce back from the effects of a natural disaster (Kelly & Adger, 2009). In essence, vulnerability signifies the collective factors that result in an insufficient capacity to effectively respond to climate change-related incidents. Within the sphere of climate

change, those most at risk are identified by various markers of socio-economic disadvantage including gender, poverty, lack of education, reduced access to services, limited employment opportunities, among others (Alston, 2015). Consequently, in scenarios of disaster, the vulnerabilities of women are exacerbated by prevailing gender disparities, such as restricted rights to land and resources, minimal involvement in decision-making, constrained mobility, absence of income opportunities, the weight of traditional gender roles, and policies that overlook gender-specific needs (Alston, 2015).

In addition, the concept of adaptation refers to “the adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities” (UNISDR, 2009, p: 4). Simply, adaptive capacity means the ability of people or communities to cope with the adversities of hazards at hand. Studies have shown that the poor and women have the less adaptive capacity, so they are less likely to survive and recuperate from disaster events (UNDP, n. d). Disaster mortality rates are much higher among women and girls than men due to gendered differences in capability to cope with climate events as well as insufficient access to early warnings and disaster information (Rohr, 2005; UNDP, n. d). For example, women accounted for 91 percent of fatalities caused by the 1991 cyclone in Bangladesh (UNDP, n. d).

So, to understand the greater risk, vulnerabilities, and adaptive capacity of women regarding climate change, feminist analysis is a key requirement. For example, questions like why and how are women more vulnerable to climate risk? What are the dynamics that contour their responses to climate change as well as to the adaptation strategies? How does the socio-cultural context of women, poverty, and family structures influence their capability to respond to climate change challenges with adaptation? For this paper, eco-feminist theory is used because the approach argues that women's activities have been overlooked for their non-monetary nature in capitalist society. Moreover, the authors also want to focus on feminist political ecology theory because the approach puts women at the center of environmental issues and adaptive activities.

Eco-feminists argue that women have a close relationship with nature than men, and that view links the concept of “dominance of nature” to the concept of “dominance of women” (Alston, 2015, p.18). Eco-feminist Shiva (1993) shows that the oppression of women is interlinked with nature, claiming that the subsistence activities of women are ignored due to their non-monetary nature in a capitalist society. So, eco-feminism views a nexus among patriarchy, capitalism, and colonialism, and they

are the oppressive factors in the case of women's subordination. Moreover, Shiva (1995) argues that rural women are the key contributors to life as well as they are the rightful conservers of their nature. Besides, women have a greater inclination to care for nature than men because women's survival techniques as the key food producers depend on it (Sandilands, 2008); as Shiva (2009, p.19) said, "from seed to table, the food chain is gendered." Furthermore, women are the main gatherers of drinking water, food, fuel, and fodder that are threatened by climate change and women are very poorly represented in conservation projects (Resurecccion, 2013). However, evidence shows that "women are more likely to perform effectively and efficiently in natural resource management by preserving biodiversity, reducing greenhouse gas emission, and increasing food production than men and helps to reduce vulnerability owing to climate change" (Corcoran- Nantes and Roy, 2018, p.165). So, the failure to integrate women's experiences and knowledge into natural resource management has directed toward environmental degradation and loss of biodiversity.

In addition, feminist political ecology suggests placing women at the center of environmental issues such as food and water security, adaptation and resilient strategies as well as environmental sustainability because evidence shows that across the world women protest against various environmental challenges. Moreover, feminist political ecology claims that gender discrimination, environmental degradation, disaster risk, and vulnerability are interconnected, where ignoring the gender risks will extend the environmental degradation and reduce the adaptive capacities (Enarson, 2012). So, it is evident that gendered analysis of climate change challenges is a critical need to ensure the survival of people under environmental threats across the globe.

Analysis of the Secondary Data

a). Risk Analysis

Climate change-induced sea level rise creates salinity impacts in coastal areas in three ways like i). Salinizing surface water ii). Salinizing groundwater, and iii). Salinizing soil (Huq et al., 1998), and these three-dimensional negative impacts risk the coastal people conjointly and severely. In a broad sense, salinity intrusion creates a risk to coastal women in three ways-

i). Water Risk

Currently, 1.4 million people living along the coast are facing a severe shortage of potable water and irrigation water during the dry season each year, and projections indicate that by future dates, 3.2 million of the

poorest coastal inhabitants will be severely impacted by increasing water salinity (Dasgupta, 2017). Due to the salinity in groundwater, over 70% of coastal residents rely on collecting water from ponds for drinking and domestic purposes (Bagri, 2017). The primary responsibility for fetching this water falls on women and adolescent girls in these households, highlighting a clear gender disparity. For instance, UNICEF (2013) reports that 89.6% of coastal women are tasked with water collection for their families, compared to only 4.6% of men. Consequently, women and girls often have to travel 3-7 kilometers every day to secure drinking water for their families (Alston, 2015). Additionally, the challenge of water insecurity compels coastal communities to purchase drinking water, with about 10% of their income going towards this necessity (Bagri, 2017). This expenditure exacerbates poverty among coastal populations, with women indirectly bearing the brunt of these adverse conditions.

ii). Risk on Coastal Food Security

Salinity reduces coastal agricultural production as saline-infested cultivated coastal land area increases gradually (Faruque & Ali, 2005). Salinity imposes direct risk on coastal people's food security by four ways-

Decreasing Agronomic Production

Alston (2015) illustrates how salinization significantly deteriorates the soil quality in coastal regions, leading to a reduction in agricultural yields by two to threefold. Additionally, according to Ali (2005, as cited by Sarwar, 2005), there was a 69 percent decrease in rice production in the coastal districts between 1985 and 2003.

Losing Homestead Forests and Vegetation

Plantation of homestead forests, such as fruit and non-fruit trees, as well as vegetables, are a common practice in rural Bangladesh. Rural inhabitants depend on homestead fruit trees and vegetation to meet their nutritive essentials. However, fruit trees and vegetable gardens are not grown up in coastal districts (Nahian et al., 2013; Alston, 2015; Saroor, 2015), and these traditional sources of nourishment are devastated entirely by salinity.

Crisis of Livestock's Food Supply

Salinity in both soil and water leads to a reduction in available grazing areas and hay production for livestock in coastal regions. Alam et al. (2017) have found that every year, coastal districts lose 200 hectares of land previously used for growing fodder crops. As a result, livestock in these areas face significant challenges in finding sufficient food (Alston,

2015). Furthermore, Nahian et al. (2013) have documented that the salinity levels negatively impact the practice of poultry farming in these coastal districts. These conditions collectively jeopardize the food security of people living in coastal communities.

Reduction of Fish Production

Salinity abolishes the conventional fish stocks in coastal areas, which are a crucial source of protein for women and children living there. Research indicates that the combination of water salinity and cyclones plays a significant role in depleting these traditional fish populations throughout the coastal regions (Alam et al., 2017). Additionally, a separate study found that 17% of families in two coastal sub-districts reported a lack of fish in nearby rivers (Maumita et al., 2015). Consequently, the depletion of fish resources threatens the dietary and nutritional well-being of coastal communities, particularly affecting women and children.

iii). Health Risk

Salinization elevates health risks in two primary ways: first, by increasing the incidence of diseases among coastal women and girls, and second, by heightening the likelihood of mental stress. Research highlights that women and children face the most significant health dangers among all groups in coastal areas (Zaman, 2017). For instance, the habitual consumption of saline water is closely linked to a higher incidence of blood pressure issues (both prehypertension and hypertension), with women experiencing a 31% greater risk of hypertension compared to men (Nahian et al., 2018). Furthermore, coastal pregnant women are five times more likely to suffer from (pre-) eclampsia—a condition characterized by high blood pressure during and after pregnancy—compared to those who consume non-saline water during pregnancy (Vineis et.al, 2011). Additionally, they face an increased risk of miscarriage, maternal morbidity, and mortality (WaterAid Bangladesh, 2014).

Furthermore, research indicates that women and girls are primarily affected by reproductive health issues during menstruation and serious skin conditions (Ahmed et al., 2008; Sharmin and Islam, 2013). Additionally, Gobeshona (n.d., p.3) outlines a concise list of the prevalent health risks faced by women and girls in coastal regions by penning- “Early or delayed menarche, infertility or compromised fertility, inability to carry a baby to term, pregnancy compromise, birth defects, congenital abnormalities, and low birth weight babies, premature delivery, leucorrhea, Pelvic Inflammatory Disease (PID), Urinary Tract Infection (UTI), abdominal discomfort, obese, disabled childbirth, sexual uninteresting (sexual problem).” So, evidence shows that illness is

prevalent among coastal women. However, the existing patriarchal social norms also increase the risk by limiting women's medical treatment facilities as in the rural areas; women are not allowed to go outside (even to visit a doctor) unaccompanied (Zaman, 2017).

Salinity poses significant challenges to the menstrual health and hygiene of women and girls in coastal areas. According to research, 92.8 percent of women and girls in these regions report adverse effects on their menstrual health and hygiene due to salinity, leading to a range of serious health issues such as rashes, fungal infections, itching in sensitive areas, increased sweating in hot climates, discomfort, and urinary tract infections (Khanam and Dina, 2020). Additionally, the intake of salty river water significantly contributes to the suffering of coastal women and girls from gynecological problems (Zaman, 2017; Khanam and Dina, 2020). Zaman (2017) found that 66 percent of coastal women experience gynecological issues as a result of consuming saline water.

Moreover, coastal regions, women and girls are also experiencing malnutrition, a condition closely tied to the decline in food availability due to reduced agricultural output. Alston (2015) points out that in situations of food scarcity, female family members (such as wives, mothers-in-law, and daughters) often consume less food than other relatives. Thus, the food shortages caused by salinity lead to heightened malnutrition risks for these women and girls.

Additionally, salinity contributes to significant mental stress for coastal women through two primary mechanisms: firstly, the responsibility of securing fresh drinking water often falls on women, who must travel long distances to collect it. This task frequently requires them to leave their children unattended at home, escalating their anxiety and mental strain (Rahman, 2009). Secondly, the skin conditions resulting from salinity exposure further aggravate their psychological distress. Shohel et al. (2011) found that 32 percent of participants in their study reported mental health issues linked to their skin diseases.

Vulnerability Analysis

The vulnerabilities of coastal women can be categorized into four distinct categories that fit under the umbrella term social vulnerability such as- i) vulnerability related to social protection, ii) vulnerability related to marriage and family, iii) financial vulnerability, and iv) vulnerability related to education and work security.

i). Vulnerability Related to Social Protection

Social protection addresses two critical issues—sexual harassment and domestic violence. Research indicates that coastal women and girls face

sexual harassment and assault when they go to distant places to collect water (Habiba et al., 2014). Furthermore, those employed in shrimp farming, a key source of income in coastal areas, experience harassment and abuse from their employers (Rahman, 2010).

In addition, the intrusion of salinity into coastal areas is also linked to an increase in domestic violence against women. The necessity for coastal women to allocate three to four hours daily for the collection of fresh drinking water (Ahmed et al., 2009) forces them to neglect household duties or educational pursuits to deal with the effects of salinity (WaterAid UK, n.d.). Additionally, salinity leads to added responsibilities like gathering fuel and fodder (Ahmed et al., 2008), further straining their ability to fulfill domestic roles. As a result, their inability to meet household expectations often leads to domestic violence from their spouses (Alston, 2015).

ii). Vulnerability Related to Marriage and Family

Salinity severely impacts coastal marriage and family structure, increasing coastal women's vulnerability and marginalizing them among marginalized people. For example, salinity creates marriage insecurity among coastal men and women; however, women are the key victim (Khanam, 2019). Khanam (2019, p. 57) shows that 91.82% of girls from a coastal district claim that "saline water-induced skin problems are responsible for their marriage insecurity." Moreover, Water Aid Bangladesh (2007 cited in Rahman, 2009 p.11) also supports the findings saying that "the skin of the adolescent girls becomes rough and unattractive due to the use of saline water. Men from outside the area do not show their interest in marrying these young girls". Besides, evidence also shows that salinity accelerates the coastal dowry rate that victimizes women miserably (Khanam, 2019).

Besides, Salinity contributes to the prevalence of child marriage among girls in coastal areas. Alston (2015) reveals that the typical age at which girls in these regions get married ranges from 12 to 17 years, with 58 percent of parents opting to take their daughters out of school in favor of early marriage. Moreover, the issue of salinity has led to an increase in households led by females (Khanam et al., 2021; Alston, 2015), which are particularly susceptible to various challenges (Alston, 2015). According to Khanam et al. (2021), unemployment driven by salinity forces men from coastal areas to migrate to nearby cities in search of work during times of scarcity. These men often end up forming new families in the cities, marrying local women and abandoning their original families in the coastal villages. As a result, these families become led by women, placing them in highly precarious conditions.

iii). Financial Vulnerability

Salinity increases financial vulnerability among coastal people in two ways, increasing poverty as well as unemployment, and in both cases, women are the direct victim. The World Bank (2015) shows that higher salinization creates a higher dependency ratio and poverty incidence than in non-saline areas by saying that “when salinity and other factors exist in most harmful levels, the poverty of coastal people rises from 8% to 56%”. In addition, Johnson (2016) shows that salinity is the key driver of poverty in the coastal Satkhira and Khulna districts. Moreover, evidence shows that the disease burden discussed earlier increases the poverty of coastal people in two ways- a) by increasing the medical care expenditure and b) by making coastal people incapable of working (Zaman, 2017). Furthermore, water and soil salinity compel coastal people to buy non-saline drinking water and fruits, vegetables, fish, meat, and other agricultural products that increase their life-leading costs and intensify poverty (Zaman, 2017).

Besides, salinity intrusion also creates unemployment problems for coastal people, both males, and females. Khan and Azad (2014) show that 52 percent of coastal inhabitants argued that salinity is the key source of joblessness. More than 50 percent of inhabitants are compelled to change their job frequently and continuously search for alternative jobs because of salinization. These poverty and unemployment tendencies among coastal males increase their dowry demand and increase domestic violence; in both cases, women are the key victims.

iv). Vulnerability Related to Education and Work Security

Vulnerabilities related to education and employment for women in coastal areas fall into three main categories: a) limited access to education, b) the heavy responsibility of household duties, and c) unequal pay. Research indicates that salinity significantly impacts the education levels of women and girls in coastal regions. Specifically, families often have to pull their daughters out of school to assist in fetching fresh water from remote locations, a task that has become increasingly challenging due to salinity (Zaman, 2017; Water Aid Bangladesh, 2018; Sharmin & Islam, 2013).

Moreover, salinity significantly increases the workload associated with the domestic responsibilities of women in coastal areas. According to Water Aid Bangladesh (2007, as cited by Rahman, 2009), it is common for women and adolescent girls in each family to be tasked with fetching fresh drinking water from far-off locations, a chore that can consume three to four hours each day. As a result, these women and girls find themselves lacking the time and energy needed for other household

activities, including looking after elders and children, cooking, bathing, and laundry.

Besides, women working as day laborers in shrimp farms in coastal areas experience unequal pay. Islam (2016) has documented that wage disparity between male and female workers in these regions is both prevalent and socially accepted. For instance, within the aquaculture sector, women earn a daily wage of BDT 240, while men receive BDT 300. This discrepancy is widely recognized and rationalized by the community as simply how things operate locally (Islam, 2016, p.16). Furthermore, female laborers face the risk of losing their jobs if they challenge or speak out against this unequal wage system (Islam, 2016).

c). Adaptation Analysis

Adaptation to salinization is a central goal for coastal development, and coastal inhabitants are often creative in adapting to emerging salinity (Rahman et al., 2019). To deal with water insecurity induced by salinity, coastal people depend on pond water (Alston, 2015) and pond-sand filter (PSF) technology that removes physical impurities (Saroar, 2015). The local NGOs help the community by installing PSF near the bank of ponds where the coastal people save rainwater throughout the rainy seasons to supply drinking water (Saroar, 2015). Besides, solar desalination-managed aquifer recharge and community-managed ponds are also contributing to adapting to water scarcity (Rahman et al., 2019). Moreover, to cope with water insecurity, women drink less water and also give training to their children to drink less water than the daily requirement. However, it causes serious health complications for the children and the women themselves (Alston, 2015).

To cope with reduced agricultural production, coastal people try to change the types of crops (except rice, they try to grow sunflower, beans, watermelon, sesame, etc.), change production techniques (planting vegetables in plastic drums, buckets, canes, plastic bottles, etc.), introduce new crops and technologies (saline tolerant rice varieties, heavier reliance on pesticides and fertilizers, rainwater harvesting) and sourcing household income from diverse activities (Alston, 2015; Saroar, 2015; Rahman et al. 2019). Moreover, to cope with salinity, many rice farmers shift to saline/ brackish shrimp farming cultivation (Saroar, 2015).

In addition to adapting to fuel scarcity, coastal women always search for alternative sources. Alston (2015) shows that 73 percent of coastal women claim the need to find new and alternative fuel sources, and also increasing the time to search for fuel is another strategy. Moreover, to adapt to poverty and unemployment problems, coastal inhabitants depend on microcredit schemes to develop alternative livelihood strategies

(Alston, 2015). Several NGOs are giving microcredit to the coastal women as they are the only eligible person to take the loan and try to do income-generating activities along with their husbands.

Moreover, women and girls are also going to garment factories (one of Bangladesh's most flourishing sectors) to engage in income-generating activities (Alston, 2015). Besides, women also engage in crafting, tailoring, and other activities that can be done close to their homes while attending to household chores (Neelormi, 2010). Women work in coastal shrimp firms as algae cleaners, catch shrimp larvae from the nearest rivers, do crab-fattening activities, and gather mussels, clams, and oysters (Rahman, 2009).

Coastal people also survive with salinity by adopting an out-migration strategy or salinization-induced migration (Rahman et al. 2019). The coastal male members go to other cities in search of work, mainly as day laborers in brickfields, rickshaw pullers, etc. (Alston, 2015). Though out-migration increases the vulnerability of coastal women and the female-headed family, they have no other options without adopting the strategy. Moreover, to cope with the problem of marriage insecurity of coastal girls, parents prefer to withdraw their girl child from academic activities and marry off them at an early age (Khanam, 2019).

Climate Governance: How Is Governance Related to The Paper?

The third objective of my paper is to pinpoint the coastal women's adaptation strategies and GO and NGO's adaptive actions against salinity intrusion that contribute to protecting their lives and livelihoods in some way. For this paper, GO adaptive actions means existing social protection or safety-net policies such as Test Relief (TR), Vulnerable- Group Development (VGD), and Food for Work (FFW) to respond to the antagonistic influences of disasters (Coirolo et al., 2013) as well as NGO's actions comprises mainly the microfinance related works. Evidence shows that the mentioned actions are enduring in the coastal districts corresponding to other parts of the country from both the GO and NGOs. However, Coirolo et al. (2013) show that the mentioned policies and actions have failed to escalate the coastal women's resilience and cover the severity of the coastal disaster impacts. The coastal districts have unique geographical characteristics as well as consist of most climate change-vulnerable areas (Kabir et al., 2016). Most significantly, coastal women are considered the most climate-victim inhabitants of the country (Alston, 2015). So, GOB should introduce context-specific attempts (social protection and social safety-net policies) to address the need of the coastal residents, especially the women, and girls, to enhance their resilience power. Evidence shows that "social-

ecological-technological systems" (Egerer et al. 2021, p.1) change can boost climate resilience if we concentrate on "Context-dependent adaptation" (Egerer et al. 2021, p.6) because, in this case, the native communities can tailor the system allowing to their context as well as by filtering through their local knowledge. In the mentioned framework, social system change includes mainly governance initiatives that showcase and experiment with sustainable solutions, more importantly, social networks, as well as knowledge exchange (Egerer et al. 2021).

Furthermore, "the Resilient City Planning Framework" proposed by Jabareen (2012, p.223) involves the concept of "urban governance" by claiming that native authorities from all countries can contribute significantly in the case of mitigation and adaptation to climate change challenges. Consequently, governance should improve indigenous capacity by producing knowledge, delivering required resources, providing institutional support, and allowing more local autonomy (Jabareen, 2012). As climate change injustice happens along with intersectionalities such as ethnicity, class, gender, and race, climate governance should pay extra attention to locally located practices that are connected to biodiversity, social action, and also public goods (Gillard, 2016) rather than conventional planning tactics and prioritizing stakeholder's expectations (Jabareen, 2012). The suggestions are also noteworthy in the sustainable development of coastal areas as well as the coastal women as here climate governance is not focused effectively and efficiently by the GO and NGOs policymakers to mitigate intersectional climate vulnerabilities along with active climate adaptation for the coastal belt of Bangladesh.

Discussions

Salinity can be termed a wicked problem because so many issues are interlinked with salinity intrusion that it has no straightforward solution. The coastal districts of Bangladesh are suffering and possibly to suffer most from salinity intrusion in the future, and women and girls are at the forefront of those sufferings as well as the noteworthy players against the battle of salinity.

a). Discussion on Risk and Vulnerabilities

i). Structural Drivers

Women's gender roles, existing social structures, and the country's cultural context are the main structural drivers of coastal women's vulnerability. For example, women are the key responsible person of the family's well-being; they are the last and feeble consumers of food and water; they are heading their households while the male members

migrate to the cities; they are struggling against the existing customs that disgrace them, they are the key victim of domestic violence, child marriage, dowry, and low educational attainment. Moreover, coastal women are also vulnerable to food and water insecurity, work burdens including care tasks, and, most significant, disease burdens both for themselves and their family members.

The root cause of women's vulnerability is their subordinated social status in our society and family, and salinity increases their subordination most compared to women from other parts of the country. For example, domestic violence, child marriage, and dowry are related to our patriarchal social structure and our mindset of men's privilege and women's disempowerment. And salinity increases the mentioned vulnerabilities by creating marriage insecurity, skin and gynecological health complexities, work burden, low educational attainment, and increased unemployment. Moreover, the patriarchal social structure restrains women from land and property rights, rights of productive assets, equal distribution of resources, and water and food security. Besides, coastal women exist at the bottom of the power ladder as they are marginal among the marginalized section. These kinds of inequality lead to environmental degradation (Jabareen, 2013), like salinity intrusion, and it can be said that the more equivalent distribution of power and resources can be the key element to change the fate of the marginalized coastal women.

The patriarchal structure, religious misconceptions, and lack of technical knowledge on climate change turn coastal women's vulnerability into the most severe and unacceptable form. For example, Alston (2015) shows that the coastal rural imams (religious leaders) believe that climate change is a curse created by women as they go out of their houses and engage themselves in academic and income-generating activities. These kinds of dominance, misconceptions, and lack of awareness also increase women's vulnerability and risk several times.

Moreover, our socialization process also contributes to increasing the risk and vulnerabilities of coastal women. For example, UNICEF (2013) reports that only 4.6 percent of men bring water for their families, but 89.6 percent of women do the same job; however, men know that fetching water is a very laborious, time-consuming, and hard task. Many men restrain themselves from water fetching because they are socialized by knowing that it is a female task and it is humiliating and demeaning to do the female task. These social norms and values also increase the risk and vulnerabilities of coastal women.

Evidence shows that the risk and impacts of salinity intrusion are unevenly distributed and socially discriminated (Alston, 2015; Rahman,

2009), and it seems that resilience resources are also unequally distributed. Moreover, negative consequences of salinity have different effects on intersectionality, like gender, religious identity, class, etc. For example, coastal Muslim women have restrictions on their movement (like they cannot visit the doctor or go outside the home without any male escort), but women from other religions do not have such obligations. So, intersectionality is one of the key elements related to coastal women's risk and vulnerability to salinity.

ii). Institutional Attempts

To mitigate the risk and vulnerability of salinity, the GO and NGOs have no gender-specific and context-specific attempts and policies that turn coastal women more marginalized. Also, at the policy level, the country has inadequate local knowledge, has no policy to develop local expertise, and often they ignore the native projections and analyses (for example, ignoring the expert and public opinion Bangladesh government is constructing a giant power station in a coastal district that is very close to world's largest mangrove forest 'Sundarban,' a UNESCO world heritage site).

iii). Discussion on Adaptation Activities

Adaptation strategies require more intensive and focused attention from the policymakers to the social as well as gendered elements of the concerned societies and communities. The social realities of Bangladesh include gender disparities in all aspects of life, such as access to media and technology, politics, power relations, norms, values, religious beliefs, governance, and institutions that determine and increase the risk and vulnerability of women, especially marginalized rural women. So, to enhance the adaptive capacity of women, we have to be more gender-sensitive (The Asia Foundation, 2012) and gender inclusive. More concretely, we have to put women and girls in the center of the adaptive activities, as Enarson (2012) suggested, from a feminist political ecology perspective. The paper agrees entirely with Enarson's (2012) view that gender disparities, environmental degradation, and women's increased risk and vulnerabilities are so closely linked that if we ignore gender risk, it will perpetuate environmental degradation as well as reduce our adaptive capacity. For example, if we fail to recognize this association, in that case, the coastal women will continue to eat and drink less and train their children to survive by drinking less. However, it has severe health effects and will continue to drop the coastal girls from academic activities. Practices like child marriage, dowry, domestic violence, marriage insecurity, malnourishment, and other health crises will continue generation after generation.

Conclusion

In Bangladesh, our social structure, as well as the gendered division of labor, highly contributes to placing women behind men in various respects, like access to education, resources, information, and social, economic, and environmental activities that consequently impede women's sustainable development. For this reason, we should pay more focus to Alston's (2015, p.174) concept of "radical adaptation" developed from Ferree's (2012 cited in Alston, 2015) concept of "radical realism." The concept allows us to put gender equality as well as human rights into the adaptation policies and practices in a transparent and obligatory way for designing any action and strategy to assist the victim community (Alston, 2015). The paper wants to narrow down the concept and say that the concept of gender equality should be centralized in the risk and vulnerability assessment, adaptation strategies as well as climate governance of salinity intrusion. Also, without doing so, we cannot break the salinity trap and cannot assist marginal women in changing their misery and ill fate.

Suggestions for A Further Study

This initial investigation highlights the conditions of women and adolescent girls in Bangladesh's coastal districts, where salinity from climate change poses severe challenges. It finds that these communities, especially women and girls, are among the nation's most disadvantaged, struggling without sustainable livelihoods. This research opens avenues for more detailed investigations into the dire circumstances faced by coastal women and girls, including an in-depth examination of the various social issues touched upon briefly here.

References

- Alston, M. (2015). *Women and Climate Change in Bangladesh*. Routledge.
- Ahsan, M. (2010). *Saline Soils of Bangladesh*. Soil Resource Development Institute (SRDI), SRMAF Project, Ministry of Agriculture. Retrieved from http://srdi.portal.gov.bd/sites/default/files/files/srdi.portal.gov.bd/publications/bc598e7a_df21_49ee_882e_0302c974015f/Soil%20salinity%20report-Nov%202010.pdf
- Alam, M. Z., et al. (2017). Effect of Salinity Intrusion on Food Crops, Livestock, and Fish Species at Kalapara Coastal Belt in Bangladesh. *Journal of Food Quality*, 2017, 1-24. <https://doi.org/10.1155/2017/2045157>
- Ahmed, A. U., et al. (2008). *Climate Change, Gender and Vulnerable Groups in Bangladesh*. Climate Change Cell, DoE, MoEF; Component 4b, CDMP, MoFDM. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/48024281.pdf>

- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2010). *Population Census 2010: Preliminary report*, BBS.
- Bagri, N. T. (2017, April 27). Bangladesh's water crisis: A story of gender. *Aljazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/features/2017/4/25/bangladeshs-water-crisis-a-story-of-gender>
- Coirolo, C., et.al. (2013). Climate Change and Social Protection in Bangladesh: Are Existing Programmes Able to Address the Impacts of Climate Change? *Development Policy Review*, 31 (S2), 074–090.
- Corcoran- Nantes, Y., & Roy, S. (2018). Gender, Climate Change, and Sustainable Development in Bangladesh. In J. McIntyre-Mills et al. (Eds.), *Balancing Individualism and Collectivism* (pp. 163- 179). Springer. DOI 10.1007/978-3-319-58014-2_8.
- Dasgupta, S. (2017, March 10). Climate change drives up river salinity in Bangladesh. *The Third Pole. Net*. Retrieved from <https://www.thethirdpole.net/en/2017/03/10/climate-change-drives-up-river-salinity-in-bangladesh/>
- Engle, N. L. (2011). Adaptive capacity and its assessment. *Global Environmental Change*, 21(2011), 647-656.
- Enarson, E. (2012). *Women Confronting Natural Disaster: From vulnerability to resilience*. Lynne Reinner Publishers.
- Egerer, M., et al. (2021). Urban change as an untapped opportunity for climate adaptation. *npj Urban Sustainability* 2021, 1- 10. Retrieved from <https://doi.org/10.1038/s42949-021-00024-y>.
- Faruque, H. S. M., & Ali, M. L. (2005). Climate change and water resources management in Bangladesh. In M. M. Q. Mirza & Q. K. Ahmad (Eds.), *Climate Change and water resources in South Asia* (pp. 231-254). CRC Press, USA.
- Global Climate Risk Index. (2020). *Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Briefing Paper*. GERMANWATCH. Retrieved from https://www.germanwatch.org/sites/default/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf
- Gobeshona. (n. d.). *Impact of salinity on women reproductive health in saline prone Rampal Upazila Bagerhat*. Gobeshona. Retrieved from <http://gobeshona.net/wp-content/uploads/2015/01/Impact-of-Salinity-on-Women-Reproductive-Health-in-Saline-Prone-Rampal-Upazila-of-Bagerhat-Bangladesh.pdf>
- Gillard, R., et al. (2016). Transformational responses to climate change: beyond a systems perspective of social change in mitigation and adaptation. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 7(2), 251-265.
- Huq, S., et al. (1998). *Vulnerability and adaptation to climate change for Bangladesh*. Springer, USA.
- Habiba, U. et al. (2014). "Salinity-Induced Livelihood Stress in Coastal Region of Bangladesh". In *Water Insecurity: A Social Dilemma (Community,*

- Environment and Disaster Risk Management*) (pp. 139-165). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. [https://doi.org/10.1108/S2040-7262\(2013\)0000013013](https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2013)0000013013)
- Islam, M. S. (2016). *Gender and Water Poverty: Salinity in Rampal and Saronkhola, Bagerhat*. The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and The Gender and Water Alliance. Retrieved from <http://genderandwater.org/en/bangladesh/gwapb-products/knowledge-development/research-report/gender-and-water-poverty-salinity-in-rampal-and-saronkhola-bagerhat>
- Jabareen, Y. (2012). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with climate change and environmental risk. *Cities*, 31 (2013), 220–229. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2012.05.004>
- Johnson, F. A., et al. (2016). Is shrimp farming a successful adaptation to salinity intrusion? A geospatial associative analysis of poverty in the populous Ganges- Brahmaputra- Meghna Delta of Bangladesh. *Sustain Science* (11), 423-439. DOI 10.1007/s11625-016-0356-6
- Khan, M. M. & Azad, M. A. K. (2014). The nexus between local politics and salinity intrusion in coastal area Bangladesh: Unveiling the development myth. *Global Journal of Sociology* 4(2), 29-40.
- Kelly, P. M. & Adger, W. N. (2009). Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and facilitating adaptation. *Climate Change* 47, 325-352.
- Khanam, D., & Dina, S. A. (2020). Water Salinity, Menstrual Health and Human Rights of Coastal Adolescent Girls of Bangladesh: A Story of Misery. *Jus Humanis Journal of International Human Rights Law: Health and Human Rights*, Lund, Sweden, (3), 69-75.
- Khanam, D. (2019). Climate Change Induced Water Salinity. Women and Marriage Insecurity: A Case Study of Bangladesh. *Jus Humanis Journal of International Human Rights Law: Climate Change and Human Rights*, Lund, Sweden, (2), 55-58.
- Khanam, D., et al. (2021). How does climate change induced salinity force the coastal people of Bangladesh to migrate and how does the migration process violate Human Rights? *Jus Humanis Journal of International Human Rights Law: Migration and Human Rights*, Lund, Sweden, (4), 68-75.
- Kabir, R., et al. (2016). Climate Change Impact: The Experience of the Coastal Areas of Bangladesh Affected by Cyclones Sidr and Aila. *Journal of Environmental and Public Health*, (2016), 1-9. <https://doi.org/10.1155/2016/9654753>
- Moumita, C., et al. (2015). Nutritional Status of Women Living at South-west Coastal Belt of Satkhira Bangladesh. *Journal of Environmental Science and Natural Resources*, 8(2), 41-46.
- Nahian, M., A., et al. (2013, March 9-13). *Women In A Changing Climate – An Analysis Of Gender Dimension Of Vulnerability In Coastal Bangladesh*, 4th International Conference on Water & Flood

- Management (ICWFM-2013), Dhaka, Bangladesh. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/303666926>
- Nahian, M. A., et al. (2018). Drinking water salinity associated health crisis in coastal Bangladesh. *Elementa: Science of the Anthropocene*, 6 (1), 1-15.
- Neelormi, S. (2010). Addressing gender issues in adaptation. In A. U. Ahmed (Ed.). *Reducing Vulnerability to Climate Change: The pioneering example of community-based adaptation* (pp. 111-127). Dhaka: Centre for Global Change and CARE Bangladesh.
- Röhr, U. (2005). Gender and Climate Change - a Forgotten Issue? *Tiempo: Climate Change Newsletter*. Retrieved from http://tiempo.sei-international.org/newswatch/xp_comment050711.htm
- Rahman, M. A. (2010). Salt is Bitter: Salinity and Livelihood in a Bangladesh Village. *The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 5(7), 317-330.
- Rahman, M. M. et al. (2019). Salinization in large river deltas: Drivers, impacts and socio-hydrological feedbacks, *Water Security*, 6 (2019), 1-8.
- Rahman, M. A. (2009). *Salt is killing us: Salinity and livelihood in a Bangladesh village* [Master's thesis in Development Studies, Lund University]. Sweden.
- Resureccion, B. P. (2013). Persistent women and environment linkages in climate change and sustainable development agendas. *Women's Stud Int Forum* 40, 33-43.
- Saroar, M. (2015). Adaptation Strategies against Salinity-Induced Vulnerability in Coastal Bangladesh. In W. Leal Filho (ed.), *Handbook of Climate Change Adaptation* (pp. 1443-1467). Verlag Berlin Heidelberg: Springer. DOI 10.1007/978-3-642-38670-1_48
- Scheelbeek, P. F. D. et al. (2017). Drinking Water Salinity and Raised Blood Pressure: Evidence from a Cohort Study in Coastal Bangladesh. *Environmental Health Perspectives*, 125(5), 1- 8. <https://doi.org/10.1289/EHP659>
- Shiva, V. (1993). The Chipko women's concept of freedom. In Mies. M and Shiva, V. (Ed.). *Ecofeminism*. (pp. 246-250). London: Zed Books.
- Sandilands, C. M. (2008). Eco/Feminism on the Edge. *Int Fem J Polit*, 10(3), 305-313.
- Shiva, V. (1995). *Staying alive: women, ecology, and survival in India*. Kali for Women.
- Shiva, V. (2009). Women and the gendered politics of food. *Philos Top*, 37(2), 17- 32.
- Shohel, T. A., et al. (2011). Effects of water salinity on degrading health status of the women in South Western rural Bangladesh. *Journal of Sociological Research Development*, 8(6), 1136-1142.
- Sarwar, G.M. (2005). *Impacts of sea level rise on the coastal Zone of Bangladesh* [Master's thesis, Masters Programme in Environmental Science, Lund University]. Sweden.

- Sharmin, Z. & Islam, M. S. (2013). *Consequences of Climate Change and Gender Vulnerability: Bangladesh Perspective*. USA: Bangladesh Development Research Center (BDRC). Retrieved from http://www.bangladeshstudies.org/files/WPS_no16.pdf
- The Asia Foundation. (2012). *A situation analysis of climate change mitigation initiatives in Bangladesh*. The Asia Foundation.
- UNISDR. (2009). *Terminology on Disaster Risk Reduction. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)*. Geneva: Switzerland.
- UNDP. (n. d.). *Gender and climate change Asia and the Pacific: Gender and disaster risk reduction*, Policy brief, Global Gender and climate alliance. <https://www.undp.org/gender-and-environment>
- UNICEF. (2013). *Better Access to Safe Drinking Water: Quality, equitable access and sustainability*. <https://www.unicef.org/bangladesh/en/better-access-safe-drinking-water>
- Vineis, P., et al. (2011). Climate change impacts on water salinity and health. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 1(1), 5-10.
- WaterAid UK. (n. d.). *Why are girls and women worst affected by a lack of clean water*. <https://www.wateraid.org/uk/the-crisis/tackling-inequality/girls-and-women>
- WaterAid Bangladesh. (2014). *Climate resilience WASH Programming in Coastal Areas of Bangladesh: An Endline Survey*, Water Aid. https://www.wateraid.org.bd/sites/g/files/jkxoof236/files/climate-resilience-wash-programming-in-coastal-areas-of-bangladesh-an-end-line-study_0.pdf
- World Bank. (2015, 7 February). *Salinity Intrusion in a Changing Climate Scenario Will Hit Coastal Bangladesh Hard* <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/17/salinity-intrusion-in-changing-climate-scenario-will-hit-coastal-bangladesh-hard>
- Zaman, F. (2017). Impact of Salinity on Poor Coastal People's Health: Evidence from two coastal villages in Bangladesh. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.)*, 62(1), 1-14.

বাংলা বাগ্ধারায় সমাজচিত্র রূপায়ণে সংস্কৃত
সাহিত্যের ভূমিকা – একটি পর্যালোচনা
(The Role of Sanskrit Literature in Illustrating the
Social Condition through Bengali Idioms- A Review)

তিতাস কুমার শীল*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। এ ভাষায় প্রচুর বাগ্ধারা রয়েছে। একধিক নির্দিষ্ট পদ একটি বাকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে যখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগ্ধারা বলে। মনের ভাব সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য বাগ্ধারার ব্যবহার হয়ে থাকে। বঙ্গব্যক্তি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা থেকেই বাগ্ধারার সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাগ্ধারা আমরা পাই যার একটা প্রধান উৎস রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য, কাব্য, পুরাণ, গল্পসাহিত্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে। এগুলো সাধারণত মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু ঘটনা বাগ্ধারা হিসেবে বাংলা ভাষায় এসেছে। কিন্তু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ এ বাগ্ধারাগুলোর উৎস জানে না, কথোপকথনের সময় অজাঞ্জেই তারা এগুলো ব্যবহার করে। আমাদের দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় জনপ্রিয় কিছু পৌরাণিক বাগ্ধারার ইতিহাস ও বর্তমান সমাজের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মূলশব্দ: সংস্কৃত সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনি, বাংলা ভাষা, বাগ্ধারা, বর্তমান সমাজ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

Abstract

Bengali language is an important language over the world. There are enormous idioms in this language. An idiom is one kind of phrase or expression which has a meaning that can't be analyzed by explaining the individual words. Idioms are used to express the thought aesthetically. The roots of many Bengali idioms can be traced from Sanskrit. There are many epics, kavyas, puranas, story literature written by Sanskrit language. Those are evolved around the events of human life. Many incidents are transmitted to idioms in Bengali language from Sanskrit. But most of the people in our society don't know the origin of the idioms, they use it spontaneously in their conversation. This article assesses usages of mythical idioms and its history of origin as well as stark connections with the daily incidents.

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: titasdu06@gmail.com

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় প্রচুর বাগ্ধারার ব্যবহার রয়েছে। এটি ভাষার বাক-প্রবাহের একটি বিশেষ ধরন। বাগ্ধারা অর্থ বিশেষ অর্থপূর্ণ কথা। বাগ্ধারার অন্য নাম বাগ্ধবিধি। সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অর্থাৎ শব্দের সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে বিশেষ ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করে তাই বাগ্ধারা। বাগ্ধারার কারণে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে, ভাষা হয়ে ওঠে আরও সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও প্রাণময়। বাগ্ধারা ভাষাকে করে গতিশীল, আকর্ষণীয় ও শুভিমধুর। ভাষাকে রসাত্তাকৰণে উপস্থাপন করা হয় বাগ্ধারার দ্বারা। সাধারণত বিখ্যাত কোনো ঘটনা থেকে জন্ম হয় বাগ্ধারার। সাধারণত কোনো সাহিত্য বা লোককাহিনির কোনো বিখ্যাত ঘটনা যদি মানুষের হন্দয় ছুঁয়ে যায় তখন মানুষ তাদের প্রতিদিনের কথা-বার্তায় সেই বিখ্যাত ঘটনাটি বারবার টেনে আনে। ফলে জন্ম নেয় শুভিমধুর বাগ্ধারার। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাগ্ধারা আমরা পাই যার উৎস উদ্বাটন করতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা হতে হয়। এদিক থেকে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার কাছে খীঁটি। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে বাংলা ভাষার বহুল প্রচলিত কিছু বাগ্ধারা নিয়ে, যেগুলোর মূল কাহিনি সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে।

অকালবোধন – অকাল শব্দের অর্থ ‘অসময়’ এবং বোধন শব্দের অর্থ জাগরণ। অর্থাৎ ‘অকালবোধন’ শব্দের অর্থ হলো অসময়ে জাগরণ। শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলা হয়। শাস্ত্রমতে, বসন্তকাল দুর্গাপূজার উপযুক্ত সময়, শরৎকাল নয়। যদিও বর্তমানে শারদীয় দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে শরৎকালে দেবতারা ঘূর্মন্ত অবস্থায় থাকেন তাই এসময় পূজার প্রকৃত সময় নয়। দেবতাদের দিন হয় মাস (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) এবং রাত্রি হয় মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ)। দেবতাদের দিনকে বলে উত্তরায়ণ আর রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে দেবতারা জেগে থাকেন, দক্ষিণায়নে ঘুমিয়ে থাকেন। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য রামচন্দ্রের দেবীপূজার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই আশ্বিন মাসে ঘুমিয়ে থাকা দেবীকে জাগাতে (বোধন) হয়েছিল। কালিকাপুরাণে আছে রামচন্দ্রের বিজয়ের জন্য শারদীয় দুর্গাপূজা করা হয়,

রামস্যানুগ্রার্থায় রাবণস্য বধায় চ।

রাত্রাবে মহাদেবী ব্রক্ষণা বোধিতা পুরা ॥

তত্প্রত্যক্ষনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।

জগাম নগরীৎ লক্ষ্মাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥

* * * *

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।

বিশেষপূজাং দুর্যায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥

কালিকাপুরাণ, ৬০/২৬-২৭, ৩২

অর্থাৎ, প্রাচীনকালে রামের অনুগ্রহে এবং রাবণকে হত্যার জন্য দেবীদুর্গা রাত্রিতে ব্রক্ষণ দ্বারা বোধিত হয়েছিলেন। তারপর মহাদেবী ঘূর্মন্ত থেকে উঠে আশ্বিনমাসে রাবণের আলয় লক্ষ্মায় গিয়েছিলেন, যেখানে রাম পূর্বেই ছিলেন। ----- লক্ষ্মের রাবণ নিহত হলে লোকপিতামহ ব্রক্ষণা নবমী তিথিতে সকল দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে দেবীদুর্গার বিশেষ পূজা করেছিলেন।

কালিকাপুরাণ অনুসারে রামচন্দ্র নিজে দেবীর পূজা করেননি, ব্রক্ষণা করেছিলেন। যাইহোক, অসময়ে দেবীকে জাগানো হয়েছিল বলেই শারদীয় দুর্গাপূজাকে ‘অকালবোধন’ বলে।

কৃতিবাসী রামায়ণেও দেবীর অকালবোধনের কথা আছে।

আমরা যখন একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করি বা কথা বলি তখন আমরা প্রায়ই এই বাগ্ধারাটি বলে থাকি। প্রত্যেকটি কাজের নির্দিষ্ট সময় আছে, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কোনো কাজ

করলে তেমন সুফল আসে না। এমতাবস্থায় কেউ যদি সময়ের পূর্বেই কোনো কাজ করে তখন সেই শরৎকালে অর্থাৎ অকালে দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ টেনে অকাল বোধন বাগ্ধারাটি ব্যবহার করা হয়।

অগন্ত্য যাত্রা-'অগন্ত্য যাত্রা' এ বাগ্ধারাটির অর্থ চিরপঞ্চান বা চিরবিদায়। চিরকালের জন্য কেউ কোনো ছান ত্যাগ করলে, আর ফিরে না আসলে সেই যাত্রাকে অগন্ত্য যাত্রা বলে। খাষি অগন্ত্য একজন প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী খাষি ছিলেন। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অগন্ত্য মুনির নাম পাওয়া যায়। পুরাণমতে, বিদ্যু পর্বত ছিল খাষি অগন্ত্যের শিষ্য। বিদ্যু পর্বতের ইচ্ছা ছিল সূর্য যেমন সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন তেমনি সূর্য তাকেও যেন প্রদক্ষিণ করেন। তাই বিদ্যুপর্বত সূর্যদেবকে তাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করার জন্য বললেন। কিন্তু সূর্যদেব রাজি হলেন না। তিনি বললেন, সৃষ্টির শুরু থেকে আমি যেমন প্রদক্ষিণ করি তেমনই করবো। বিদ্যুপর্বত তখন ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। উচ্চতা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে সূর্যের পথ রোধ হলো। সূর্যের পথ রোধ হওয়ায় দেবতারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বিদ্যু-পর্বতকে থামাতে না পেরে শেষে দেবরাজ ইন্দ্র অগন্ত্য মুনির কাছে আসলেন। মুনি সব শুনে বিদ্যু পর্বতের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বিদ্যুপর্বতকে নত হতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে আমি আজ দাক্ষিণাত্যে তৌর ম্লান করবো। যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ নত হয়ে থাকো। তাঁর কথা শুনে বিদ্যু পর্বত নত হলো। পুরাণমতে-

অগন্ত্যার্থপি সমাসাদ্য তস্যাত্তৎ দক্ষিণং দিজাঃ।

ত্বয়েবং সংস্থিতেনেব স্থাতব্যামিত্যুবাচ তত্মঃ॥

যাবদাগমনং মহ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

নো চেছাপং প্রাদাস্যামি যেন যাস্যসি সংক্ষয়ম্॥

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় শাপাত্তীতো নগোত্মঃ।

ন জগাম পুনর্বৃদ্ধিং তস্যাগমনবাঙ্গ্যা॥

সোচুপি তেনেব মার্গেণ নিবৃত্তিং ন করোতি চ।

যাবদদ্যাপি বিপ্রেন্দ্রা দক্ষিণং দিশমাত্রিতঃ॥

কন্দ-পুরাণম্, (ষষ্ঠ ভাগ), নাগর খণ্ড, ৩৩/৮০-৮৩ঃ

অর্থাৎ, মহামুনি অগন্ত্য দক্ষিণ দিক প্রাপ্ত হলেন। এবং বিদ্যু পর্বতকে বললেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইহিভাবে অবস্থান করো। এর ব্যতিক্রম যেন না হয়, ব্যতিক্রম হলে তোমাকে অভিশাপ দেব। এ অভিশাপে তুমি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। বিদ্যুপর্বত শাপভয়ে বৃদ্ধিপাপ না হয়ে মুনির আসার অপেক্ষায় রইলেন। মুনি এ পথে ফিরে না এসে দক্ষিণ দিক গমন করলেন।

অগন্ত্য মুনি আর বিদ্যুপর্বতের দিকে ফিরে আসলেন না। তিনি বিদ্যুপর্বতকে বলেছিলেন ফিরে আসবেন কিন্তু আর ফিরে আসেননি। বিদ্যুপর্বত মুনির অপেক্ষায় চিরদিন নত হয়ে রইল। তাই আমাদের সমাজের কেউ যদি চিরকালের জন্য চলে যান বা চিরদিনের জন্য কোনো ছান ত্যাগ করেন অর্থাৎ যার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা বলি ঐ ব্যক্তির অগন্ত্য যাত্রা ঘটেছে।

অশ্বি পরীক্ষা-অশ্বি পরীক্ষা শব্দের অর্থ কঠিন পরীক্ষা। 'অশ্বি পরীক্ষা' এ বাগ্ধারাটি বাংলায় এসেছে মহাকাব্য রামায়ণ থেকে। রামায়ণে লক্ষ্মার অধিপতি রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লক্ষ্মায় নিয়ে যান। সীতাকে উদ্বারের জন্য রাবণের সাথে রামের তীব্র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণ পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হন। যুদ্ধশেষে সীতা যথন রামের সম্মুখে আসেন, রাম তাঁকে অগ্রিয় বাক্য বলেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেন। তখন সীতা লক্ষ্মণকে আগুন

জ্বালাতে বলেন। রামের সম্মতিতে লক্ষণ আগুন জ্বালেন। প্রজ্বলিত অগ্নিতে সীতা প্রবেশ করেন। কিন্তু সীতা ছিলেন নির্মল, সচরিত্র, তাঁর মনে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন,

যথা মে হৃদয়ৎ নিত্যং নাপস্পতি রাঘবাং।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥
যথা মাং শুন্ধচারিত্রাং দুষ্টৎ জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১১৬/২৫-২৬।

অর্থাৎ, যখন আমার হৃদয় রাম হতে সরে যায়নি, তখন লোকসাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবে। আমার চরিত্র বিশুদ্ধ কিন্তু রামচন্দ্র আমাকে অসৎ মনে করছেন, সকল পাপ-পুণ্যের সাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন।

নির্দোষ নিষ্পাপ থাকার কারণে আগুনে সীতার কিছুই হলো না। এভাবেই দেবী সীতা কঠিন অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে সতীত্বের পরিচয় দিলেন।

সমাজে আমাদের বিভিন্ন বাধা-বিষয় পেরিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয়। জীবন সহজ, সাবলীল নয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। মানবজীবন সংগ্রামমুখ্য। তাই আমাদের কখনো কখনো তৈরি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। এ রকম অবস্থা আসলে আমরা রামায়ণের সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা টেনে এনে অগ্নি পরীক্ষা শব্দটি ব্যবহার করি। আমরা প্রায়ই বলি জীবনে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়।

কুষ্টকর্ণের নিদ্রা-এ বাগ্ধারাটির অর্থ গভীর ঘুম। কুষ্টকর্ণ রামায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের মেজ ভাই। তিনি চরিত্রবান ও দক্ষযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তৈরি ঘুম কাতুরে ব্যক্তি। কুষ্টকর্ণ ব্রহ্মার বরে ছয়মাস যাবৎ নিদ্রাময় থাকতেন। ছয়মাস পর একদিন ঘুম থেকে জাগতেন। বিরাট দানব আকৃতির চেহারা ও প্রচুর খাওয়ার কারণে তিনি সর্বদাই ছিলেন আলোচিত।

রামের সাথে রাবণের যুদ্ধ শুরু হলে এক পর্যায়ে রাবণের পরাজয় অবশ্যভাবী হয়ে পড়ে। তখন রাবণ কুষ্টকর্ণকে ঘুম থেকে জাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কুষ্টকর্ণের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। কিছুদিন মাত্র তিনি ঘুমিয়েছেন। ছয়মাসের পূর্বেতো ঘুম ভাঙ্গে না। রাক্ষসেরা থ্রথমে তাঁর দেহকে চন্দন দিয়ে লেপন করলেন, সুরভিত স্বর্ণায় মালা ও গদ্বের দ্বারা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। ধূপের গন্ধ গৃহকে আমোদিত করে তাঁর স্তুতি করা হলো। কিন্তু কুষ্টকর্ণের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গে না। তখন রাক্ষসেরা তৈরি কোলাহল সৃষ্টি করলো। যুদ্ধকাণ্ডে উল্লেখ আছে-

তৎ শৈলশ্টৈর্মুসলৈর্গদার্ভিবক্ষঁস্ত্রলে মুদ্গরমুষ্টিভিশ ।

সুখপ্রসুঙ্গং ভূবি কুষ্টকর্ণং রক্ষাংস্যুদ্ধাণি তদা নিজঘনৎ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৬০/৮০।

অর্থাৎ রাক্ষসেরা উপরে নেওয়া পাহাড়ের চূড়া, মুষল, গদা, মুগ্র এবং মুষ্টি দ্বারা ঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন কুষ্টকর্ণের বুকের ওপর আঘাত করতে লাগলো।

কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। রাক্ষসেরা কুষ্টকর্ণকে জাগানোর জন্য শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলো, বড় বড় কাঠ দিয়ে তাকে আঘাত করলো, কানের ভিতর জল ঢেলে দেওয়া হলো, চুল টানা হলো, কানে কামড়ানো হলো কিন্তু তাতেও কুষ্টকর্ণকে জাগানো গেল না। পরিশেষে অসংখ্য হাতি তাঁর দেহের ওপর উঠিয়ে দিলে কুষ্টকর্ণের ঘুম ভাঙ্গলো। রামায়ণে উল্লেখ আছে-

বারণানাং সহস্রং শরীরেহ্স্য প্রধাবিতম্ ।

কুস্তকর্ণসন্দা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যত ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৬০/৫৫০

অর্থাৎ, তারপর হাজার হাতী তাঁর দেহের ওপর চালিয়ে দিলে কুস্তকর্ণ একটু জেগে কিছুটা স্পর্শসূখ অনুভব করলেন।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে অলস প্রকৃতির। খুব ঘুম কাতুরে। কাজে-কর্মে তেমন আগ্রহ নেই। সময় পেলে ঘুমিয়ে নেয়। স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষের যতটুকু ঘুমের প্রয়োজন তাঁর থেকে তাঁরা অনেক বেশি ঘুমায়। অতিরিক্ত ঘুমের মধ্যে তাঁরা আনন্দ খুঁজে পায়। সমাজে এ ধরনের মানুষ দেখলে তাঁকে কুস্তকর্ণের সাথে তুলনা দিয়ে বলে থাকি এ যেন কুস্তকর্ণের নিদ্রা।

কুরঞ্জেত্র—এ বাগ্ধারাটির অর্থ প্রচণ্ড যুদ্ধ। কুরঞ্জেত্র ছিল কৌরব ও পাঞ্চবদ্দের যুদ্ধভূমি। মহাভারত থেকে আমরা কুরু ও পাঞ্চবদ্দের কথা জানতে পারি। কুরু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা এবং কৌরবদ্দের পূর্বপুরুষ। কুরু খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কুরুরাজ কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষেত্র কুরঞ্জেত্র নামে পরিচিত হয়। কুরুর নাম অনুসারে বৎশের নাম হয় কৌরব বৎশ। এ বৎশের দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণু। ধৃতরাষ্ট্রের বংশধররা কৌরব ও পাঞ্চবদ্দের বংশধররা পাঞ্চব নামে পরিচিত। কুরঞ্জেত্র ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও তপস্যা করার স্থান। এজন্য এটি ‘ধর্মক্ষেত্র’ নামেও পরিচিত। গীতার আছে—

ধর্মক্ষেত্রে কুরঞ্জেত্রে সমবেতা যুবৎসবঃ ।
মামকাঃ পাঞ্চবাষ্টেব কিমকুর্বত সংজ্ঞয় ॥ গীতা - ১/১

অর্থাৎ, হে সংজ্ঞয়, ধর্মক্ষেত্র কুরঞ্জেত্রে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়ে আমার পুত্রগণ ও পাঞ্চব পুত্রগণ কী করল?

এখানে দেখা যাচ্ছে, কুরঞ্জেত্রকে ধর্মক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ কুরঞ্জেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীমত্তগবদ্ধীতার বাণী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু কুরঞ্জেত্র স্থানটি সুপরিচিত হয়েছে যুদ্ধের জন্য। মহাভারতে কৌরব ও পাঞ্চবদ্দের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল এ কুরঞ্জেত্রে। আঠার দিন ব্যাপী এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে বহু যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। মহাভারতে আছে—

শুণ্যে পৃথিবী সর্বা বালবৃদ্ধাবশেষিতা ।
নিরশ্বপুরমেবাসীদ্রিথকুঞ্জরবর্জিতা ॥
যাবত্পতি সূর্যে জ্যুষীপস্য মণ্ডলম् ।
তাবদেব সমাবৃত্তং বলং পার্থিবসন্তম্ ॥
মহাভারত, ভৌগোপর্ব, ১/৭-৮

অর্থাৎ, সেই সময় শুধুমাত্র বালক, বৃদ্ধ ও ক্রীলোক গ্রহে অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু অশ্য ও সক্ষম পুরুষ, কিংবা বৰ্থ ও হস্তী গ্রহে ছিল না; সুতরাঙ পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সূর্য এই জ্যুষীপের যতটা স্থান উত্তপ্ত করে, তত স্থান হতে সৈন্য এসেছিল।

এ ভয়নক যুদ্ধের তীব্রতা এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে উভয়পক্ষের মাত্র অল্প কয়েকজন বেঁচে ছিলেন। আমাদের সমাজে দুই বা ততোধিক পরিবার, গোষ্ঠী, পাড়া বা গ্রামের মধ্যে যখন ভীষণ মারামারি বা ঝগড়া শুরু হয় তখন আমরা এ ব্যাপক ঝগড়াকে কুরঞ্জেত্রের যুদ্ধের কথা মনে করে কুরঞ্জেত্র শুরু হয়েছে বলে থাকি।

কলিকাল—এ বাগ্ধারার অর্থ হচ্ছে অনাচারের কাল। বাংলা ভাষায় কলিকাল খুবই জনপ্রিয় একটি শব্দ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যুগ চারাটি – সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি। “সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর

ও কলিয়গের পরিমাণ = ৮৩২০০০০ বছর। সত্যযুগ = ১৭২৮০০০ বছর। ত্রেতা = ১২৯৬০০০ বছর, দ্বাপর = ৮৬৪০০০ বছর, কলি = ৮৩২০০০ বছর।”^১

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যযুগে কেউ পাপ কর্ম করতো না। সকলে সত্য কথা বলতো। অনাচার, ব্যভিচারে কেউ লিপ্ত হতো না। যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ধর্মীয় কার্যকলাপে মানুষ ব্যস্ত থাকতো। সমাজে কোনো অশান্তি ছিল না। সকল মানুষ ছিল ব্যাধিশূন্য। সমাজে ধনী-দরিদ্রের কোনো বৈষম্য ছিল না। ত্রেতাযুগে ধর্ম এক পাদ করে বেদের নিয়ম কানুন থেকে সরে এসেছে। এসময় সমাজে সামান্য চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ ও কপটতা দেখা দিয়েছিল। এযুগে পুণ্য তিন ভাগ, পাপ এক ভাগ। দ্বাপর যুগে সমাজে অধর্মের কাজ বেশ ছিল। এসময় পুণ্য অর্ধেক, পাপ অর্ধেক। চারযুগের শেষ হচ্ছে কলিযুগ। এসময় অধর্মের আধিক্য থাকবে। পুণ্য হবে এক ভাগ এবং পাপ হবে তিন ভাগ। সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেবে। পুরাণমতে, এ সময় সমাজ থেকে বেদবিহিত কার্যকলাপ করে যাবে। ধর্মের বিধিবিধান সমাজে তেমন প্রতিফলিত হবে না। এ সময় মানুষ হয়ে উঠবে তপস্যাইন, মিথ্যার বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ হয়ে উঠবে। রাজনীতি হয়ে উঠবে জটিল, শাসক শ্রেণি হয়ে উঠবে দুষ্টপ্রকৃতির, ধনলোভী। ফলে সমাজে খারাপ মানুষের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, অসৎ মানুষের জয়জয়কার থাকবে সর্বত্র। সমাজে যার ধন থাকবে সেই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,

যো যো দদাতি বহুলং স স্বামী তদা নৃণাম।

ঘামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজন্মন্দা ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬/ ১/১৯^২

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যে বেশি পরিমাণে অর্ধ প্রদান করবে, সেই ব্যক্তিই তার প্রভু হবে।

প্রভুত্বের কারণ সম্বন্ধ হবে না এবং ভালো বংশে জন্মাত্ত্বহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রভুত্বের কারণ হবে না।

কলিকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে পুরাণে আরও বলা হয়েছে, কলিকালে নারীরা বেচ্ছাচারিণী হবে, পুরুষেরা অন্যায়ভাবে অর্থ আয় করবে। এসময় মানুষের মধ্যে কোনো ত্যাগ থাকবে না। মানুষ শুধু নিজের স্বার্থেই দেখবে। এসময় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে। মাতা-পিতাসহ সমাজের বর্যোজ্যস্থিতিদের মানুষ সম্মান করবে না। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা তেমন থাকবে না। সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। মানুষ হয়ে উঠবে আত্ম-অংহকারী। পুরাণে আছে,

বিত্তেন ভবিতা পুঁসাং স্বল্পেনাচ্যমদঃ কলৌ।

ত্রীণাং রূপমদচৈব কেশেরেব ভবিষ্যতি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬/ ১/ ১৬^৩

অর্থাৎ, কলিকালে মানুষ অল্প সম্পদের অধিকারী হয়েই অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করবে, ত্রীণণ কেবল কেশের দ্বারা নিজেদেরকে খুব সুন্দরী মনে করবে।

মনুসংহিতায় কলিকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এসময় সমাজে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের পাশাপাশি আয়ুক্ষালও করে যাবে। মনুসংহিতায় আছে—

অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থাশ্তুর্বৰ্ষতায়ুষঃ।

কৃতে ত্রেতান্দিষ্ম হ্যেষামায় হ্রস্তি পাদশঃ॥ ১/৮৩^৪

অর্থাৎ, সত্যযুগে মানুষ রোগশূন্য ছিল, সকলের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হতো। প্রত্যেকেই চারশত বছর বেঁচে থাকতো। ত্রেতাসহ পরের তিন যুগে মানুষের আয়ুর পরিমাণ পর্যায়ক্রমে একশ বছর করে করে যেতে লাগলো।

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের দিকে তাকালে দেখি চারদিক শুধু অরাজকতা, হিংসা, বিদেশ, হানাহানি প্রভৃতি। দুর্বলিতে পুরো সমাজ ছেঁয়ে গেছে। সমাজে যোগ্যতা, মেধার মূল্যায়ন তেমন নেই। যাদের হাতে অর্থ আছে সাধারণত সমাজের নীতি-নির্ধারক তারাই। অর্থই হচ্ছে

সমাজের মূল। যাদের কাছে অর্থ আছে, তারাই সমাজের প্রধান। তাদের যদি অন্য কোনো যোগ্যতা নাও থাকে তাহলেও সমাজের মানুষ তাদের মূল্যায়ন করে। সমাজে সৎ শিক্ষিত, মার্জিত ও রঞ্চিবোধ সম্পন্ন মানুষদের মূল্যায়ন তেমন নেই। চারদিকে এ সব বিশ্বজ্ঞল পরিবেশ, অরাজকতা দেখেই আমরা বলে থাকি ঘোর কলিকাল চলছে।

কংস মামা— কংস মামা এ বাগ্ধারাটির অর্থ হলো নির্মম আত্মায়। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে কংস ছিলেন মথুরার রাজা উত্তসেনের পুত্র। কংস ছিলেন ভোজবংশীয় রাজা। তিনি পিতা উত্তসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী ও দুষ্ট প্রকৃতির রাজা। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কংসের বোনের নাম ছিল দেবকী। দেবকীর সাথে বসুদেবের বিবাহ হয়। তাঁদের বিবাহের পর কংস সারথি হয়ে রথ চালনা করেছিলেন। সে সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পান,

পথি প্রভাহিণং কংসমাভায্যাহাশরীরবাক্ ।
অস্যাস্ত্রমষ্টমো গভো হস্তা যাঃ বহস্ত্রবুধ ॥
শ্রীমঙ্গবতম্, দশম ক্ষক, ১/৩৪।

অর্থাৎ, পথিমধ্যে কংসকে সমোধন করে দৈববাণী হলো—হে মূর্খ, তুমি যাঁকে বহন করছো, তাঁর অষ্টম গভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে।

একথা শুনে কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বসুদেব বললেন যে, দেবকীকে আপনি বধ করবেন না। তাঁর গভে যে সব সন্তান উৎপন্ন হবে সবই আপনার হাতে তুলে দেব। এ কথা শুনে কংস দেবকীকে হত্যা না করে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটক করে রাখলেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় দেবকী ও বসুদেবের পরপর ছয়টি সন্তানকে কংস হত্যা করেন। আর সপ্তম সন্তানকে দেবকীর গর্ভ থেকে প্রতিস্থাপন করা হয় গোকুলে বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গভে। তাঁর নাম রাখা হয় বলরাম। ভদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গভে অষ্টম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তাঁর নাম রাখা হয় কৃষ্ণ। বসুদেব কারাগার হতে বের হয়ে কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দের স্ত্রী যশোদার ঘরে রেখে আসেন। ঐদিন যশোদার ঘরে যোগমায়া রূপে জন্মাই হয়ে কারাগারে আসেন। যোগমায়ার প্রভাবে কারারক্ষীরা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে এই সন্তান পরিবর্তনে কোনো সমস্যা হয়নি। পরদিন কংস কন্যাকে দেবকীর নিকট থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসলেন। কংস সদ্যোজাত কন্যাকে পাথরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু যোগমায়া আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান এবং বলেন হে কংস, তোমাকে যে হত্যা করবে সে গোকুলে বড় হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। পৃতনারাক্ষসীসহ অনেক চর পাঠান কৃষ্ণকে হত্যার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ সকল চরকে হত্যা করেন। তারপর এক মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে কৃষ্ণ তাঁর অত্যাচারী মামা কংসকে হত্যা করেন।

কংস ছিলেন কৃষ্ণের আপন মামা। মামা হয়ে বোন দেবকীর পরপর ছয়টি পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছেন। কৃষ্ণকে হত্যারও অনেক চেষ্টা করেছেন। একজন মামা কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা কংস-শ্রীকৃষ্ণের কাহিনি পড়লে বোঝা যায়। কংস যে আচরণ করেছে সেটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সমাজে এরকম নির্দয় ও নির্মম আত্মায় অনেক দেখা যায়। যারা নিজেদের স্বার্থে নিকট আত্মাদের সাথে জঘন্য আচরণ করে থাকেন। এ রকম আত্মাদের আমরা ‘কংস মামা’ হিসেবে অভিহিত করি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মামা কংসের জঘন্য আচরণের জন্যই কংস ইতিহাসে ঘৃণ্য ব্যক্তি।

ঘরের শক্র বিভীষণ—এটি একটি জনপ্রিয় বাগ্ধারা। নিজের কাছের মানুষের মাধ্যমে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বোঝাতে ‘ঘরের শক্র বিভীষণ’ বাগ্ধারাটির ব্যবহার হয়।

বাল্যকী রচিত মহাকাব্য রামায়ণে বিভীষণ ছিলেন গুরুত্পূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন রাবণের ছেট ভাই। লক্ষ্মার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি রামের পত্নী সীতা দেবীকে বন্দী করেছিলেন। সীতাকে উদ্ধারের জন্য অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম বানর সেনার সাহায্যে লক্ষ্মায় অভিযান পরিচালনা করেন। বিভীষণ ছিলেন মহৎ মনের অধিকারী এবং ধার্মিক। তিনি ছিলেন সৎ, চরিত্রবান। তিনি রাবণের সীতা হরণের কাজটিকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি রামের কাছে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। সীতাকে ফিরিয়ে না দিলে লক্ষ্মার ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে রাবণকে পূর্বাভাস দেন। তিনি বলেন,

বিনশ্যেদি পুরী লক্ষ্ম শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী ন স্বং যদি দীয়তে ॥
প্রসাদয়ে ত্বং বন্ধুতাং কুরুম্ব বচনং মম ।
হিতং তথ্যং ত্বহং ক্রমি দীয়তামস্য মৈথিলী ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৯/১৯-২০

অর্থাৎ, আপনি যদি রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে ফিরিয়ে না দেন, তাহলে লক্ষ্ম নগরী বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাক্ষসেরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি সব সময় আপনার শুভকামনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আপনাকে আমি কল্যাণকর কথা বলছি। আমার কথা শুনুন এবং সীতাকে আপনি রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দিন।

বিভীষণের কথাগুলি ছিল যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। কিন্তু রাবণ বিভীষণের কথা শুনলেন না। বরং বিভীষণকে উদ্দেশ করে কঁটুকি করে বললেন,

নাহির্নান্যানি শক্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ ।
যোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাঙ্গ ভগতযো নো ভয়াবহাঃ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৭০

অর্থাৎ, আগুন বা অক্ষশক্তি আমাদের কাছে ভয়ের কারণ নয়, এমনকি ভীষণ পাশাও ভয়ের কারণ নয়। স্বার্থাঙ্গ আত্মায়নজনই আমাদের ভয়ের কারণ।

তখন বিভীষণ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষে যোগদান করলেন এবং রাজ্যের নানারকম গোপন তথ্যাদি ফাঁস করে দিলেন। রাম রাক্ষসদের শক্তি সম্পর্কে বিভীষণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১৯/৭১

অর্থাৎ, রাক্ষসদের শক্তি কেমন সে সম্পর্কে আমাকে বলুন।

বিভীষণ লক্ষ্মায় রাবণের সৈন্য সংখ্যা, কুস্তকর্ণের শক্তি, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে রামকে অভিহিত করেছিলেন। তারপর রাম ও রাবণের যুদ্ধ হলে রাবণ পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হন।

প্রকৃতপক্ষে বিভীষণ সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকলেও নিজের পরিবারের সাথে শক্রের মতো আচরণ করেছিলেন। বর্তমান সমাজে আত্মায়-স্বজন কিংবা কাছের মানুষের থেকে শক্রতামূলক কোনো ব্যবহার পেলে আমরা বলি ঘরের শক্র বিভীষণ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও আমরা দেখি নিজের দলের কেউ অন্য দলের হয়ে কাজ করলে বা নিজ দলের গোপন তথ্যাদি বিপক্ষ দলের হাতে তুলে দিলে তখন আমরা তাকে ঘরের শক্র বিভীষণ বলে আখ্যায়িত করি।

দাতা কর্ণ-'দাতা কর্ণ' এ বাগ্ধারাটি অনেক দানশীল ব্যক্তিকে বোঝায়। কর্ণ মহাভারতের একজন বিখ্যাত বীর হিসেবে পরিচিত। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চ দুই ভাই। পাঞ্চ দুই স্ত্রী ছিল কুণ্ঠী ও মাদ্রী। কুণ্ঠীর গর্ভে জন্মহাহণ করেন পঞ্চপাওব-এর তিনি পাওব যুধিষ্ঠির, ভীম ও

অর্জুন। কৰ্ণ ছিলেন কুষ্টীর সন্তান। কৰ্ণ কুষ্টীর কুমারী অবস্থায় সূর্যের ওরসে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় কর্ণের কানে ও গলায় ছিল ‘কবচ-কুণ্ডল’। এ কবচ-কুণ্ডলের কারণে তিনি ছিলেন অপরাজিত। কলঙ্কের ভয়ে কুষ্টী কর্ণকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দেন। সৃতবৎশের এক দম্পত্তী কর্ণকে পাত্র থেকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করেন। অতএব কৰ্ণ ছিলেন পাঞ্চবদের বড় ভাই। যদিও কৰ্ণ এসব ব্যাপার জানতেন না। তবে পাঞ্চবদের বড় ভাই হলেও কৰ্ণ ছিলেন দুর্যোধনের বন্ধু। কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজ ভাই পাঞ্চবদের পক্ষ না নিয়ে কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কৌরবদের প্রধান দুর্যোধন একবার বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই যজ্ঞশেষে কৰ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অর্জুনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি অন্যের দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাবেন না।

তমবীতদা কৰ্ণঃ শৃঙ্গ মে রাজকুঞ্জেঃ।
পাদো না ধাবয়ে তাবদ্যাবন্ন নিহতেছৰ্জুনঃ ॥
কীলালজং ন খাদেয়ং চরিয়ে চাসুরুতম্ ।
নাস্তিতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিং ॥

মহাভারত, বনপর্ব, ২১২/১৫-১৬

অর্থাৎ, কৰ্ণ বললেন – রাজশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোনো, যে পর্যন্ত অর্জুনকে হত্যা না করা হবে, সে পর্যন্ত আমি অন্য লোক দ্বারা পাদদহ্য হোত করাবো না। এবং মাংস খাবো না, মদ পান করবো না, আর যে কোনো ব্যক্তি যে প্রার্থনা করুন না কেন তাকে তাই দেব।

এ ব্রত পালনকালে কর্ণের দানের ব্যাপারে যাচাই করতে ইন্দ্র এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অর্জুনের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসেছিলেন। তিনি কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল চেয়েছিলেন। অবশ্য পূর্বে পিতা সূর্য কর্ণকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র পাঞ্চবদের মঙ্গলের জন্য তোমার কবচ ও কুণ্ডল হরণ করার ইচ্ছায় তোমার নিকট আসবেন। কিন্তু তুমি এটি দিওনা। তিনি বলেছিলেন,

তচ্যে প্রাচ্যমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া ।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্বি তে পরমঃ ॥

মহাভারত, বনপর্ব, ২৫৪/১৩

অর্থাৎ তিনি (ইন্দ্র) এসে তোমার কাছে কবচ ও কুণ্ডল চাইলে তুমি দিওনা, তুমি শক্তি অনুসারে তাঁর বিশেষ অনুনয় করিও, এতেই তোমার মঙ্গল হবে।

কিন্তু কৰ্ণ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু তিনি বলেছিলেন ব্রতকালীন সময়ে যে যা চাইবে তাকে তাই দেবেন। তাই ইন্দ্র কবচ ও কুণ্ডল চাইলে তিনি তা দিয়েছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে—

তত্ত্বিক্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাভিত্বেবদ্বৰ্জ প্রদদৌ বাসবায় ।
তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণাভ্যাং কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥

মহাভারত, বনপর্ব ২৬৪/৩৬

অর্থাৎ, সূতপুত্র নিজ শরীর হতে ছেদন করে দিয়ে কবচটি আর্দ্র অবস্থায় ইন্দ্রকে দিলেন এবং কর্ণযুগল হতে ছেদন করে কুণ্ডল দুটিও তাঁকে দান করলেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে কৰ্ণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে নিজের শরীর কেটে রক্ষা কবচ দান করেছিলেন ইন্দ্রকে। নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি সত্য রক্ষার থেকে পিছপা হননি। সেজন্য সমাজে যারা দান করেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন, এ ধরনের মানুষদেরকে আমরা বলি ‘দাতা কৰ্ণ’। তবে দাতা কৰ্ণ এ বাগ্ধারাটি অনেক সময় ব্যঙ্গ করেও বলা হয়ে থাকে। সমাজে যখন কেউ নিজেকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে অন্যদের সাহায্য করেন বা অনেক দান করেন তখন তাকে ব্যঙ্গ করে ‘দাতা কৰ্ণ’ বলা হয়।

দক্ষযজ্ঞ-'দক্ষযজ্ঞ' এ বাগ্ধারাটির অর্থ চরম গঙগোল বা যে কোনো কর্মজ্ঞে খুব খারাপ অবস্থা। পুরাণ অনুসারে দক্ষযজ্ঞ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। দক্ষ হলেন ব্রহ্মার পুত্র। দক্ষের কন্যা ছিলেন সতী এবং জামাতা শিব। একদা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। তিনি ঐ যজ্ঞে সমস্ত দেব-দেবীকে নিমত্ত্বণ দিয়েছিলেন, তাঁর নিমত্ত্বণ পেয়ে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দধীচি, বামদেবসহ বহু মুনিখণ্ডি উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে নিমত্ত্বণ দেননি। তিনি জামাতা শিবকে মোটেই পছন্দ করতেন না। শিব ভূত, প্রেত নিয়ে থাকতেন, এছাড়া আরও অনেক কারণে দক্ষ জামাতা শিবকে এ যজ্ঞে নিমত্ত্বণ জানাননি। কিন্তু নিমত্ত্বণ না পেয়েও সতী সেই যজ্ঞে হাজির হয়েছিলেন। তখন রাজা দক্ষ কন্যা সতীকে যজ্ঞে আগত অতিথিবন্দের সামনে অপমান করেন এবং তার স্বামী শিব সমন্বে নানা রকম কঁটুক্তি করেন। সতী স্বামী শিবকে খুব ভালোবাসতেন। স্বামীকে নিয়ে কঁটুক্তি করায় সতী নিজেকে অপমানিত মনে করেন এবং আত্মবিসর্জন দেন। সতীর আত্মান্তরি খবর শুনে শিব ব্যাপক ঝুঁতি হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করলেন এবং সবকিছু তচ্ছন্দ করে ফেললেন। পুরাণে আছে,

আধাৰস্তি প্ৰথাৰস্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ ।
চৰ্ণ্যন্তে যজ্ঞপ্রাণি যাগস্যায়তানি চ ॥
শীৰ্ঘমাণানি দ্র্শ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাঃ ।
দিব্যান্নপানভক্ষ্যণাং রাশ্যঃ পৰ্বতোপমাঃ ॥
ক্ষীরনদ্যন্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দমাঃ ।
মধুমাণোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশৰ্বরবালুকাঃ ॥
ষড়ৱসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ ।
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যণি বিবিধানি চ ॥
পানকানি চ দিব্যানি লেহং চোষ্যৎ তথাপরে ।
ভুংতে বিবিধেৰ্বিভেৰ্বিলুষ্ঠতি ক্ষিপত্তি চ ॥

বায়ুপুরাণ, ৩০ / ১৪৯-১৫৩

অর্থাৎ, তারা দলে দলে বায়ুর বেগে দৌড়াতে এবং আফ্শালন করতে লাগলো। সব যজ্ঞের পাত্র ধৰ্মস করে ফেললো, যজ্ঞের ঘর নষ্ট করলো। আকাশে যেমন তারা অতিশীর্ণ দেখায়, তেমনি যজ্ঞস্তল অতিশীর্ণ হয়ে উঠল। তারা দিব্য পৰ্বতসমান অন্ন ও পানীয়-রাশি, ক্ষীর, ঘি, পায়স, মধু ও মধোদক, জল, খণ্ড ও শৰ্বরাজুপ বালুকারাশি, ষড়ৱসবাহিনী অসংখ্য গুড়কুল্যা, অসমান মাংসের সূত্প এবং অন্যান্য নানারকম ভক্ষ্য, লেহ, চূম্য প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলেন এবং চারদিক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

পুরাণ আলোচনা করলেই দেখা যায়, দক্ষের বিশাল আয়োজন শিব তাঁর বাহিনী নিয়ে পুরোপুরি লঙ্ঘণ্ড করে ফেলেছিলেন। আমাদের সমাজে তেমনি কোনো বিশাল আয়োজন যখন সঠিকভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, কিংবা বিশাল গঙগোল তৈরি হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি তচ্ছন্দ হয়ে যায়। তখন আমরা এ ধরনের ঘটনাকে 'দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার' বলে অভিহিত করি।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির-এ বাগ্ধারাটির অর্থ অত্যন্ত ধার্মিক। যুধিষ্ঠির মহাভারতের একটি অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সবার বড়। তাঁর মায়ের নাম কুন্তী ও পিতার নাম ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠিরের জন্ম নিয়ে এক কাহিনি আছে। একবার কুন্তী মহার্বি দুর্বাসাকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট করেন। দুর্বাসা তাঁকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন এবং বলেন এ মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে দেবতাকে শ্রবণ করবেন সেই দেবতা তার নিকট এসে মিলিত হবেন এবং কুন্তী পুত্র সন্তানের জননী হবেন। পরে কুন্তীর সাথে পাণ্ডুর বিয়ে হয় কিন্তু পাণ্ডু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন।

তাই কুষ্টী পাঞ্চর পরামর্শে ধর্মকে আহ্বান করেন। ধর্মের উরসে কুষ্টীর গর্তে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্টীর প্রসবকালে দৈববাণীতে বলা হয়েছে,

এম ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্যাং ভবিষ্যতি ॥
যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতঃ পাঞ্চঃ প্রথমজঃ সৃতঃ ।
ভবিতা প্রথিতো রাজা ত্রিষ্মু লোকেশু বিশ্রতঃ ॥

মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৭/১০-১১»

অর্থাৎ, এ ছেলেটি ধার্মিকদের মধ্যে সেৱা, মানুষের মধ্যে প্রধান, তেজশালী, সত্যবাদী এবং পথবীর রাজা হবে। পাঞ্চর এ প্রথম ছেলের নাম যুধিষ্ঠির হবে। সে ত্রিলোকের বিখ্যাত রাজা হবে।

প্রকৃতপক্ষে দৈববাণী অনুসারে যুধিষ্ঠির ছিলেন ধার্মিক, ক্ষমাবান, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। ধর্মের উরসে জন্ম বলে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলা হয়। তিনি মহাভারতের প্রধান পুরুষ ও নায়ক। মহাভারতে আমরা দেখি কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলেন। শর্ত ছিল যারা খেলার পরাজিত হবেন তাঁদের বার বছর বনে বাস করতে হবে আর এক বছর থাকতে হবে অঙ্গাতবাসে। শর্তানুসারে পাঞ্চবগণ দ্বৌপদীকে নিয়ে বনবাসী হলেন। বনবাসকালে দ্বৌপদী ও ভীম যুধিষ্ঠিরকে অনেক কঢ়িত করেন। দ্বৌপদী ও ভীম বিভিন্ন কথার দ্বারা ধর্মপুত্রকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করেন। ভীম শর্ত ভঙ্গ করে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলেন। ভীমের কথা থেকে বোৱা যায়, রাজনীতিতে এসব শর্তের কোনো মূল্য নেই। এ জগতে ধর্ম, কোমলতা, দয়া, সরলতা দ্বারা কখনও সম্পদ অর্জন হয় না। ক্ষমতা দখল করতে গেলে শর্তাই অন্যতম পথ। ভীম বলেন—

ন হি কেবলধর্ম্মাত্মা পৃথিবীং জাতু কচ্ছন ।
পার্থিবো ব্যজয়দ্রাজন ! ন ভৃতিং ন পুনঃ শ্রিয়ম ॥
জিহ্বাং দত্তা বহুনাং হি ক্ষুদ্রাগাং লুক্ষিতেসাম ।
নিকৃত্যা লভতে রাজ্যমাহারমিব শল্যকঃ ॥

মহাভারত, বনপর্ব, ২৯/৫৮-৫৯»

অর্থাৎ, কোনো রাজা কখনো শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশ, সম্পদ ও রাজলক্ষ্মীকে জয় করতে পারেননি। শজাকুর যেমন মধুমক্ষিকাগণের বসবার জন্য নিজ জিহ্বাটাকে বের করে দেয় এবং পরে শর্তাকারে সেই মধুমক্ষিকাকে থেঁয়ে ফেলে, রাজাও তেমনি প্রথমে জিহ্বা দ্বারা কোনো শপথ নিয়ে পরে শর্তাকারে বহু ক্ষুদ্র লোকের রাজ্য দখল করে থাকেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠির ধীর, ছিরভাবে সব কথা শোনেন এবং প্রত্যুত্তর দেন। তিনি শর্ত পালন করায় দৃঢ় ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্ম থেকে মোটেই বিচ্যুত হননি। ক্রুদ্ধ দ্বৌপদীর বক্ষব্য থেকে জানা যায়, যুধিষ্ঠির সত্য বা ধর্ম রক্ষার স্বার্থে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। দ্বৌপদী বলেন,

ভীমসেনার্জুনো চেমৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ ।
ত্যজেষ্ট্বিমিতি মে বুদ্ধিন্ত তু ধর্মং পরিত্যজেঃ ॥ মহাভারত, বনপর্ব, ২৬/৭»

অর্থাৎ, আমি মনে করি যে, আমার সাথে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে আপনি ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু ধর্মকে নয়।

তবে একবার একটু কৌশলে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাঞ্চবরা দেখলেন দোগাচার্যের পাতন না ঘটলে যুদ্ধে জয় লাভ সম্ভব নয়। তখন তাঁকে বধ করার জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। কৃষ্ণ বললেন, দ্বৌপুত্র অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ যদি তাঁকে শোনানো যায় তবেই তিনি যুদ্ধ করবেন না। তারপর অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে

শোনালে তিনি বিশ্বাস করেননি। দ্রোণ বলেছিলেন যদি যুধিষ্ঠির বলেন তাহলে তিনি বিশ্বাস করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির তখন উচ্চস্থরে বলেছিলেন,

অশ্বথামা হত ইতি শব্দমুচ্চেকার হ।
অব্যক্তমবীদ্রাজন! হতঃ কুঁজের ইত্যুত ॥

মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১৬৪/৪৫

অর্থাৎ, তাই উচ্চস্থরে বললেন যে, অশ্বথামা হত আর আন্তে বললেন অশ্বথামা নামে এক হাতি মারা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে অশ্বথামা নামে একটি হাতি মারা গিয়েছিল। যুধিষ্ঠির সত্যবাদিতা অঙ্গুগি রাখার জন্য মনুষ্যের বলেছিলেন ইতি গজ। যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রোণ অন্ত ত্যাগ করেন এবং ধৃষ্টদ্যন্তের হাতে নিহত হন। এখানে দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতার প্রতি গুরু দ্রোণের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুধিষ্ঠির ছিলেন এক আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন সদাচারী, ধৈর্যশীল ও সত্যবাদী। মিথ্যা কথা বলা ছিল তাঁর স্বভাব-বিকৃতি। গভীর সংকটে পড়েও তিনি সত্য বা ধর্ম ত্যাগ করেননি। মহাভারতে এরকম বহু উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজে কেউ যদি সত্যবাদী, দয়াবান, ত্যাগী অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা তাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের বলি। যদিও সমাজে এরকম লোক নেই বললেই চলে। তাই কোনো ঘটনায় কেউ যদি সত্যকথা, স্পষ্ট কথা বলে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গার্থে এই বাগ্ধারাটি ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চপাণ্ডব-বিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাব্য ‘মহাভারত’ থেকে আমরা ‘পঞ্চপাণ্ডব’ এর কথা জানতে পারি। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর পুত্র বলে এদের পাণ্ডব বলা হয়, আর পাঁচ জন বলে এঁদের পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। এ পাঁচ ভাই ছিলেন একই রকম চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী। ‘পঞ্চপাণ্ডব’ বাগ্ধারাটিও একই চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী পাঁচ বন্ধু বা ভাইদের বোঝায়।

পাণ্ডুর ছিল দুই স্ত্রী, কৃতী ও মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কৃতীর সন্তান আর নকুল ও সহদেব মাদ্রীর সন্তান। এ পাঁচ ভাই পাণ্ডুর ওরসজাত নয়। ধর্মের ওরসে যুধিষ্ঠির, পরবনের ওরসে ভীম, ইন্দ্রের ওরসে অর্জুন আর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের ওরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম। এ পাঁচভাই মহাভারতের কেন্দ্রবিন্দু। কুরক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে কৌরবদের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন। কৌরবরা ছিলেন তাঁদের জ্যাঠাতো ভাই। মূলত এ লড়াই ছিল ক্ষমতায় থাকার লড়াই। সিংহাসন দখলই ছিল এ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। কৌরবদের নেতৃত্বে ছিলেন দুর্যোধন, পিতামহ ভীম এবং অন্তর্গত দ্রোণাচার্য আর পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আঠার দিনব্যাপী এ যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য মারা গিয়েছিল। পাণ্ডবরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করে হস্তিনাপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। পাণ্ডবরা ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও ছিরবুদ্ধি সম্পন্ন। ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁরা ছিলেন পারদশী। এ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল অসাধারণ। তাঁদের একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল।

আমাদের সমাজে পাঁচ ভাই বা সমবয়সী পাঁচ বন্ধুর মধ্যে চলনে-বলনে, চিন্তা-চেতনায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, শিক্ষা-দীক্ষার যদি একই রকম দেখি তখন আমরা মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবদের স্মরণ করে তাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে থাকি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অমীয় চক্ৰবৰ্তী, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্ৰনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে এই পাঁচজন কবিকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। এঁরা ছিলেন ত্রিশের দশকের কবি। রবীন্দ্ৰ

প্রভাবের বাইরে এ পঞ্চপাঁওৰ বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে দেখা যায় পঞ্চপাঁওৰ বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি খুবই জনপ্রিয় একটি বাগ্ধারা।

ভীমের প্রতিজ্ঞা-'ভীমের প্রতিজ্ঞা' এ বাগ্ধারাটির অর্থ হলো ভীমণ প্রতিজ্ঞা। ভীম বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন কুরু বংশের রাজা শার্ণু এবং গঙ্গা দেবীর পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম দেবব্রত। গঙ্গার পুত্র বলে তিনি গাঙ্গেয় নামেও পরিচিত। তিনি পাঁওৰ ও কৌরবদের পিতামহ। দেবব্রত ভীমণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য ভীম নামে পরিচিত হন। তাঁর এ প্রতিজ্ঞার পিছনে একটি কাহিনি আছে। একদিন ভীমের পিতা রাজা শার্ণু যমুনাতীরে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধীরের রাজকন্যা সত্যবতীকে দেখেন এবং তাঁর রাপে মুক্ষ হন। তিনি সত্যবতীকে বিবাহের জন্য ধীররাজের কাছে প্রস্তাব দিলেন। ধীররাজ দেখলেন শার্ণুর পুত্র দেবব্রত পরবর্তীসময়ে রাজা হবেন। তাই তার কন্যা সত্যবতীর পুত্রের কোনো দিন রাজা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এজন্য তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বললেন, যদি সত্যবতীর পুত্রকে রাজা করা হয় তবেই তিনি এ বিবাহে রাজি আছেন।

রাজা শার্ণুর পক্ষে এ শর্ত মানা অসম্ভব ছিল। কারণ নিয়ম অনুসারে দেবব্রতই হবে পরবর্তী রাজা। তাই শার্ণু খুবই চিন্তিত মনে রাজ্য ফিরে আসলেন। পিতা শার্ণুকে দুশ্চিন্তাহস্ত দেখে দেবব্রত ধীরে ধীরে প্রকৃত কারণ জানতে পারেন। তখন তিনি ধীররাজের কাছে গিয়ে পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, তিনি কখনও রাজা হবেন না। কিন্তু খুবই দূরদর্শী ধীররাজ বললেন যে, দেবব্রতের পরবর্তী প্রজন্মাতো সিংহাসনের দাবি করতে পারেন।

ধীররাজ বলেন-

নান্যথা তন্মাহাবাহো ! সংশয়েচ্ছ ন কশ্চন ।

তবাপত্যং তবেদ্যত্ত তত্ত্ব নঃ সংশয়ো মহান् ॥

মহাভারত, আদিপর্ব ৯৪/৯২০

অর্থাৎ হে ধীর! আপনার এ প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আপনার যে পুত্র হবে, তার উপরেই আমার খুব সন্দেহ রয়েছে।

তখন ভীম বললেন,

অদ্য প্রভৃতি মে দাস ! ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি ।

মহাভারত, আদিপর্ব ৯৪/ ৯৬^{**}

অর্থাৎ, হে দাসরাজ! আজ থেকে আমার ব্রহ্মচর্য ব্রত হবে।

দেবব্রতের এ ভীমণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হলো ভীম। ভীমের এ প্রতিজ্ঞার জন্য শার্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন। ভীম আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। রাজা শার্ণুর ওরসে সত্যবতীর গর্ভে চিরাসদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই ছেলের জন্ম হয়। শার্ণুর মৃত্যুর পর ভীম নিজেই চিরাসদকে সিংহাসনে বসান, কিছুদিন পর চিরাসদ মারা যায়। তখন বিচিত্রবীর্যকে ভীম সিংহাসনে বসান। ভীম বিচিত্রবীর্যকে কাশীরাজের দুই মেয়ে অশ্বিকা ও অশ্বালিকার সাথে বিয়ে দেন। কিছুদিন পর বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু হয়। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তখন সত্যবতী ভীমকে বংশ রক্ষার জন্য অশ্বিকা ও অশ্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা বলেন। বংশ রক্ষার জন্যও ভীম তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাস্তে রাজি হলেন না। তিনি বলেন,

পরিত্যজেয় ব্ৰেলোক্যং রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ ।

যদাপ্যাধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন ॥

মহাভারত, আদিপর্ব, ৯৭/১৬^{**}

অর্থাৎ, আমি ত্রিভুবন ত্যাগ করতে পারি, কিংবা দেবগণের রাজত্ব পরিত্যাগ করতে পারি, অথবা এ দুইটা হতে যদি বেশি কিছু থাকে, তাও ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু কোনো প্রকারে সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না।

এভাবেই ভীম্ব আমরণ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। আমাদের সমাজেও কোনো কাজের জন্য কেউ যদি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন, একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা থেকে যদি তিনি একবিন্দুও না নড়েন, তখন আমরা সেই ব্যক্তিকে বলি ও যেন ‘ভীম্বের প্রতিজ্ঞা’ করে বসে আছে।

মান্ধাতার আমল-‘মান্ধাতার আমল’ এ বাগধারাটি মানুষের মুখে মুখে জনপ্রিয় শব্দগুচ্ছ। বহু দিনের পুরানো কিছু বোঝাতে এ বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। মান্ধাতার আমল বলতে মান্ধাতার সময় বোঝায়। মান্ধাতার ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁর পিতার নাম ছিল যুবনাশ্ব। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে দেখা যায়, মান্ধাতার জন্ম ইতিহাস অতি চমকপ্রদ। তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেননি, তাঁর জন্ম হয়েছিল পিতৃগর্ভে। যুবনাশ্ব ছিলেন অপুত্রক। অনেক চেষ্টার পরও তিনি সন্তান লাভ করতে পারলেন না। শেষে তিনি মুনিদের সাথে আশ্রমে বাস করতেন। সেখানে তিনি মুনিদের উষ্ট করে পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করলেন। সে যজ্ঞ শেষ হলো মধ্যরাতে। তখন মুনিগণ মন্ত্রপূত জল ভর্তি কলস বেদিতে রেখে ঘুমাতে গেলেন। শর্ত ছিল যে, এ কলসীর জল যুবনাশ্বের স্ত্রী পান করলে তিনি গর্ভধারণ করবেন। এ ব্যাপারটি যুবনাশ্ব জানতেন না। রাতে খুব ত্বক্ষণ পেলে তিনি সেই মন্ত্রপূত জল পান করলেন। তাতে যুবনাশ্ব গর্ভ ধারণ করলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে,

“গর্ভ যুবনাশ্বেদরেছ্বৰৎ। ক্রমেণ চ বৃথে।
প্রাঙ্গসময়শ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপত্রের্নিভিদ্য নিশ্চক্রাম
ন চাসৌ রাজা মমার”॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৪/২/১৭ঃ

অর্থাৎ, তখন যুবনাশ্ব গর্ভ ধারণ করলেন এবং আস্তে আস্তে গর্ভ বর্ধিত হলো। তারপর যথাসময়ে রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে পুত্র জন্মিল কিন্তু রাজা মৃত্যুবরণ করলেন না।

মান্ধাতা যেহেতু মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি তাই তিনি মায়ের দুধ পান করতে পারেননি। শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা তাই বেশ কঠিন হয়েছিল। তখন শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বললেন,

মাময়ৎ ধাস্য তীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণ।
মান্ধাতেতি চ নামাস্য চতুৰ্ঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥
মহাভারত, বনপর্ব, ১০৪/৩০ঃ

অর্থাৎ, তখন ইন্দ্র সেই বালকটির মুখে নিজের তর্জনী আঙুলী থবেশ করালেন এবং বললেন যে, এভাবে আমাকে পান করবে। দেবতারা তখন সেই বালকটির নাম রাখলেন মান্ধাতা।

পরবর্তীকালে মান্ধাতা সিংহাসনে বসে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

যাবৎ সূর্য উদ্দেতি শ্ব যাবচ্ছ প্রতিতিষ্ঠিতি।
সর্বং তদ্যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪/২/১৮ঃ
অর্থাৎ, সূর্য যেখানে ওঠে এবং অস্ত যায়, তার মধ্যে সমস্ত ভূমিই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার বলে পরিচিত।

গৌরাণিক কাহিনিতে মান্দাতার জন্য ইতিহাস বা সময়ের সত্যতা কতটুকু সেটা নিয়ে সংশয় থাকলেও আমাদের সমাজে বিভিন্ন কথাবার্তায় মান্দাতার আমল বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পুরানো কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় উঠে আসলে আমরা প্রায়ই বলে থাকি ঐসব মান্দাতার আমলের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে নতুন চিন্তা করো।

রাবণের চিতা-'রাবণের চিতা' এ বাগ্ধারাটির অর্থ চিরকালের অশান্তি। অর্থাৎ যা কখনো শান্ত হবার নয়। রাবণ ছিলেন রামায়ণের অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন লক্ষ্মার অধিপতি। রাবণের প্রথম স্ত্রীর নাম মন্দোদরী। তিনি মেঘনাদসহ অনেক বীর সন্তানের মা। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে রাবণ রামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করে লক্ষ্মায় নিয়ে এসেছিলেন। রাম ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য তিনি পত্নী সীতা ও ভাই লক্ষণসহ চৌদ্বচরের জন্য বনবাসে এসেছিলেন। এ বনবাসে থাকাকালীন রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। তারপর রাম সীতাকে উদ্ধারের জন্য তাঁর বানর বাহিনী নিয়ে রাবণ ও তাঁর সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রামায়ণের লক্ষ্মকাণ্ডে (কৃতিবাসী-রামায়ণে লক্ষ্মকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড) এ যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। এ যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হন এবং রামের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর রাবণের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্য বিভীষণকে রাম আদেশ করেন। এদিকে রাবণের মৃত্যুতে তাঁর জ্যেষ্ঠপত্নী মন্দোদরী করুণভাবে বিলাপ করেন। তিনি রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে গ্রাম করেন। রামচন্দ্র তাঁকে চিনতে না পেরে আশীর্বাদ করেন 'জন্মায়তী হও' অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত শৰ্কা সিঁদুর নিয়ে সধবা থাকো। মন্দোদরী তখন তাঁর পরিচয় দিলেন এবং বললেন যে তাঁর স্বামী রাবণের মৃত্যু হয়েছে। তাহলে কীভাবে তিনি সধবা থাকবেন। ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে স্বামীর চিতা যতক্ষণ পর্যন্ত জুলতে থাকে ততক্ষণ স্ত্রী সধবা থাকে। কিন্তু রামের আশীর্বাদতো মিথ্যা হতে পারেনা। তাই রাম পুনরায় বললেন,

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা,
 জ্ঞালিয়ে রাখ আয়ত ॥
 শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী,
 মনে না কর বিলাপ।
 মোর হাতে মরে, গেল স্বর্গপুরে,
 খণ্ডিল সকল পাপ ॥
 শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
 দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
 রাবণের চিতা, রহিবে সর্বথা,
 চিরকাল রবে আয়তে ॥

রামায়ণ, লক্ষ্মকাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮০

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণের চিতা প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি কিন্তু কৃতিবাসী রামায়ণে রাবণের চিতার কথা আছে। এটাই বাঙালি মানসে গেঁথে গিয়েছে। এ চিতা চিরকালীন দুঃখের ব্যাপার, রাবণের মতো বীরের পরাজয়ের প্রতিচ্ছবিও। তাই সমাজে বহুদিনের শোকের বা পরাজয়ের স্মৃতি বোঝাতে 'রাবণের চিতা' এ বাগ্ধারাটি ব্যবহৃত হয়।

রামরাজ্য-রামরাজ্য এ বাগ্ধারাটির অর্থ সুশাসিত এবং সুখশাস্তিপূর্ণ রাজ্য। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তিনি ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন রাম। রাম ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি ছিলেন রামায়ণের প্রধান চরিত্র। তাঁর স্ত্রীর নাম সীতা। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম পিতৃসত্যরক্ষার্থে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করে চৌদ্বচর বনবাসে গিয়েছিলেন। রামের সঙ্গে ছিলেন ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতা। বনবাসে অবস্থানকালে লক্ষ্মার রাজা রাবণ

সীতাকে অপহরণ করে লক্ষায় নিয়ে যান। রাম বানর সেনার সাহায্যে রাবণের বিরাট রাক্ষস বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন এবং রাবণকে পরাজিত করেন। তারপর রাম সীতাকে উদ্বার করে ভাই লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাম রাজা থাকাকালীন নীতি-নিষ্ঠার সাথে রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। প্রজাদের চাওয়া-পাওয়াকে তিনি সব সময় প্রাধান্য দিতেন। প্রজাদের কারণে তিনি প্রিয় স্ত্রী সীতা দেবীকে ত্যাগ করতেও দিখাবোধ করেননি। একজন আদর্শ শাসকের অন্যতম কাজ প্রজাদের ভালোমন্দ দেখাশোনা করা। রাম সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এজন্য রামের রাজ্যে মানুষ সুস্থী জীবন যাপন করতে পারতো। রামায়ণে উল্লেখ আছে—

ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ ।
ন ব্যাধিং ভয়ঞ্চাদ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নির্দ্যুরভবল্লোকো নানর্থং কচিদস্পৃশৎ ।
ন চ অ বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোচতবৎ ।
রামমেবানুপশ্যতো নাভ্যহিংসন্ত পরস্পরম্ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮/৯৮- ১০০

অর্থাৎ, রাম রাজ্য শাসন করার সময় কেউ বিধবা হওয়ার কষ্ট পায়নি। সর্প প্রভৃতি এবং রোগব্যাধিজনিত তয় দূর হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যে কোনো দস্যু অর্থাৎ চোর-ডাকাত ছিল না, অনর্থ ছিল না। বয়স্কদের বালকের জন্য শ্রাদ্ধ করা লাগতো না অর্থাৎ শিশু মৃত্যু ছিল না। রাজ্যে সব জায়গায় শান্তি বিরাজ করতো। কেউ অধর্ম আচরণ করতো না। সকলেই রামের আদর্শ অনুসরণ করতো এবং সবাই ছিল আদর্শবান।

অতএব, আমরা বলতে পারি রাম ছিলেন একজন আদর্শ নীতিমান শাসক। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজ্য হয়ে উঠেছিল একটি স্বর্গীয় রাজ্য। প্রকৃতপক্ষে, রামরাজ্য হলো একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র যা প্রত্যেক মানুষের কাম্য। আমরা যখন কোনো শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের কথা বলি তখন ‘রামরাজ্য’ এ বাগ্ধারাটি বলে থাকি। এ বাগ্ধারাটি প্রয়োগ বেশি দেখা যায় রাজনৈতিক দলের বক্তব্যে। বর্তমান ভারতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই দেশকে রামরাজ্যের মতো শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের অঙ্গীকার করেন। গান্ধীজীও ভারতকে রামরাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

লক্ষ্মাকাণ্ড-‘লক্ষ্মাকাণ্ড’ বাগ্ধারাটির অর্থ হচ্ছে তুমুল বিবাদ বা যুদ্ধ। এ বাগ্ধারাটি এসেছে রামায়ণ থেকে। রামায়ণ সংকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন মহাকাব্য। ঋষি বালীকি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। লক্ষ্মাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড তার মধ্যে একটি। রাম রামায়ণের নায়ক। তিনি ছিলেন রাজা দশরথ ও কৌশল্যার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কৈকেয়ী। তিনি রামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন এবং সেই চক্রান্তে রামকে চৌদ্দ বছর বনে যেতে হয়। বনবাসে থাকাকালীন লক্ষ্ম রামের অধিপতি রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লক্ষায় নিয়ে যান এবং অশোকবনে সীতাকে আটকে রাখেন। সীতাকে উদ্বারের জন্য রাম বানর সেনার সাহায্য নেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর বানর সেনাবাহিনী নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লক্ষ্ম প্রবেশ করেন। সেখানে রাম ও রাবণের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয়। এ লক্ষ্মাকাণ্ডে সেই যুদ্ধের পুরোপুরি বিবরণ রয়েছে। যুদ্ধকাণ্ডে আছে,

এবমুদ্রা শিতৈর্বণেষ্টপ্রকাঞ্চনভূষণেঃ ।
আজ্যান রণে রামো দশন্তীবৎ সমাহিতঃ ॥
তথা প্রদীপ্তেনারাত্মসৈলেশ্চাপি রাবণঃ ।
অভ্যবর্ষতদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥

রাম-রাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিন্নতাম।
বরাণাসও শরাণাপ্তও বভূব তুমুলঃ ঘনঃ ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১০০/৫৭-৫৯।

অর্থাৎ, এই বলে রাম দশানন রাবণকে তপ্তকাঞ্চনভূষিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। মেঘ যেমন বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করে রাবণও তেমনি রামের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুজনের ধনুক থেকে নির্গত বাণের সংঘাতে উৎপন্ন হলো তুমুল শব্দ।

কৃতিবাসী রামায়ণে লক্ষ্মাকাণ্ডে তুমুল যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার ॥
সর্প বাণ দেখি রামে লাগিল তরাস।
বুবি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ ॥
নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্রপড়ি শ্রীরাম এড়েন খণ্ড-বাণ ॥
গুরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে।
রাবণের সর্প-বাণ ধরে ধরে গিলে ॥
রামায়ণ, লক্ষ্মাকাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬০॥

অতএব, লক্ষ্মাকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৈব্যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল উভয়পক্ষের মধ্যে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়েছিল। এ যুদ্ধে রাবণ পক্ষের বিখ্যাত যোদ্ধা কুস্তর্ণ, ইন্দ্ৰজিৎ, রাবণসহ অনেকে রাম-বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে হনুমান আগুন লাগিয়ে লক্ষ্মাপুরীকে দন্ত করে দিয়েছিলেন। আমাদের সমাজে আমরা দেখি দুজন ব্যক্তি, পক্ষ, পাড়া বা গ্রামের মধ্যে যখন তুমুল মারামারি বা বাগড়াবাটি লেগে যায় কিংবা রাজনৈতিক দুইপক্ষের মধ্যে যখন তৈব্য মারামারি হয় তখন আমরা লক্ষ্মাকাণ্ডে রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধের সাথে তুলনা করে বলি দুই পক্ষ লক্ষ্মাকাণ্ড শুরু করেছে।

শকুনি মামা-'শকুনি মামা' এ বাগ্ধারাটির অর্থ কুচক্রী লোক। সমাজে অনেক কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই সাধারণত শকুনি মামা বলা হয়।

শকুনি বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের অন্যতম একটি চরিত্র। তিনি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারীর বড় ভাই অর্থাৎ, ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক এবং দুর্যোধনের মামা। গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র ছিলেন শকুনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, কপট এবং নানারকম কুটিলতায় ভরপুর। তিনি মহাভারতের অন্যতম খলনায়ক। নানারকম কুটবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কারণে 'শকুনি মামা' বাগ্ধারাটি কুচক্রী লোক হিসেবে আখ্যায়িত হয়। বোন গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর শকুনি কুরু পরিবারেই থাকতেন। ফলে ভাগনে দুর্যোধনের সাথে শকুনির ব্যাপক স্থ্যতা তৈরি হয়। তিনি দুর্যোধনকে সবসময় কুপরাম্রশ দিতেন এবং অন্যায়কাজে উদ্বৃদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয় তার জন্য শকুনিকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। শকুনি পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব তৈরির ক্ষেত্রে ইঙ্গন না দিলে হয়তো কুরুবংশ বিনাশ হতো না। আদিপর্বে আমরা দেখি মাতা কুঁটীসহ পঞ্চাণীবদের পুড়িয়ে মারার জন্য বারণাবতে জতুগ্রহ নির্মাণ করান দুর্যোধন। জতুগ্রহ ছিল দাহ্য পদাৰ্থ দিয়ে তৈরি গৃহ। এ গৃহের বাহিরটা ছিল মাটির আন্তরণে ঢাকা কিন্তু ভিতরটা ছিল ঘি, তেল প্রভৃতি দাহ্য পদাৰ্থ এবং জতু বা গালা দিয়ে তৈরি। এ গৃহ তৈরি করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার অন্যতম পরামর্শক ছিলেন শকুনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্যুরের কোশলের কারণে পাণ্ডবরা বেঁচে যান। বিদ্যুর সমস্ত তথ্য যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দেন, ফলে পাণ্ডবরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

শকুনি পাশা খেলায় ছিলেন খুবই দক্ষ। এ খেলায় তাঁর তুল্য নিপুণ খুবই কম ছিল। এ খেলায় কারসাজি করতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পাশাখেলা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় হলেও তিনি তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই পাশাখেলার আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দুর্বোধনকে শকুনিই দিয়েছিলেন। শকুনি দুর্যোধনকে বলেন,

দ্যুতপ্রিয়শ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম।

সমাহৃতশ্চ রাজেন্দ্র ! ন শক্ষ্যতি নিবর্তিতুম ॥

দেবনে কুশলশাহং ন দ্রেষ্টি সদশো ভূবি ।

ত্রিযু লোকেষ্ম কৌরব্য ! তৎ দ্যুতে সমাহ্বয় ॥

মহাভারত, সভাপর্ব, ৪৬/১৮-১৯^{০০}

অর্থাৎ, যুধিষ্ঠিরের দ্যুতক্রীড়া খুব পছন্দ কিন্তু সে এখেলা ভালোভাবে জানেনা। অতএব, তাকে যদি আহ্বান করো তাহলে সে না এসে পারবে না। হে দুর্যোধন, দ্যুতক্রীড়ায় আমি দক্ষ, ত্রিভুবনে আমার সমর্পণায়ে দক্ষ আর কেউ নেই। অতএব, তুমি যুধিষ্ঠিরকে এ খেলার জন্য আহ্বান করো।

ভালো-মন্দ মিশয়েই সমাজ। সমাজে সব সময় কিছু কুটিল প্রকৃতির মানুষ থাকে। তারা মানুষকে কুবুদ্ধি দিতে ভালোবাসে। তাদের কুপরামর্শের কারণে সমাজের বহু ক্ষতি হয়ে যায়। বহু ভালো মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব, সুখের সংসার ভঙ্গে তচ্ছন্ছ হয়ে যায়। আতীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের সাথে তৈরি হয় মনোমালিন্য, সমাজে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। শাস্তিপ্রিয় সমাজ অশাস্তিতে ভরপুর হয়ে পড়ে। সমাজে এ ধরনের কুপরামর্শদাতা ও ধৰ্সাআক চিত্তাবানাকারী ব্যক্তিদের আমরা শকুনি মামা বলে অভিহিত করি। সমাজের কিছু কুচক্ষি মানুষের কারণে যখন সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ণে বিষ্ম ঘটে তখন মাঝে মাঝে আমরা বলি, এসব শকুনি মামাদের জন্য সমাজ রসাতলে চলে যাচ্ছে।

শনির দশা-খুব খারাপ সময় বোঝাতে ‘শনির দশা’ এ বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়। শনি হিন্দুধর্মের একজন দেবতা। তাঁর পিতার নাম সূর্যদেব ও মাতার নাম ছায়াদেবী। চিত্ররথের কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পতিরূপা ও তেজস্বিনী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গগেশ খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে শনিকে নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনি আছে। শনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। একদিন শনি ধ্যানে রত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তখন ঋতুমতী ছিলেন। তিনি সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে শনির কাছে এসে তাঁকে একান্তে পাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু শনি ধ্যানমং হওয়ার কারণে স্ত্রীর দিকে তাকালেন না। ফলে স্ত্রী ক্ষুঢ় হয়ে শনিকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, শনি যার দিকে তাকাবেন সে বিনষ্ট হবে। ফলে শনি যেদিকে দৃষ্টি দেন তার ক্ষতি হয়। হর-পার্বতীর পুত্র গগেশ, জন্মের পর শিশু গগেশকে নিয়ে চারদিকে তখন উৎসব চলছে। ধৰ্মীয়গণ গগেশকে দেখতে এসেছিলেন। শনিও এসেছিলেন। কিন্তু শনি স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপের কথা মনে করে গগেশের দিকে তাকালেন না। কিন্তু পার্বতীর অনুরোধে শেষে গগেশের দিকে তাকালেন। তাকানো মাত্রই গগেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। পুরাণে আছে,

সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখম্ ।

শশেচ দ্যষ্টিমাত্রেণ চিছেদ মস্তকং মুনে ।

চক্ষুর্নিবারয়ামাস তঞ্চৌ ন্দ্রাননঃ শনিঃ ।

প্রতঞ্চৌ পার্বতীক্রেড়ে তৎসর্বাঙ্গং সুলোহিতঃ ।

বিবেশ মস্তকং কৃষে গত্বা গোলোকমীপ্সিতম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-গগেশখন্দ ১২/৫-৭^{০০}

অর্থাৎ, শনি বালকটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া মাত্রই বালকের মন্তক ছিন্ন হয়ে গেল। শনি সাথে সাথে তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। শিশুটি রক্ষাকৃত হয়ে মায়ের কোলে পড়ে রইল আর তাঁর মাথা গোলকে কৃষের দেহে মিশে গেল।

পুরাণের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যার দিকে শনির দৃষ্টি পড়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখি প্রত্যেক মানুষ জীবনে কোনো না কোনো সময় খুব খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটায়। জীবনে নেমে আসে ভয়ানক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা শারীরিক বা যে-কোনো কিছু হতে পারে। এরকম অবস্থায় আমরা শৌরাণিক দেবতা শনির কথা মনে করে বলে থাকি লোকটির ওপর শনির দশা বা দৃষ্টি পড়েছে।

শিখন্তী খাড়া করা—এ বাগ্ধারাটির অর্থ হচ্ছে কোনো ভালো কাজে বাগড়া দেওয়া। কোনো প্রস্তুত অনুষ্ঠান বা কাজ কারও সামনে আসায় পঙ্গ হয়ে যাওয়া। শিখন্তী মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন। পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয়ের পিছনে তাঁর অবদান রয়েছে। শিখন্তীর জন্ম নিয়ে মহাভারতে একটি কাহিনি আছে। শিখন্তী পূর্ব জন্মে ছিলেন কাশিরাজের কন্যা, তাঁর নাম ছিল অম্বা। তাঁর অন্য দুই বোন ছিল অমিকা ও অম্বালিকা। ভীম তাঁর ভাই বিচ্ছিন্নবীরের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য স্বয়ংবর সভা থেকে কাশিরাজের তিন কন্যাকে হরণ করেন। কিন্তু অম্বা ভীমকে বলেছিলেন যে, তিনি পূর্বে শাল্বরাজকে মনে মনে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভীম তখন তাঁকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু ভীম তাকে হরণ করেছে তাই শাল্বরাজ তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অম্বা মনে মনে তাঁর এই দুর্দশার জন্য ভীমকে দায়ী করলেন। তিনি গেলেন ভীমের গুরু পরশুরামের কাছে প্রতিকারের জন্য। পরশুরাম অম্বাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের জন্য ভীমকে বললেন। কিন্তু ভীমকে পূর্বে প্রতিজ্ঞা করে আছেন তিনি কখনও বিবাহ করবেন না। শেষে কোনো প্রতিকার না পেয়ে অম্বা ভীমকে বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং শিবের তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন যে, তুমি পরজন্মে দ্রুপদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ভীমকে বধ করতে পারবে। পরজন্মে অম্বা দ্রুপদ রাজার ঘরে কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম রাখা হয় শিখন্তী। পরে শিখন্তী এক যক্ষের বরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখন্তী পুরুষ হিসেবে যোগদান করেন। এদিকে ভীম জানতে পারেন যে অম্বা শিখন্তী হিসেবে তাঁকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। পূর্বে ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্ত্রীলোক, ক্লীব বা যে স্ত্রী পুরুষ হয়েছে বা অন্ধ্রাহীনের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নবম দিন পর্যন্ত ভীম যুদ্ধ করেছিলেন। দশম দিনে ভীম মৃত্যুর চিন্তা করেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন। শুরু হয় অর্জুনের সাথে যুদ্ধ। সেদিন অর্জুন শিখন্তীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। শিখন্তীকে সামনে দেখে ভীম আর যুদ্ধ করলেন না। ভীম শিখন্তীকে বললেন,

কামং প্রহর বা মা বা ন ত্বাং যোৎস্যে কথম্বন।

যৈব হি ত্বং কৃতা ধাত্রা যৈব হি ত্বং শিখন্তীনী ॥

মহাভারত, ভীম পর্ব, ১০৪/৮২^০

অর্থাৎ, তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে প্রহার করতেও পার, নাও পার। আমি কিন্তু কোনোভাবে তোমাকে প্রহার করব না। কারণ প্রস্তা তোমাকে যে নারী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন, তুমি সেই নারী শিখন্তীনীই আছ।

অর্জুন তখন তাঁকে বাগের দারা জর্জরিত করে ফেলেন। পতন ঘটে পিতামহ ভীমের। শিখন্তীকে সামনে রেখে ভীমকে হত্যার যে কৌশল পাণ্ডবরা অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল অসাধারণ কৌশল। যুদ্ধে বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় না নিলে জয়লাভ সহজে হয় না। শিখন্তীকে

সামনে রেখে পাওবরা প্রকৃতপক্ষে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পারলে পাওবরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন না। আমরা আমাদের সমাজে দেখি অনেকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্য জনকে সামনে দাঁড় করে দিয়ে অন্তরালে থেকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। এ রকম ঘটনা ঘটলে আমরা এ বাগ্ধারাটি ব্যবহার করি।

পরিশেষে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলাভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি। কিন্তু বাংলাভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনি খুবই চমকপ্রদ। ফলে বাঙালি মানসে এই পৌরাণিক কাহিনিগুলো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। এগুলো সরাসরি আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটে। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কথা-বার্তা, বক্তৃতা-বিবৃতিতে বারংবার এসব প্রসঙ্গ টেনে আনি। ফলে বাংলা ভাষায় আগমন ঘটেছে বহু পৌরাণিক ব্যাপার, যা বাগ্ধারায় পরিণত হয়েছে। সমাজের কোনো ঘটনার সাথে পৌরাণিক কোনো ঘটনা যখন মিলে যায় তখন আমরা স্বাচ্ছন্দে এসব বাগ্ধারা ব্যবহার করি। এগুলো বাংলাভাষাকে করেছে আকর্ষণীয় এবং দিয়েছে ভাষার সৌকর্য। এসব বাগ্ধারার মূল ঘটনার উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যে হলেও এ বাগ্ধারাগুলো বাংলা ভাষার সম্পদ, বাংলা ভাষার অলংকার।

তথ্যনির্দেশ

১. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৮৪]। কালিকাপুরাণম্। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
২. তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯৮]। কন্দ-পুরাণম্ (ষষ্ঠ ভাগ), নাগর খণ্ড। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৩. চক্ৰবৰ্তী, ধ্যানেশ্বনারায়ণ (সমূল অনুবাদ ও সম্পাদনা) [১৯৯৭]। রামায়ণম্, দ্বিতীয় খণ্ড। নিউলাইট, কলকাতা।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্� হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ (সমূল, স্টীক অনুবাদ) [১৪২২]। মহাভারতম্। বিশ্ববাচী প্রকাশনী, কলিকাতা।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত) [২০০৯]। ভরত নাট্যশাস্ত্র। নবপত্র প্রকাশন। কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৬।
৮. তর্করত্ন, আচার্য পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯০]। বিষ্ণুপুরাণম্। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৯. ঐ।
১০. শাক্রী, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা ও অনুবাদ) [১৪১৬]। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
১১. ব্ৰহ্মচারী, মহানামৰ্ত্ত (সম্পাদিত) [২০১৯]। শ্রীমত্তাগবতম্ (দশম কঠন)। কলকাতা।
১২. প্রাণকৃত
১৩. ঐ।
১৪. ঐ।
১৫. প্রাণকৃত।
১৬. ঐ।
১৭. ঐ।
১৮. তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯৭]। বায়ুপুরাণম্। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
১৯. প্রাণকৃত।
২০. ঐ।
২১. ঐ।

- ২২. এই।
- ২৩. এই।
- ২৪. এই।
- ২৫. এই।
- ২৬. প্রাণকৃত।
- ২৭. প্রাণকৃত।
- ২৮. প্রাণকৃত।
- ২৯. পশ্চিত, কৃতিবাস (২০১৫)। রামায়ণ। কামিনী প্রকাশলয়, কলকাতা।
- ৩০. প্রাণকৃত।
- ৩১. এই।
- ৩২. প্রাণকৃত।
- ৩৩. প্রাণকৃত।
- ৩৪. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৫)। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উঙ্গর ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব)। ফার্মা
কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পঃ: ১৩২-১৩৩।
- ৩৫. প্রাণকৃত।

**বৌদ্ধ শিল্পকলার উত্তর ও বিকাশে রাজবংশের অবদান সমীক্ষা:
বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ**

(A Study on the Dynastic Contributions to the Origin and Development of Buddhist Arts: Buddha Age to Gupta Age)

ড. শান্তি বড়ুয়া*

সারসংক্ষেপ

গৌতম বুদ্দের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ শিল্পকলার উত্তর ঘটে। যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পাদের মননশীল সাধনায় বৌদ্ধ শিল্পকলার ভাঙ্গার নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বুদ্দের জীবন-দর্শন বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে অনুসন্ধান করা যায়। এ কারণে বৌদ্ধ শিল্পকলার নানান নির্দর্শনকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার অঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময়ে প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই প্রবক্ষে বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা ও বিকাশে কোন রাজবংশ কীভাবে অবদান রাখেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষত, হর্ষক, মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশের অবদান বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ: বিহার, স্তূপ, স্তুতি, চৈত্য, গুহামন্দির, বেলুবন, হর্ষক, মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত, গান্ধার, মথুরা, অশোক, সাঁচীস্তূপ, ভরহতস্তূপ, মিলিন্দ, কণিকা, সারনাথ, শ্রাবণষ্ঠী, কৌশাম্বী।

Abstract

Buddhist arts originated based on the life and philosophy of Gautama Buddha. Through the ages, the storehouse of Buddhist arts became enriched in various ways with the patronage of kings of different dynasties and the thoughtful pursuit of artists from different regions. Although Buddha's life and philosophy are the main subjects of Buddhist arts, various elements of contemporary Indian society, such as culture, education, art, historical traditions and many more can be found in it. For this reason, various artifacts of Buddhist arts are considered as invaluable sources for the history of ancient India. Ancient India was ruled by various dynasties from the Buddha's period to the Gupta era. This article sheds light on how each dynasty contributed to the initiation and development of Buddhist arts. In particular, the contributions of the Haryanka, Maurya, Sunga, Indo-Greek, Kushan, Satavahana, Gupta and other dynasties are specially reviewed.

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
E-mail: shantubarua@du.ac.bd

১. ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের ঘটনাবহুল জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিল্পকলার উৎপন্ন ঘটে। কালক্রমে বিভিন্ন শিল্পীর সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও নৈপুণ্যতায় তা নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ শিল্পকলা বৈচিত্র্যময় রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সকল বৈচিত্র্যময় বৌদ্ধ শিল্পকলাকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা : স্থাপত্যিক শিল্প, মূর্তিশিল্প এবং চিত্রশিল্প। বিহার, সুগ্রীব, সুস্ত, চৈত্য, গুহামিন্দন প্রভৃতি স্থাপত্যিক শিল্পের অন্তর্গত। মূর্তি এবং চিত্রকলা দুটি স্বতন্ত্র ধারার শিল্পকলা হিসেবে গণ্য করা হয়। বুদ্ধের প্রতি শুদ্ধাশীল রাজা ও রাজন্যবর্গগণ ভক্তির নির্দর্শন স্বরূপ এবং নিজেদের কর্মাবলী ও গৌরবগাথা স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ শিল্পকলা নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কালক্রমে সেসব শিল্প নির্দর্শন ইতিহাসের অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারে পরিণত হয়। বুদ্ধযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলার উৎপন্ন ও বিকাশে বিভিন্ন রাজবংশের অবদান পর্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২. বৌদ্ধ শিল্পকলার উৎপন্ন ও বিকাশে বিভিন্ন রাজবংশের অবদান

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা বুদ্ধযুগেই (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় বুদ্ধযুগে মগধরাজ বিষ্ণবার ও অজাতশত্রু, কোসলরাজ প্রসেনজিত, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ রাজা এবং ধনাট্য ব্যক্তিগণ বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে দান করেন। কালের বিবর্তনে ধৰংসপ্রাপ্ত হলেও এ বিহারগুলোকেই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বৌদ্ধ শিল্পকলার আদি নির্দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেন। এছাড়া কোসলরাজ প্রসেনজিতের সময়কালেই বুদ্ধের একটি স্বর্গমূর্তি নির্মিত হয় বলে বৌদ্ধ সাহিত্য এবং চৈনিক ঐতিহ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ধারণা করা যায় বৌদ্ধ শিল্পকলার সূত্রপাত গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালেই সূচিত হয়। বৌদ্ধ শিল্পকলার গোড়াপত্তন বুদ্ধযুগে হলেও এর বিবর্তন ধারা মৌর্য, শুঙ্গ, ইন্দো-চীক, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত, এবং পাল আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মূলত উপর্যুক্ত সময়ে বিভিন্ন রাজ পরিবার এবং অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের গৌরব বহিবিষ্টে ছড়িয়ে পড়ে। এসব শিল্পকর্মের সাথে ধর্মীয় আবেগ বিশেষভাবে জড়িত। ইতিহাসের অমূল্য উপাদান খ্যাত এসব শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে যেসব রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী কিংবা ধনাট্য ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে অবদান রাখেন তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কর্মকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২.১. বুদ্ধ সমসাময়িক রাজন্যবর্গের অবদান

বুদ্ধের সমসাময়িক রাজবংশের অনেক রাজা, শ্রেষ্ঠী ও অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি তাঁরা নানানিক বৌদ্ধ শিল্পকলা নির্মাণেও অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: রাজা বিষ্ণবার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিত, রাজা চণ্ড প্রদ্যোত, রাজা উদয়ন, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, রানী মল্লিকা এবং শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাম স্মতবর্য।

২.১.১. হর্ষক রাজবংশ: রাজা বিষ্ণুসার ও রাজা অজাতশত্রু

২.১.১.১. রাজা বিষ্ণুসার (খ্রি: পঃ ৫৪৫-৮৯২)

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রাচীন ভারত ঘোলটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন রাজবংশ ও রাজা কর্তৃক শাসিত হতো (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:১১৩)। তন্মধ্যে অন্যতম ছিল ছিল মগধ। মগধের সাথে বৌদ্ধধর্মের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের উত্তর-বিকাশের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল মগধ। যে তিনটি স্থানে সঙ্গীতি বা সম্মেলনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী বা ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল সে স্থানসমূহ ছিল মগধে। বুদ্ধের আবর্তাবকালে হর্ষকবংশ মগধে রাজত্ব করতেন। রাজা বিষ্ণুসার ছিলেন হর্ষক বংশের একজন প্রখ্যাত রাজা। ত্রিপিটক এবং সিংহলি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য দীপবৎস ও মহাবৎস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ এবং রাজা বিষ্ণুসার ছিলেন সমসাময়িক। রাজা বিষ্ণুসারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম মগধ এবং উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। এছাড়া, মহাবৎস গ্রন্থে বুদ্ধের পরিবার এবং রাজা বিষ্ণুসারের পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ আছে।

বিনয় পিটকে উক্ত আছে, বুদ্ধত্ব লাভের দ্বিতীয় বর্ষে বুদ্ধ মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে মগধরাজ বিষ্ণুসার বসবাসের জন্য ‘বেলুবন’ নামক একটি বিহার নির্মাণ করে দান করেন। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম বিহার, যা রাজা বিষ্ণুসারের অমর কীর্তি। সংযুক্ত নিকায়, সুভনিপাত অট্ঠকথা, সামন্তপাসাদিকা এবং দিব্যাবদান গ্রন্থের সাক্ষ্য মতে, ঘন বাঁশবন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে এই মনোরম বিহারের নামকরণ করা হয় বেলুবন। উল্লেখ্য যে, পালি ‘বেলু’ শব্দের বাংলা অর্থ বাঁশ। বিহারটি ১৮ কিউবিটস সুউচ্চ দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বিহারটিতে সুসজিত তোরণদ্বার এবং উচু অট্টালিকা ছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যায় (Smith, 1916:49; Takakusu and Nagai, 1968:576; Law, 1954:270)। প্রত্নতত্ত্ববিদ সাধন চন্দ্র সরকার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন,

“বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে অদ্যাপি উল্লিখিত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ধ্বংসাবশেষ এবং চারিকোণে
অবস্থিত পর্যবেক্ষণী-অট্টালিকার (Watch-Tower) ভিত্তের অবস্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায়”
(সরকার, ১৯৯৭:১৭৭)

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহারটির গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ তাঁর প্রথম, ত্রৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তদশ ও বিংশতি বর্ষাবাস এ বিহারেই উদ্যাপন করেন। এখানে অবস্থানকালেই তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিচালনার জন্য বিনয়ের বহু বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। এছাড়া, অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ের ধর্মদেশনা এবং বহু জাতক ভাষণ করেন। বিনয় পিটকে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধের অগ্রশাবক তথা অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদ্ধাল্যায়ন উক্ত বিহারেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁদের অভ্যেষ্টিক্রিয়া মগধেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মগধেই তাঁদের দেহাবশেষের উপর স্তুপ নির্মাণ করা হয়েছিল (Oldenberg, 1879: 39-42; Chaudhury, 1982:100)। বিহারটি মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী কলন্দক-নিবাপ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কলন্দক-নিবাপকে করণবেগুবন অধ্যয়ায়িত করে এর অবস্থান রাজগৃহের এক লি উত্তরে ছিল বলে নির্দেশ করেন (Beal, 1869:159)। বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগৃহের দক্ষিণে প্রাচীন বেলুবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ স্থানে নব নির্মিত বিহার লক্ষ করা যায়। বুদ্ধ, তাঁর অগ্রশাবক সারিপুত্র-মৌদ্ধাল্যায়ন, রাজা বিষ্ণুসার ও রাণী ক্ষেমার নানা আখ্যান ও স্মৃতিতে বেলুবন বিহার অবিমরণীয়।

২.১.১.২. রাজা অজাতশত্রু (খ্রি: পৃ: ৮৯৩-৮৬২)

মগধরাজ অজাতশত্রু ছিলেন বিহিসারের পুত্র এবং হর্ষক বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর রাজত্বকালেই হর্ষক বংশের শক্তি ও গৌরব উচ্চ শিখের উন্নীত হয়েছিল। মনে করা হয় তিনিই প্রথম নৃপতি যিনি ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যসীমা বারাণসী থেকে বঙ্গদেশের সীমান্তবর্তী গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন (হালদার, ১৯৯৬:৩৬)। পিতার মতো তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন না। পিতৃ হত্যার অনুশোচনা এবং রাজবৈদ্য জীবকের পরামর্শে দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের এক বছর পূর্বেই তিনি হয়ে উঠেন বুদ্ধের প্রধান ভক্ত (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯:৫২; Malalasekera, ১৯৯৮:৩৩)। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণার্থে তিনি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজা অজাতশত্রু এবং বুদ্ধের কথোপকথনের বহু দৃষ্টিত পাওয়া যায়। উভয়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে “শ্রামণ্য ফল প্রশ্ন” এবং “সংশয় নিরাকারক” সূত্রদ্বয় সংকলিত হয়, যা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ সূত্র হিসেবে খ্যাত।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ সংগীতিসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীতির মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘ সম্প্রসারণ করেন এবং পরিমার্জন করেন (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০০:১৫)। রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যেটি ‘থেরবাদ সংগীত’ নামে পরিচিত। এ সংগীতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণীসমূহ সংকলিত হয়েছিল। উক্ত সংগীতিতে ধর্ম বিনয়ে পারদর্শী পাঁচশত ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন এবং সাত মাস সংগীতির কার্যক্রম চলমান ছিল। উক্ত সংগীতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন রাজা অজাতশত্রু। অজাতশত্রু তাঁর ৩২ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন বিহার সংস্কারসহ একাধিক স্তুপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। পালি অঙ্গুত্তর নিকায় এবং মহাবৎস গ্রন্থে (শ্লোক নং- ৩২, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে, রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন (Morris, 1888:182; Geiger, 1908:15)। জানা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেহভূম নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা স্তুপ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ স্তুপের ইতিবৃত্ত নিয়ে পালি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ থৃপবৎসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। থৃপবৎস মতে, বুদ্ধের পবিত্র দেহভূম তৎকালে প্রভাবশালী নিম্নোক্ত রাজা এবং গোষ্ঠী প্রধানদের কাছে হস্তান্তর করা হয় (Jayawickrama, 1971:179-180)।

ক্রমিক	রাজ্য/অঞ্চলের নাম	রাজা/রাজ প্রতিনিধি/ গোষ্ঠীর নাম	ক্রমিক	রাজ্য/অঞ্চলের নাম	রাজা/রাজ প্রতিনিধি/ গোষ্ঠীর নাম
১	কুশীনগর	মলুগণ	৫	অন্নকঞ্চবাসী	বুলিগণ
২	মগধ	রাজা অজাতশত্রু	৬	রামগ্রাম	কোলিয়গণ
৩	বৈশালী	লিঙ্গীগণ	৭	পাবা	মলগণ
৪	কপিলাবস্তু	শাক্যগণ	৮	বেটদীপ	ব্রান্দগণ

পরবর্তীতে রাজা বা রাজ প্রতিনিধি বা গোষ্ঠী প্রধানগণ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা সহকারে বুদ্ধের পবিত্র দেহভূম স্তুপে সংরক্ষণ করেন। বিভিন্ন রাজ্যে স্তুপ নির্মাণের কথা ত্রিপিটকেও উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি দীর্ঘনিকায় এবং বুদ্ধবৎস নামক গ্রন্থে শাক্যজনপদ কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের দেহভূম সম্প্রসারণ একটি স্তুপ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ আছে (Davids and Carpenter 1903:167)। থৃপবৎস গ্রন্থে রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক রাজগৃহে বুদ্ধের পবিত্র দেহভূম সম্প্রসারণ স্তুপ নির্মাণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। মগধরাজ অজাতশত্রু সুসজ্জিত

শোভাযাত্রা সহযোগে রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনী, উচ্চ ক্ষমতাপ্রাণ নিরাপত্তা পরিষদ এবং স্বেচ্ছাসেবক দল দ্বারা পরিবৃত হয়ে বুদ্ধের দেহভূষণ সোনার পাত্রে ছাপানপূর্বক রাজগৃহে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু ভক্তদের পূজা-অর্ধ্য নিবেদনের সুবিধার্থে রাজগৃহে বুদ্ধের পবিত্র দেহভূষণের উপর একটি সুসজ্জিত স্তুপ নির্মাণ করেন। পালি দীঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনি ধ্রঢ়েও অভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় (Stede, 1931:610)। খৃপবৎস এবং ধমপদট্টকথা নামক গ্রন্থয়ে আরেও উল্লেখ আছে, রাজা অজাতশত্রু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মহাকাশ্যপ ছবিরের পরামর্শে অষ্ট মহাস্থানে সংরক্ষিত বুদ্ধের দেহভূষণমূহ সংগ্রহ করেন এবং রাজগৃহে সংগৃহীত দেহভূষণের উপর স্তুপ নির্মাণ করেন। খৃপবৎস গ্রন্থ হতে রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক স্তুপ নির্মাণ কাহিনীর চুম্বকাংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

অসীতিহ্যগতীরে পন তঙ্গিৎ পদেসে জাতে হেট্টা লোহসহুরং সহুরাপেত্তা তথ থুপারামে
চেতিযঘরঞ্জমাগং তমলোহমযং গেহং কারাপেত্তা অট্ঠাট্ঠ হরিচন্দনাদিমযে করণে চ থুপেচ
কারাপেসি। অথ খো ভগবতো ধাতুযো হরিচন্দনকরণে পক্খিপিত্তা তং হরিচন্দনকরণং
অঞ্জগ্রস্মিৎ হরিচন্দনকরণে তম্পি অঞ্জগ্রস্মিন তি এবং অট্টা হরিচন্দনকরণে একতো কত্তা
এতেনেব উপায়েন অট্টা করণে অট্টসু হরিচন্দনথুপেসু অট্ট হরিচন্দনথুপে অট্টসু
লোহিতচন্দনকরণেসু অট্ট লোহিতচন্দনকরণে অট্টসু লোহিতচন্দনথুপেসু অট্ট
লোহিতচন্দনথুপে অট্টসু দন্তকরণেসু অট্ট দন্তকরণে অট্টসু দন্তথুপেসু অট্ট
অট্টসু সববরতনকরণেসু অট্ট সববরতনকরণে অট্টসু সববরতনথুপেসু অট্ট সববরতনথুপে
অট্টসু সুবণ্ণকরণেসু অট্ট সুবণ্ণকরণে অট্টসু সুবণ্ণথুপেসু অট্ট সুবণ্ণথুপে অট্টসু
রজতকরণেসু অট্ট রজতকরণে অট্টসু রজতথুপেসু অট্ট রজতথুপে অট্ট মণিকরণেসু
অট্ট মণিকরণে অট্টসু মণিথুপেসু অট্ট মণিথুপে অট্টসু লোহিতক্ষকরণেসু অট্ট
মসারগল্লথুপে অট্ট মসারগল্লকরণেসু অট্ট মসারগল্লকরণে অট্টসু ফলিককরণেসু অট্ট
ফলিককরণে অট্টসু ফলিকথুপে পক্খিপি (Jayawickrama, 1971:181-182)।

অর্থাৎ, রাজা মাটির আশি হাত নীচ পর্যন্ত খনন করিয়ে গর্তের তলায় চাদরের মতো লোহার মোটা পাটাতন বিছালেন। এর উপরিভাগে তৈরি করালেন একটি সুপরিসর তামার গর্ভাগার। সে গর্ভাগারে বুদ্ধের দেহাবশেষমূহ রাখা হয় আটটি হলুদ রঙের চন্দনকাঠে নির্মিত ঢাকনিযুক্ত ছোট পাত্রে। হলুদ রঙের চন্দনকাঠের আটটি পাত্র আবার পৃথকভাবে রাখা হয় আটটি লাল চন্দনকাঠের পাত্রের মধ্যে। সে আটটি পাত্রকে পুনরায় রাখা হয় আটটি হস্তিদন্তে নির্মিত পাত্রে। সে আটটি পাত্রকে আবার মণিমুক্তাখচিত পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। মণিমুক্তা খচিত পাত্রগুলো আবার রাখা হয় সোনার আটটি পাত্রে। সোনার পাত্রগুলো আবার আটটি ঝুপার পাত্রে রাখা হয়। ঝুপার পাত্রগুলো পুনরায় রাখা হয় পদ্মরাগমণিতে নির্মিত আটটি পাত্রে। এ পাত্রগুলো আবার রাখা হয় বৈদুর্যমণিতে নির্মিত আটটি পাত্রে। এরপর এসব পাত্রকে পুনরায় স্ফটিক নির্মিত পাত্রে রাখা হয়। এভাবে বিভিন্ন উপাদানে পাত্র তৈরি করে সেখানে বুদ্ধের দেহাবশেষ রাখা হয়।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তেও রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক স্তুপ নির্মাণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায় (Watters, 1996:158-159)। স্তুপটির অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কারো মতে, বর্তমান বিহার রাজ্যের রাজগীরিতে অবস্থিত মণিয়ার মঠে স্তুপটি অবস্থিত ছিল। আবার কারো মতে, বর্তমান রাজগীরের জাপানি বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখস্থিত উঁচু চিবিই ছিল স্তুপটির অবস্থান স্থল (সরকার, ১৯৯৭:১৭৬)।

২.১.২. কোসল রাজবংশ: রাজা প্রসেনজিৎ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠী

২.১.২.১. রাজা প্রসেনজিৎ (খ্রি: পঃ: ৬ষ্ঠ শতক)

মোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কোশলরাজ্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। কোসল রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে সুমতি, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যন্দিকা বা সই নদী, পূর্বে সদানন্দী এবং উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে জানা যায় (হেমচন্দ্র, ১৯৮৯:৮৯)। বুদ্ধের সময়ে কোসল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি রাজা বিষিসার এবং অজাতশত্রুর ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং বুদ্ধের একান্ত ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর একাধিক পত্রীর নামেলেখ পাওয়া যায়। প্রধান মহিযী ছিলেন মল্লিকা। তাঁর অপরাপর মহিযীরা হলেন মগধরাজ বিষিসারের ভগিণী কোসলদেবী, শাক্যবংশীয় বাসব ক্ষত্রিয়া, উরিবী প্রমুখ। তাঁরা সবাই নিজ নিজ কর্মাবদানের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয়। রাজা প্রসেনজিৎ বিহার নির্মাণ, বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার এবং ভিক্ষুসংঘের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্তি কর্মাবদানের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। জাতক, থেরীগাথা অট্টকথা, সুতনিপাত, অঙ্গুরনিকায়, সংযুজ্নিকায় এবং বিনয়পিটক থেকে জানা যায়, বুদ্ধ ধর্ম প্রচার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন কোসলের রাজধানী শ্রাবণ্তীতে। তিনি শ্রাবণ্তীতে পঁচিশবার বর্ষাবাস পালন করেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ সাক্ষাৎ দেয় যে, বুদ্ধ ও তাঁর সংঘের শিষ্যদের বসবাসের জন্য রাজা প্রসেনজিৎ শ্রাবণ্তীতে রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করেন। বুদ্ধ এ বিহারেও বর্ষাবাস উদ্যাপন করেন। সুমনা ভিক্ষুণী ছিলেন এ বিহারটির প্রধান তত্ত্বাবধায়িকা (সরকার, ১৯৯৭:১৯৮)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিহারটি রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক নির্মিত বলে উল্লেখ করলেও, এটি ভিক্ষুণীদের জন্য বিশেষত মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে অভিমত পোষণ করেন (Watters, 1996:377)। রাজা প্রসেনজিৎের আরেক অমর কীর্তি হলো বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্তি নির্মাণ। চৈনিক ঐতিহ্য মতে, রাজা প্রসেনজিৎের পূর্বে রাজা উদয়ন প্রথম চন্দনকাঠের বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত ঐতিহ্যে উল্লেখ আছে যে, স্বর্গীয় মাতাকে ধর্ম দেশনার নিমিত্ত বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করেন। তাবতিংস স্বর্গে তিনি তিন মাস অবস্থান করেন। রাজা উদয়ন বুদ্ধকে দীর্ঘদিন দর্শন করতে না পেরে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন অমাত্যগণ আলাপ-আলোচনাপূর্বক দক্ষ কারিগর দ্বারা বুদ্ধের চন্দন কাঠের একটি মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা উদয়নকে পরামর্শ দান করেন। অমাত্যগণের পরামর্শক্রমে রাজা উদয়ন ৫ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চন্দন কাঠের একটি বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করান। এ খবর শুনে রাজা প্রসেনজিৎও বুদ্ধের স্বর্ণ নির্মিত একটি মূর্তি নির্মাণ করান (Takakusu, 1924-34:706-707)। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে রাজা প্রসেনজিৎের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। দু'জনেরই ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে, শ্রাবণ্তীতে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি জনগণকে শ্রদ্ধা সহাকারে পূজা করতে দেখেছেন (Watters, 1996:368, 384.)। তবে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্বেক্য রয়েছে।

২.১.২.২. শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক (খ্রি: পঃ: ৬ষ্ঠ শতক)

অনাথপিণ্ডিক ছিলেন কোসল রাজ্যের শ্রেষ্ঠী। তিনি ছিলেন শ্রাবণ্তীর অধিবাসী। তাঁর গৃহী নাম ছিল সুদন্ত। পালি সাহিত্য পাঠে জানা যায় সুদন্ত অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো দরিদ্র, অনাথ বা ভিক্ষারি তাঁর গৃহ থেকে কখনো খালি হাতে ফিরে যেতেন না। তিনি দরিদ্র ও অনাথের অন্নদাতা ছিলেন বলে তিনি খ্যাত হন ‘অনাথপিণ্ডিক’ নামে। মঞ্জিম নিকায়ের অট্টকথা পপঞ্চসূন্দনী এবং উদান অট্টকথায় উল্লেখ আছে, অনাথপিণ্ডিক কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে শ্রাবণ্তীতে জেতবন বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন (Woods & Kosambi, 1922:50; Woodward, 1926:56.)। বিহার দানের এ ঘটনা

তরঙ্গত শিল্পের একটি মেডালিয়ানেও উৎকীর্ণ আছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ত্রিপিটকে এই বিহারের নাম বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। ধম্মপদটুকথা, বুদ্ধবৎস অট্ঠকথা, অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্ঠকথা মনোরথপূরণী প্রভৃতি গ্রন্থ হতে জানা যায় বুদ্ধ সর্বমোট উনিশটি বর্ষাবাস এ বিহারে উদযাপন করেন (Norman, 1906:4; Horner, 1946:3; Walleser, 1924:314)। বুদ্ধ এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেন। কোশলরাজ প্রমেনজিঙ এ বিহারেই দীক্ষিত হন। সুপরিকল্পিত ও নান্দনিক বিহার স্থাপত্যের অন্যন্য নির্দশন হলো অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহার। বিহারটি সুবিশাল সম্মেলন কক্ষ, ভিক্ষুসংঘের বসবাসের কক্ষ, উপাসনাগৃহ, কৃপ, স্নানাগার, দেশনা মঞ্চ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল (Law, 1954:87)।

সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহামতি সন্দ্রাট অশোক পাঁচটি বৃহৎ ইমারত সমষ্টিত জেতবন বিহার পরিদর্শন করেন (সরকার, ১৯৯৭:১৯৭)। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন বিহারটি সাতটি অংশে বিভক্ত ছিল বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, নানা ধরনের মৈবেদ্য, কার্লকার্যময় ধর্মজা, শামিয়ানা প্রভৃতি দ্বারা বিহারটি পরিপূর্ণ থাকত। হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণে এসে জেতবন বিহার পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখেন বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি এ বিহারের অতীত ঐতিহ্যের কথা এবং বিহারের আয়তন সম্পর্কে নানান তথ্য তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। উক্ত তথ্য মতে, বিহারের আয়তন ছিল ৮০ চিঙ বা প্রায় ১৩০ বর্গ একর। আরেক তথ্য মতে, আয়তন ছিল ১০ লি বা দুই মাইল। যেখানে ছিল উপাসনা কক্ষ, ধ্যান-সাধনার কক্ষ, ভিক্ষুসংঘের আবাসকক্ষ, স্নানাগার, চিকিৎসালয়, স্বচ্ছ পানির কৃপ প্রভৃতি। এছাড়া, একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল। পাঠাগারটি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও বৈদিক ধর্ম-দর্শনের পুস্তক ছাড়াও সমকালীন শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকে ভরপুর ছিল (Watters, 1996:386)। বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের গোড়া জেলার সাহেট-মাহেট নামক স্থানকে বিহারটি অবস্থান স্থল হিসেবে শনাক্ত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে সাহেট ও মাহেট অঞ্চলে ব্যাপক খনন কার্য চালানো হয়। ফলে মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণযুগের বিভিন্ন স্থাপত্য ও মৃত্যি আবিস্কৃত হয়। এ কারণে ধারণা করা হয় বুদ্ধের সময়ে এ বিহার নির্মিত হলেও বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হওয়ায় বুদ্ধ পরবর্তী অনেক রাজবংশ এ বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখেন। অপূর্ব স্থাপত্যশৈলির নির্দশন জেতবন বিহারের কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনাথপিণ্ডিকের নাম অমর হয়ে আছে।

২.১.২.৩. শ্রেষ্ঠীকন্যা বিশাখা (খ্রি: পৃঃ ৬ষ্ঠ শতক)

বৌদ্ধ ইতিহাসে মহা-উপাসিকা নামে খ্যাত বিশাখা ছিলেন মগধের ভদ্রীয় নগরের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং শ্রাবণ্তীর মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধু। বিশাখার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন নিহিত নাথপুত্র তথা আজীবিক ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু বিশাখা ছিলেন বুদ্ধের ধর্মের অনুসারী। বিশাখার একাত্তিক প্রচেষ্টায় মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে এবং বিশাখার কল্যাণে মিগার শ্রেষ্ঠী জ্ঞানচক্ষু লাভ করেছিলেন বিধায় তিনি তাঁকে মাত্ সমোধন করতেন। এ কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা ‘মিগার মাতা’ নামেও পরিচিত। ধম্মপদটুকথায় উল্লেখ আছে, বুদ্ধ শ্রাবণ্তীতে অবস্থানকালে বিশাখা তাঁর শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠীকে সাথে নিয়ে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে প্রতিদিন মহা দানকার্য সম্পাদন করতেন। বুদ্ধশিষ্য মোঞ্চল্লায়ন স্থাবিরের তত্ত্বাবধানে বিশাখা কোটি ষষ্ঠ মুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবণ্তীর পূর্বপ্রান্তে ‘পূর্বারাম বিহার’ নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। বিনয়পিটকে উল্লেখ আছে, দ্বিতীল বিশিষ্ট বিহারটিতে থায় সহস্র কক্ষ ছিল (Chaudhury, 1982:74)। তৎকালীন প্রসিদ্ধ জেতবন বিহারের পূর্ব পাশে এ বিহারের অবস্থান ছিল বলে এ বিহারের নামকরণ করা হয় পূর্বারাম। চৈনিক পরিব্রাজক

फा-हियेन ए विहारेर अबस्थान उल्लेख करेन जेतवन विहारेर छय वा सात लि उत्तर-पूर्वे (Watters, 1996:400)। बर्तमान उत्तर-भारतेर साहेट-माहेट छानेइ उक्त विहार अवस्थित छिल बले धारणा करा हय। ए विहारे बुद्ध छयाटि वर्षावास पालन करेन एवं ए विहारे बुद्ध अङ्गार्ण्य (दीर्घनिकाय), उट्ठान (सुत्तनिपात), अरियपरियेसण, गणकमोङ्गलानसुत (मञ्जिमनिकाय), पासादकम्पन (संयुक्तनिकाय), विघासजातक प्रत्ति सूत्र भाषण करेन। त्रिपिटकेर सूत्रसमूहेर मध्ये बुद्ध कोन अखले कयाटि सूत्र देशना करेन ए सम्पर्के ओडव्हार्ड (Woodward) विस्तर गवेषणा करेन। मालालासेकेरा (Malalasekera) उक्त गवेषणार उद्धृति दिये बलेन-

“बुद्ध चतुर्निकायेर ८७१टि सूत्र शारीते, ८४४टि सूत्र जेतवने, २३टि पूर्वारामे एवं ४टि शर्वारामले भाषण करेन। सूत्रसमूहेर मध्ये ६टि दीर्घनिकाये, ७५टि मञ्जिमनिकाये, ७३६टि संयुक्तनिकाये एवं ५४टि अঙ्गनिकाये अत्तर्तुक रयेहे।” (Malalasekera, 1998:1127)

२.२. बुद्ध परबर्ती राजन्यवर्गेर अवदान

बुद्ध परबर्ती येसर राजवंश बौद्धधर्म ओ शिल्पकलार अत्तुतपूर्व प्रचार-प्रसारेर अवदान राखेन ताँदेर मध्ये उल्लेखयोग्य हलो शिशुनाग राजवंश, मौर्य राजवंश, शुग्र राजवंश, इन्द्रेत्रीक राजवंश, कुषाण राजवंश, सातवाहन राजवंश, गुप्त राजवंश, पाल राजवंश। शिशुनागवंश छाडा अन्यान्य राजन्यवर्गेर समयकाले बोद्ध शिल्पकलार व्यापक चर्चा परिलक्षित हय। शिशुनागेर पुत्र कालासोक वा काकबर्ण द्वितीय संगीतिर आयोजन ओ पृथग्पोषकता करे बौद्धधर्मेर इतिहासे अमर हये आছेन। परबर्तीते शिशुनागवंशेर राजा शूरसेन ओ राजा महापद्मनाभ बौद्धधर्मेर कल्याणे विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करेन। तबे ए समयेर कोनो उल्लेखयोग्य शिल्प निर्दर्शनेर प्रमाण पाओया याय ना। बोद्ध शिल्पकलाय बुद्ध परबर्ती विभिन्न राजन्यवर्गेर अवदान निम्ने उपस्थापन करा हलो।

२.२.१. मौर्य राजवंश: सम्राट अशोक (ख्रि: पूः २७३-२३२ अद्व)

भारतेर इतिहासे मौर्यदेर आविर्भाव घटे ख्रिस्टपूर्व चतुर्थ शताब्दीर शेषभाग हते। मौर्यवंशेर प्रथम सम्राट छिलेन चन्द्रगुप्त मौर्य (ख्रिस्टपूर्व ३२४-३०० अद्व)। तिनि बौद्धधर्मेर अनुसारी छिलेन किना तार कोनो सठिक प्रमाण पाओया ना गेलेओ ताँर समये ग्रीक रचनाबलीते बोद्ध श्रामण-भिक्षुदेर नामोल्लेख पाओया याय (Mookerji, 1943:299-302)। चन्द्रगुप्तेर मृत्युर पर ताँर पुत्र विन्दुसारेर सम्राज्येर दायित्वार ग्रहण करेन। तिनि पंचिश बद्दसर राजत्व करे सम्राज्येर सीमाना विस्तृत करेन। ब्राह्मण्यधर्मेर प्रति ताँर अनुरागेर तथ्य पाओया गेलेओ बौद्धधर्मेर प्रति ताँर मनोभाव सम्पर्के किछुइ जाना याय ना। मौर्यराजवंशेर तृतीय सम्राट छिलेन अशोक। सिंहली ऐतिहासिक ऐतिह्य महाबंस ग्रहेह उल्लेख आछे, विन्दुसारेर शताधिक पुत्रेर मध्ये अशोक छिलेन सर्वापेक्षा तेजस्वी, बलवान एवं खद्दिसम्पन्न (बड्ड्या ओ तालुकदार: २०११:६८)। विश्वसभ्यतार इतिहासे अशोक एकटि विशिष्ट छान अधिकार करे आछे। तिनि छिलेन मौर्य सम्राज्येर श्रेष्ठ ओ ख्यातिमान सम्राट। बौद्धधर्मेर इतिहासे सम्राट अशोक विशिष्ट छान अधिकार करे आछे। बौद्धधर्मेर प्रति व्यक्तिगत अनुराग एवं बुद्धेर प्रति तिनि परम श्रद्धावान छिलेन। तिनि बौद्धधर्मके विश्वधर्मेर रूपायन, चिरस्थिति एवं अनुब्यञ्जना दाने समृद्ध करे चिरस्मरणीय हये आछेन। बौद्धधर्मेर ताँर अवदान एक नजरे निम्नरूपः

- तृतीय संगीतिर आयोजन ओ पृथग्पोषकता।
- त्रिपिटक संकलन।

- ভিক্ষুসংঘকে বিশুদ্ধিকরণ।
- বৌদ্ধধর্মের প্রচারের নিমিত্ত বহির্ভারতের নয়টি স্থানে ধর্মদৃত প্রেরণ।
- চুরাশি হাজার স্তুপ প্রতিষ্ঠা।
- বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিভ্রমণ এবং ধর্মবাণী সম্বলিত স্তুপ প্রতিষ্ঠা।
- চৈত্য-বিহার সংস্কার, বুদ্ধের জীবন কাহিনী চিত্রায়নপূর্বক স্তুপ সজ্জিত করণ ইত্যাদি।
- বুদ্ধবাণীর মর্মকথার আলোকে অনুশাসন প্রচার।

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাসে স্ম্যাট অশোকের অমর কীর্তি বা নির্দশন হলো বৌদ্ধস্তুপ। কথিত আছে স্ম্যাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে চুরাশি হাজার স্তুপ-স্তুপ নির্মাণ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য অশোকাবদান, থৃপবৎস, দীপবৎস এবং মহাবৎস প্রভৃতি গ্রন্থে এর সত্যতা পাওয়া যায়। সিংহলি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মহাবৎস এবং থৃপবৎস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে স্ম্যাট অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের কাছে বিশেষত মোগ্গলিপুত্র স্থাবিরের মুখে বুদ্ধবাণীর চুরাশি হাজার বিভাগ বা ধর্মস্কন্দের কথা জানতে পেরে স্ম্যাটের চুরাশি হাজার স্থানে বিহার, স্তুপ ও স্তুপ নির্মাণ করেন (Jayawickrama, 1971:52)। বৌদ্ধ স্তুপ-স্থাপত্যের ইতিহাস জানার জন্য বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় গ্রন্থ হলো থৃপবৎস। এ গ্রন্থে রাজা অজাতশত্রু ও স্ম্যাট অশোক কর্তৃক বুদ্ধের দেহাবশেষ কেন্দ্রিক স্তুপ নির্মাণের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। থৃপবৎস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৌর্য স্ম্যাট অশোক রাজা অজাতশত্রু নির্মিত স্তুপ পুনঃউন্মোচিত করেন এবং তা হতে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ সংঘর্ষ করে চুরাশি হাজার স্তুপে পুনঃবিভাজন করে সংরক্ষণ করেন। অশোকাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে, স্ম্যাট সোনা, রূপা ও বৈদুর্যে অলংকৃত চুরাশি হাজার মূল্যবান পেটিকা তৈরি করে সেখানে একটি করে দেহাবশেষ রাখেন। তাছাড়া তিনি তৈরি করেন চুরাশি হাজার ‘কুস্ত’ এবং তাদের ঢাকনির জন্য চুরাশিহাজার বিভিন্ন বর্ণের ‘পল্ল’ (রেশমী বন্ধনী)। পরে সেগুলো জমুদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত স্তুপে স্থাপন করা হয় (Mukhopadhyaya, 1963:53)। এ চুরাশি হাজার সংখ্যা নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তা হলো, মানুষের দেহে আছে চুরাশি হাজার পরমাণু। তাই স্ম্যাট অশোক চেয়েছিলেন মহামানব বুদ্ধের প্রতিটি পরমাণুকে সম্মান করতে এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র জমুদ্বীপে তথা ভারতবর্ষে চুরাশি হাজার স্তুপ নির্মাণ করেন (বড়ুয়া, ২০০২:৩১)।

অনেক ইতিহাসবিদ চুরাশিহাজার সংখ্যাটি সাংকেতিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে একাধিকবার চুরাশিহাজার স্তুপের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে একশোর বেশি স্তুপ দেখেছেন বলে তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ যে সকল স্তুপের কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে তক্ষশীলায় দুইটি, কাশ্মীরে চারটি, মথুরায় তিনটি, স্থানেশ্বরে একটি, অযোধ্যায় একটি, প্রয়াগের চম্পক উদ্যানে একটি, জেতবনে তিনটি, কপিলাবস্তুতে তিনটি, লুম্বিনীতে একটি, রামগামে দুইটি, কুশীনগরে একটি, সারলাথ বারাণসী বরুণা নদীর পশ্চিমে একটি, পাটলিপুত্রে দুইটি, গয়া শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি, গয়ার বৌধিবৃক্ষের অনতিদূরে দক্ষিণে একটি, রাজগৃহ ক্রন্দবানু বনের পূর্বে একটি, রাজগৃহ ক্রন্দবানু বনের পূর্ব স্তুপের উত্তর-পশ্চিমে একটি, নালন্দায় চারটি, পুঁত্রবর্ধনে একটি, সমতটে একটি, তম্রলিপ্তে একটি, কর্ণসুরে একটি, কলিঙ্গে একটি অন্যতম (বড়ুয়া, ২০০২:৩২-৩৪; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৪)। তবে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে ভারতের প্রাচীনতম স্তুপের মধ্যে সাঁচীস্তুপ ও ভরহতস্তুপের নামেল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বেণীমাধব বড়ুয়া (Beni Madhab Barua) উল্লেখ করেন

যে, হিউয়েন সাঙ- এর ভারত ভ্রমণের পূর্বে প্রসিদ্ধ এ স্তুপ দুটি শক্রদের দ্বারা প্রভৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং একসময় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় (Barua, 1946:75)। সম্ভবত এ কারণে হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্তুপ দুটির কথা উল্লেখ করেননি। সন্দ্রাট অশোক নির্মিত সাঁচীস্তুপ ও ভরহৃতস্তুপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ।

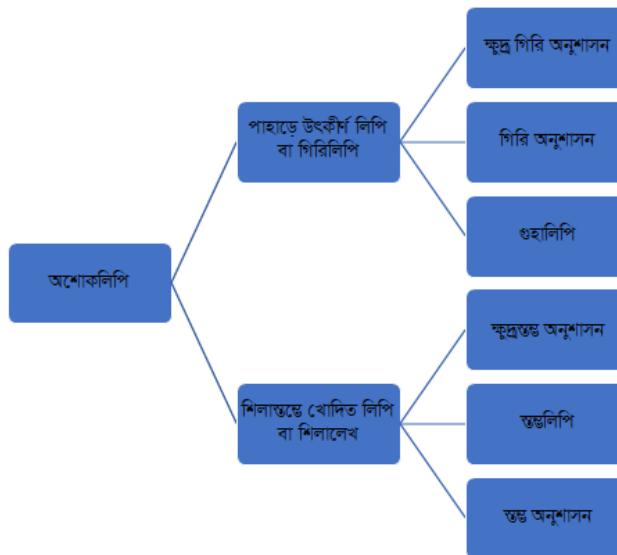
বৌদ্ধ স্থাপত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং পাথর স্থাপত্যের দুর্লভ সুপ্রাচীন নির্দেশন হলো সাঁচী স্তুপ। এটি ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভূগোল থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে বেসনগরের (পুরাতন বিদিশানগর) সন্নিকটে অবস্থিত। সন্দ্রাট অশোক এ স্তুপটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত বুদ্ধের অগ্রগ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন ছবিরের দেহধাতু বা দেহাবশেষ সংরক্ষণের জন্য। স্তুপটির উচ্চতা ১৬.৪৬ মিটার এবং ব্যাসার্ক ৩৬.৬০ মিটার। স্তুপ নির্মাণে পার্সিয়ান হীক ও দেশজ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যার সম্মিলন লক্ষ করা যায় (সরকার, ১৯৯৭:৩১)। এ স্তুপটি সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয় ১৮২২ সালে। খননকার্য চালিয়ে স্তুপের ভেতর থেকে একটি পাথরের সম্পুটে সারিপুত্র-মৌদগলায়নের দেহাবশেষ বা অস্থি ধাতু এবং অপর একটিতে মুক্তা, ফটিক, পান্ডা, নীলা ও জীপসামের তৈরি জপমালার গুটিকা উদ্ধার করা হয়। স্তুপে আরোহণের জন্য দুই দিকে প্রসারিত দুটি সোপন আছে। দেয়াল প্রাচীরে ঘেরা স্তুপের চারদিকে চারটি অলঙ্কৃত প্রবেশদ্বার বা তোরণ রয়েছে। তোরণগুলো বুদ্ধের জীবন কাহিনী এবং জাতক কাহিনী চিত্রায়িত রিলিফ বা ফলক দ্বারা অলঙ্কৃত। রিলিফে বুদ্ধের জীবন আখ্যান চিত্রায়িত হলেও তাতে বুদ্ধকে মূর্তি দ্বারা উপস্থাপন করা হয়নি। হাতি, ঘোড়া, বোধিবৃক্ষ, চক্র, পদচিহ্ন, ছত্র, স্তুপ প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধের উপস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতীকের মাধ্যমে বুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। হাতি সিদ্ধার্থের মাত্রগর্ভে প্রতিসঙ্গি গ্রহণের প্রতীক, অনুরূপভাবে ঘোড়া গৃহত্যাগের, বোধিবৃক্ষ বুদ্ধত্বলাভের, চক্র সারানাথে প্রথম ধর্মপ্রচারের এবং স্তুপ মহাপরিনির্বাণের প্রতীক। এ কারণে ধারণা করা হয় যে, সন্দ্রাট অশোকের সময়ে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়নি। প্রথ্যাত প্রাতৃত্ববিদ সাধন চন্দ্র সরকার ধারণা করেন তোরণগুলো বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ তোরণটি সবচেয়ে থাচীন (সরকার, ১৯৯৭:৩২)। এ তোরণের অন্দরে ১২.৮ মিটার উচু অশোক স্তম্ভের ভাস্তবাবশেষ রয়েছে, যার উপরে ছিল সিংহমূর্তি। স্তম্ভের গায়ে ব্রাহ্মীলিপিতে অশোকের বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। উল্লেখ্য যে, অশোক নির্মিত স্তম্ভের উপরে চারটি অপূর্ব সিংহমূর্তি ছিল, যা এখন ভারতবর্ষের জাতীয় প্রতীক হিসেবে সমাদৃত।

শ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার সবচেয়ে সৃজনশীল অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাথর কেটে গুহা-মন্দির, গুহা-চৈত্য, স্তুপের তোরণ ও রেলিং নির্মাণের সংস্কৃতি এ সময় বেশী উৎকৰ্ষ লাভ করে। এ সময়ে বুদ্ধগয়া, ভরহৃত, সাঁচী, অমরাবতী, ভাজা, নাসিক, অজন্তা, ইলোরাসহ বিভিন্ন স্থানে নানা বৌদ্ধ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সন্দ্রাট অশোক নির্মিত ভারতবর্ষের আরেকটি প্রসিদ্ধ স্তুপ হল ভরহৃত স্তুপ। স্তুপটি মধ্যভারতের এলাহাবাদ ও জম্বলপুরের মধ্যবর্তী সাতনা জেলার ভরহৃত থামে অবস্থিত। বহু বছর স্তুপটি জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। স্তুপটি ইষ্টক নির্মিত ছিল এবং বাহিভাগ চূর্ণ প্রভৃতি প্লাস্টার দ্বারা আবৃত ছিল। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম সর্বপ্রথম ১৮৭৩ শ্রিষ্টাব্দে স্তুপটির সন্ধান পান। স্তুপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এর আকার ও আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান করা হয় এ স্তুপের আবেষ্টনীটি সাঁচী স্তুপের মত গোলাকার ছিল। স্তুপগর্ভে বুদ্ধের দেহাবশেষ রেখে সন্দ্রাট অশোক স্তুপটি নির্মাণ করেন বলে পঞ্চিগণ ধারণা করে থাকেন। এখান থেকে কয়েকটি প্রাচীরের স্তুপের কিছু ভাস্তবাবশেষ

এবং চারটি অলঙ্কৃত তোরণ উদ্বার করা সম্ভব হয়েছিল। যেগুলো বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরসহ বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভরহৃত স্তুপের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ অসাধারণ শিল্পকর্মের মধ্যে মহামায়ার স্বপ্নদর্শন- বোধিসত্ত্বের হাতির বেশে মাতৃজঠরে প্রবেশ, মার বিজয়, মহাবোধিবৃক্ষের তলে বুদ্ধত্বলাভ, স্বর্গীয় দেবতাগণ কর্তৃক বুদ্বের কেশ-ছেদন, বুদ্বের সাথে রাজা প্রসেনজিঙ্গ ও অজাতশত্রুর সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহাকপি জাতক, নলিনিকা জাতক, লট্টকা জাতক, ছদ্মত জাতক, স্বর্ণমৃগ জাতক, বেস্তস্তর জাতক, মহাজনক জাতক, বিধুর পশ্চিম জাতক প্রভৃতি জাতক কাহিনী খোদাই করে প্রস্তরগাত্র অলংকৃত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানেও বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের চরিত্রগুলো বিভিন্ন প্রতীকীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া স্তুপসমূহে দণ্ডয়মান অবস্থায় যক্ষ-যক্ষী দ্বারপাল মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মূর্তিগুলির আকৃতি প্রায় একরকম, কোনোটি গোল, কোনোটি ডিম্বাকৃতি, কোনোটি দুষৎ চ্যাপ্টা। এগুলোকে ভারতীয় মূর্তিকলার প্রাণশক্তির আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয় (সরকার, ১৯৯৭:২৩; আলম, ২০০৫:২৭৬)।

স্মার্ট অশোক নির্মিত অসংখ্য স্তুপের অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। অনেক স্তুপ, চৈত্য এখনো অনাবিকৃত। তবে কিছু স্তুপ জীৰ্ণ-শীর্ণ অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ভরহৃতস্তুপ, ধামেকস্তুপ, সাঁচীস্তুপ, অমরাবতীস্তুপ, তক্ষশীলার ধর্মরাজিকস্তুপ, চৌখন্তী স্তুপ, নালন্দা সারিপুত্র স্তুপ, লুম্বিনী স্তুপ, কুশীনগর বা কুসীনারা স্তুপ, বৈশালী স্তুপ, শ্রাবণ্তী স্তুপ। জানা যায়, স্মার্ট অশোক মূলত গৌতম বুদ্বের স্মৃতি বিজড়িত প্রায় প্রতিটি স্থানে স্তুপ-স্তুপ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বুদ্বের জন্মস্থান বর্তমান নেপালে লুম্বিনী স্তুপ এবং স্তুপলিপি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে খননকাজ করে প্রাপ্ত স্তুপলিপি, স্তুপের ভগ্নাবশেষের মাধ্যমে লুম্বিনী তথা বুদ্বের জন্মস্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধ সারনাথের যে স্থানে বসে পঞ্চবৰ্ণীয় ভিক্ষুদেরকে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করেছিলেন সে পরিবত্র স্থানের স্মৃতি চিরজাগরণক রাখার জন্য সেস্থানে স্মার্ট অশোক ধর্মরাজিক স্তুপটি খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে নির্মাণ করেন। এই স্তুপের মধ্যে দেহভূমি, কতিপয় মুক্তা ও স্বর্ণনির্মিত পাত্র পাওয়া গেছে (সরকার, ১৯৯৭:৪২)। অনুরূপভাবে স্মার্ট অশোক তাঁর বৌদ্ধতীর্থ স্থান পরিভ্রমণকালে বুদ্বের ধর্মপ্রচারের বিভিন্ন স্থানে এবং মহাপরিনির্বাণ স্থানে শিলালিপিসহকারে স্তুপ-স্তুপ নির্মাণ করেন। অশোক স্তুপ স্থাপত্যের অন্যন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্তুপ গাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্বের জীবন চরিত উপস্থাপন। বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং জাতকের কাহিনী খোদাই করে স্তুপগাত্রে অলংকৃত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে স্তুপের সন্নিকটে অশোক নির্মিত নানা ধরনের স্তুপ এখনো অতীতের গৌরব-কীর্তি বহন করে চলেছে। অনেক স্তুপে শিলালিপি উৎকীর্ণ হওয়ায় সঠিকভাবে অশোকের জীবন চরিত রচনা করা যেমন সহজ হয়েছে তেমনি বুদ্ধ জীবনের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ খুব সহজে চিহ্নিত করা সম্ভবপ্রয়োগ হয়েছে। এর ফলে নানা বিষয়ে বিতর্ক নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। পার্শ্বাত্মক পর্যটক এবং পশ্চিমগণ যখন অশোক স্তুপগুলো আবিষ্কার করেন তখন এসব স্তুপের সৌন্দর্য ও গঠনশৈলী তাঁদেরকে মুক্ত করেছিল। স্তুপগুলোর মসৃনতা দেখে কোনো কোনো পশ্চিম পিতলের স্তুপ বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কোনো কোনো পশ্চিম এগুলোকে মর্মরপ্রস্তরের স্তুপ বা ছাঁচে-চালাই ধাতু বলে অভিহিত করেছেন (বড়ুয়া, ২০০২:৩৬)।

স্মার্ট অশোকের আরেকটি অমর কীর্তি হলো লিপি বা অনুশাসন। তাঁর উৎকীর্ণ লিপি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে অশোক লিপির ধরণ উপস্থাপন করা হলো:



সম্রাট অশোকের উৎকীর্ণ লিপি বিশ্লেষণ করে ধর্ম, জনগণ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় সম্রাট অশোকের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্য; পিতা-মাতা ও বয়োজ্যস্থদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশনা; প্রাণীকূলের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন; ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান নীতির সার্থক প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সম্রাট অশোক রাজাঙ্গা প্রদান করেন, যা অনুশাসনাকারে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সাধারণ জনগণের নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর ছিল অকৃষ্ট প্রয়াস। এসব কারণে অনেক ইতিহাসবিদ সম্রাট অশোককে অনুশাসনের মাধ্যমে রাজধর্ম প্রচার প্রসার করার প্রথম সম্রাট বলে অভিহিত করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

“.....Asoka seems to be one of the few politicians of the world who realized that propaganda is more important than legislation in matters relating to the people’s inclinations and sentiments” (Sircar, 1975: 24).

মূলত এসব শিলালিপির মূল উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও ধর্মপ্রচার হলেও এগুলোকে সম্রাট অশোকের জীবনী রচনার অমূল্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সপ্তম স্তুতিলিপি এবং নেপালের তরায় অঞ্চলে অবস্থিত রূপ্লিনদেবী ও নিশ্চিভা স্তুতের অনুশাসন থেকে জানা যায় অশোকের উপাধি ছিল দেবানন্দপিয় পিয়দস্ত্রি রাজা। অভিযন্তের ১২ বছর পরে তিনি যে ধর্মীয় অনুশাসন জারি করা শুরু করেন তা অশোকের ষষ্ঠ স্তুতি অনুশাসন থেকে জানা যায়। কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা যে তাঁর মনে গভীর মনস্তাপ ও অনুশোচনা সৃষ্টি করেছিল তা ত্রয়োদশ গিরি অনুশাসন থেকে জানা যায়। দ্বিতীয় কলিঙ্গ অনুশাসন প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর জনসাধারণকে নিজের সন্তানের মতো জানতেন এবং ভালোবাসতেন। এই অনুশাসনগুলো থেকে সম্রাট অশোক কর্তৃক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃপ খনন, ছায়াদানের উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপন, উষধিবৃক্ষ, গণ-উদ্যান এবং চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতির কথা জানা যায়। এ কারণে অশোকের শাসনামলে সংগঠিত নানা ঘটনা বা ইতিহাস জানার জন্য অনুশাসনগুলোকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ D. C. Ahir তাঁর *Asoka the Great* গ্রন্থে অশোক অনুশাসনের তথ্যবহুল একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সে তালিকায় অনুশাসনের স্তূল, অবস্থান, রাজাজ্ঞা এবং আবিষ্কারের বর্ষ সম্পর্কে গ্রহাকার চমকপ্রদ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অনুশাসনগুলো বিয়ালিশটি জায়গায় আবিস্কৃত হয়েছে, তন্মধ্যে ছত্রিশটি ভারতে, দুইটি নেপালে, দুইটি পাকিস্তানে এবং দুইটি আফগানিস্তানে (Ahir, 1995:172-175)। আবিস্কৃত অনুশাসনের তথ্য নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

দেশ	অনুশাসনের ধরন	স্থানের সংখ্যা
ভারত	মুখ্য গিরি অনুশাসন	৭ টি
	ক্ষুদ্র গিরি অনুশাসন	১৮ টি
	গুহালিপি	১ টি
	মুখ্য স্তৱানুশাসন	৬ টি
	ক্ষুদ্র স্তৱানুশাসন	৪ টি
নেপাল	স্তৱলিপি	২ টি
পাকিস্তান	মুখ্যগিরি অনুশাসন	২ টি
আফগানিস্তান	ক্ষুদ্র গিনি অনুশাসন	২ টি

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অশোকের আরেকটি অমর কৌতুহল হল অশোকারাম বিহার। মহাবৎস, দীপবৎস, দিব্যাবদান, মিলিন্দপ্রশ্ন, সামন্তপাসাদিকা প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিহারের কীর্তিগাথা বর্ণিত আছে। মহাবৎস গ্রন্থে উল্লেখ আছে সন্তুষ্ট অশোক রাজধানী পাটুলিপুত্রে বিহারটি নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। সামন্তপাসাদিকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এ বিহারের নির্মাণ কাজের তদারকি করেন ইন্দ্রগুপ্ত থের (Law, 1954:209)। কিংবদন্তী অনুসারে সন্তুষ্ট অশোকের ছোট ভাই তিস্স এ বিহারেই শ্রামণ্যধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি এখানেই বসবাস করতেন। সন্তুষ্ট অশোক এ বিহারে বসবাসরত ভিক্ষুদের প্রত্যহ আহার দান দিতেন (Chaudhury, 1982:111)। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ Vincent A Smith দাবী করেন, বিহারটি সহস্র ভিক্ষুর বসবাসের উপযোগী ছিল এবং এর অবস্থান ছিল রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কিন্তু এটির সঠিক অবস্থান সন্দেশ করা যায়নি যা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়, কেননা সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্গের ভারত ভ্রমণের সময় এটি ধ্বংসাত্ত্বে পরিণত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন (Smith, 2013:110)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ মনোরম এই বিহারটি রাজগৃহের কাছে নালন্দায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভিক্ষু নাগসেনের গুরু ধর্মকীর্তি থের এ বিহারেই বসবাস করতেন (Davids, 1890:xxv)। দিব্যাবদান গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সিংহল দ্বীপের অনুরাধাপুরে যখন ঐতিহাসিক মহাস্তুপ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল তখন অশোকারাম বিহারের এক দল বৌদ্ধ ভিক্ষু সে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ বিহারটি স্মরণীয় হয়ে আছে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আয়োজনের জন্য। দীপবৎস অনুসারে তৃতীয় সংগীতি বুদ্ধের পরিনির্বাগের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পর মোঞ্চলিপুত্রতিস্স থেরোর সভাপতিত্বে সন্তুষ্ট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটুলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতিতে যে বুদ্ধবাণী ‘ধর্ম-বিনয়’ নামে আখ্যায়িত ছিল তৃতীয় সংগীতিতে সে ‘ধর্ম-বিনয়’ সুন্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকে বিভাজিত হয়ে ত্রিপিটক নামে আত্মপ্রকাশ করে (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০১০:৫৪)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অশোকারাম বিহার এবং সন্তুষ্ট অশোকের এ অবদান চিরভাস্থর হয়ে আছে। সিংহলী ঐতিহ্যে উক্ত আছে, সংগীতি সমাপনাত্তে সন্তুষ্ট অশোক ভারতবর্ষের বাইরে ধর্মপ্রচারের জন্য জ্ঞানী-গুণী ভিক্ষুদেরকে ধর্মদূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি সিংহলে

ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্র স্থবির এবং কন্যা সংঘামিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন। জানা যায়, মহেন্দ্র স্থবির তাঁর দল নিয়ে অশোকারাম বিহার থেকে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রারাষ্ট্র করেছিলেন। দীপবৎস এবং মহাবৎস গ্রাহণয়েও এর সত্যতা পাওয়া যায়।

২.২.২. শঙ্গ রাজবংশ (খ্রি: পূঃ ১৮৭-৭৫ অব্দ)

শঙ্গ সাম্রাজ্য ছিল মগধের একটি প্রাচীন সাম্রাজ্য, যা ১৮৭ থেকে ৭৫ খ্রিষ্টপূর্বে ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। শঙ্গ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন পুষ্যমিত্র শঙ্গ। বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুযায়ী তিনি ছিলেন মৌর্য বংশীয় শেষ শাসক বৃহদ্বথের সেনাপতি। তিনি ১৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শেষ মৌর্য সম্রাটকে হত্যা করে নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন (আন্তেনভা, লেভিন ও কতোভক্ষি: ১৯৮২: ১০৯)। পুরাণেও পুষ্যমিত্রকে শঙ্গ বংশীয় রাজা বলা হয়েছে। তবে দিব্যাবদান গ্রন্থে উক্ত আছে পুষ্যমিত্র ছিলেন মৌর্যবংশীয় এবং তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। পুষ্যমিত্র শঙ্গ ও ৬ বছর রাজত্ব করেন এবং পরবর্তীতে আরো দশজন শঙ্গ রাজা সর্বমোট ১১২ বছর রাজ্যশাসন করেন। জানা যায় শঙ্গরা ব্রাহ্মণধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শঙ্গদের অনুভূতি কেমন ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। দিব্যাবদান গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে নিষ্ঠুর শাসক এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তারনাথ পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধধর্মের শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জানা যায় তিনি বৌদ্ধদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন এবং বহু বৌদ্ধ স্তুপ, বিহার ও স্থাপনা ধ্বংস করেন। এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুর কর্তৃত মন্তকের জন্য শত স্বর্গমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া করেন (Raychaudhuri, 1972:345-346)। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক দাবী করেন শঙ্গরা ব্রাহ্মণধর্মের অনুসারী হলেও সে সময় বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কারণ শঙ্গ শাসনামলে নির্মিত সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যকীর্তির অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধ স্থাপত্যের নির্দশন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধারে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

শঙ্গ শাসনামলের বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ভরহত স্তুপের সমৃদ্ধি। স্তুপটির শিলালিপি ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক এ স্তুপটি সম্রাট অশোকের শাসনামলে নির্মিত হলেও এর সংস্কার ও পরিবর্ধনের কাজ শঙ্গ শাসনামলেও চলমান ছিল। এ কারণে শঙ্গ রাজার স্থাপত্যকর্ম ও পৃষ্ঠপোষকতার চরম নির্দশন হিসেবে এটি স্থীকৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণও প্রত্ননির্দশন বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভরহত স্তুপটির সকল অংশ অর্থাৎ স্তুপ, বেষ্টনী, তোরণ প্রভৃতি এককালে নির্মিত হয়নি (সরকার, ১৯৯৭:২৫)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্তুপের চারটি তোরণদ্বারের মধ্যে তিনটি তোরণদ্বার শঙ্গ শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল, যা তোরণদ্বারের স্তম্ভে শিলালিপিতে লিখিত আছে। প্রায় অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা পূর্ব তোরণটি শঙ্গ যুগের সামন্তরাজ বাঙ্গালী ধনভূতির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল বলে তোরণের বামপার্শ্বিত স্তম্ভে ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত আছে। তবে অনেকে ধারণা করেন যে তোরণগুলো বিভিন্ন শাসনামলে পুনর্নির্মিত কিংবা অংশবিশেষ সংযোজিত হয়েছিল। শঙ্গ শাসনামলে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ঐ সময়ে স্তুপের বিভিন্ন অংশ নির্মাণে বিভিন্ন দাতার দান প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (সরকার, ১৯৯৭:২৫)।

ভরহত স্তুপের মতো সাঁচী স্তুপেও শঙ্গ শাসনামলে পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁচী ভারতের প্রাচীনতম পাথর নির্মিত স্থাপত্য নির্দশন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সাঁচীর বিভিন্ন প্রত্ননির্দশন বিচার-বিশ্লেষণ করে দাবী করেছেন, ভরহত স্তুপের মতো সাঁচী স্তুপের সংস্কার ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজাদের অবদান রয়েছে। মৌর্য সম্রাট অশোক নির্মিত সাঁচীর বিশালতম স্তুপের

(১ নং স্তুপ) সাজ-সজ্জায় ও সংক্ষারে শুঙ্গ রাজাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। এ সময় স্তুপে আরোহণের জন্য দুটি প্রশস্ত সোপন পথ, প্রদক্ষিণ পথ, বেষ্টনী, শীর্ষ ও পাদদেশের অর্ধ গোলাকার অলঙ্কৃত ফলক প্রভৃতি শুঙ্গ নৃপতিগণের রাজত্বকালেই নির্মিত ও সংযোজিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ফলকগুলো পশ্চ-পাথি, লতা, পাতা ও মনুষ্যমূর্তিতে অলঙ্কৃত। ২য় ও ৩য় নং স্তুপের মেধি ও বেদিকা বেষ্টনীর বৈশিষ্ট্য বিচার করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, এসবের নির্মাণ ও পরিবর্ধনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন পুষ্যমিত্র সুস্নেহ বংশধর অশ্বিমিত্র (সরকার, ১৯৯৭:৩১)।

শুঙ্গ যুগের আরেক বিস্ময়কর স্মিকর্ম হলো পাথর কেটে নির্মিত গুহা মন্দির। এগুলো সাধারণত খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়। এরপে অসংখ্য বৌদ্ধ শিল্পকর্ম নির্মিত হয়েছিল যা উপমহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসকে নতুন মাত্রা দান করেছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অপূর্ব সময় পরিলক্ষিত হয় এ অনিদস্তুন্দর গুহামন্দিরগুলোতে। গুহামন্দিরের চৈত্যগৃহ গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. রফিকুল আলম নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন :

“চৈত্যগৃহকে স্থাপত্য না বলে বিশালাকৃতির ভাস্কর্য বলাই শ্রেয়। প্রথমে প্রধান স্তুপতি গুহার নকশা তৈরি করতেন। তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে কেটে বের করে আনা হতো ওপরের ছাদ। পরবর্তীকালে সেটিই সিলিং হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এরপর হাজার হাজার ফুট পাথর কেটে ভাস্করণ করার নির্মাণ করতেন বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও ভাস্কর্য” (আলম, ২০০৫: ২৭৫)।

ভাজা গুহা খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকে নির্মিত একটি অপূর্ব গুহা স্থাপত্য। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের পুনা জেলার ভাজা নামক গ্রামে এই গুহার অবস্থান। এখানে আঠারটি গুহা থাকলেও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিশাল দ্বাদশ সংখ্যক চৈত্যগৃহটি। এ চৈত্যকক্ষটি সমচতুর্ক্ষণ নয়, প্রান্তদেশটি অর্ধগোলাকার। চৈত্যের অভ্যন্তরে সাতাশটি স্তম্ভে ভর করা ধনুকাকৃতির ছাদ এবং উপাসনার জন্য একটি স্তুপ রয়েছে। স্তুপটি পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। বিনষ্ট হয়ে গেলেও সুস্থ পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, চৈত্যের ভিতরে প্রাচীর গাত্রে ফেঁকো চিত্র অঙ্কিত ছিল। চৈত্যের গাত্রে খোদিত আছে চলমান চার ঘোড়ার রথ, বিশালাকৃতির নগ নারী মূর্তি, ন্ত্যরত দম্পতীর ভাস্কর্য প্রভৃতি। চৈত্যের বহির্ভাগও কারুকার্যময়।

২.২.৩. ইন্দোচীন রাজবংশ: রাজা মিলিন্দ (খ্রি: পৃ: ১১৫-৯০ অন্দ)

মৌর্য সম্রাজ্য পতনের পর গ্রীকরা উত্তর-পশ্চিম ভারত, আফগানিস্তান, পাঞ্জাব ও সিঙ্গালদের উপত্যকা অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:২৬৯)। ইন্দোচীন সময়কার মুদ্রা হতে এ রাজ্যের ত্রিশজন শাসকের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় ইতিহাসে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত গ্রীক রাজাদের মধ্যে রাজা মিলিন্দ ছিলেন অন্যতম। ইতিহাসে যিনি মেনান্ডার, মেনান্দার, মিনান্দার নামেও খ্যাত ছিলেন। ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থের জন্য তিনি পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিখ্যাত এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছিল রাজা মিলিন্দের বৌদ্ধধর্ম-দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন এবং ভিক্ষু নাগসেনের উত্তরের উপর ভিত্তি করে। রাজা মিলিন্দের নানা প্রশ্নের আলোকে ভিক্ষু নাগসেন বিভিন্ন যুক্তি ও উপরা সহকারে প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মের গৃঢ়, তত্ত্ব বিষয়ক দুর্বোধ্য বিষয়গুলো মূলত আলোচ্য গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। যেমন; আত্মা, জন্ম-মৃত্যু, নির্বাণ, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, পুনর্জন্ম, ঋদ্ধি, কর্ম প্রভৃতি (মহাস্তুবির: 1995:xxii-xxx)।

মিলিন্দ প্রশ়িল্প পাঠে জানা যায় রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনের কাছে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি ভিক্ষুসংঘের বসবাসের জন্য বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষু নাগসেনকে দান করেন। মিলিন্দের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বাজাট'র নামক স্থানে তাঁর রাজত্বের পথগে বছরে রচিত একটি লেখ পাওয়া গেছে, যাতে বলা হয়েছে বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তথায় স্থাপন করা হয়েছে (হালদার, ১৯৯৬:৮০; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৭)। মিলিন্দের পরবর্তী রাজা এবং ধনাচ্য হীকরা যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা অগাথোক্লেস তাঁর সময়ে নির্মিত মুদ্রায় বৌদ্ধস্তুপ ও পবিত্র বৌধিবৃক্ষের চিহ্ন ব্যবহার করেন। সোয়াট উপত্যকা, তক্ষশীলা, সাঁচী প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান থেকে উদ্বারকৃত শিলালিপির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীক রাজন্যবর্গ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গ্রীকদের দ্বারা উক্ত স্থানগুলিতে নানা ধরনের বৌদ্ধ স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু বুদ্ধমূর্তি ও ভাস্কর্যের নির্দর্শন আবিস্কৃত হয়েছে যা ইন্দোগ্রীক রাজন্যবর্গের শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত (হালদার, ১৯৯৬:৮০-৮১)।

২.২.৪. কুষাণ রাজবংশ: সম্রাট কণিক (খ্রি. ১ম শতক)

কুষাণ সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কুজুল কদফিসেস। কুষাণদের আদি নিবাস ছিল চীন সংলগ্ন মধ্য এশিয়ার টুন-হ্যান এবং ছি-লিয়েন পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বর্তমান চীনের কান-সু প্রদেশ) এবং তাঁর ছিল ইউ-চি জাতিভূক্ত (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২:৩০৬)। মৌর্য সম্রাট অশোকের পরে কুষাণ রাজবংশের নৃপতিদের মধ্যে সম্রাট কণিক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের ধারণা তিনি খ্রিষ্টীয় ৭৮ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সফল শাসক, সুবিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী, দূরদর্শী, শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি, মুদ্রা, চীনা এবং গ্রীক ঐতিহ্য থেকে জানা যায় সম্রাট কণিক ক্ষমতায় এসে বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। পাঞ্চাব, কাশ্মীর, হারিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশের পূর্বমাল (সাঁচী) অঞ্চল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, ফিরগিজস্তান, চীনের পশ্চিমাঞ্চলে তাঘদুমবাশ, পার্মীয় বা সুঙ্গ লিঙ পর্বতের পূর্বদিক পর্যন্ত কণিক একটি বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজসীমা পশ্চিমে খোরাসান হতে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে খোটান হতে দক্ষিণে কোকন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (আন্তোনভা, লেভিন ও কতোভস্কি: ১৯৮২:১৫৯-১৬০; বড়ুয়া, ২০০৭:৩৮)। সম্রাট কণিকের সম্রাজ্যে দু'টি রাজধানী এবং একাধিক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। রাজধানীগুলোর একটি বর্তমান উজবেকিস্তানের ব্যক্তিগতে এবং অন্যটি হলো পাকিস্তানের পেশোয়ারে। সম্রাট অশোকের মতো সম্রাট কণিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যেসব কারণে অমরত্ব লাভ করেছিল তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

- সম্রাজ্য বিস্তার।
- বহির্ভারতের চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা।
- বৌদ্ধ সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা।
- চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা।
- বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর উদার নীতি।
- বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ।
- গান্ধার এবং মথুরা শিল্প-ভাস্কর্যে অবদান।

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাসে সন্দাট কণিক চিরভাস্তুর হয়ে আছেন। গান্ধার এবং মথুরা শিল্প-ভাস্কর্যে পৃষ্ঠপোষকতা দান সন্দাট কণিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, পারস্য শিল্প ভাস্করদের দ্বারা যে শিল্প সুষমার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা গান্ধার শিল্পকলা নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে এ শিল্পধারার বহমানতা ছিল (নেপাল, ২০১১:৩৮)। কুষাণ আমলকে গণ্য করা হয় গান্ধারের স্বর্ণযুগ হিসেবে। আর সন্দাট কণিকের শাসনামলে এ শিল্পধারা চরমভাবে সমৃদ্ধ ও উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন খুবই শিল্পানুরাগী। তিনি বৌদ্ধ স্তুপ, বিহার, সংঘারাম, বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব মূর্তিসহ নানা দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার হয়ে উঠে শিল্পকলার এক পরিব্রাজ্মি। সে সময়কার শিল্পকলার চরম নির্দর্শন জাতক কাহিনী খোদিত বহু চৈত্য, স্তুপ ও বিহার দেখতে সুদূর চীন থেকে পরিব্রাজকেরা গান্ধার ভ্রমণে আসত। তাঁর শাসনামলে পেশোয়ারে নির্মিত একটি স্তুপ যার সৌন্দর্য দেশী বিদেশী পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, সুঁ-উ, হিউয়েন সাঙ এবং আরব পর্যটক আলবেরনী এ স্তুপের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে এটি ছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে উচ্চতম স্তুপ। অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত এ স্তুপের উচ্চতা ছিল ৬৩৮ ফুট। ১৫০ ফুট উঁচু বেদীর উপর কাঠ দ্বারা নির্মিত ৪০০ ফুট উঁচু স্তুপটি তেরতল বিশিষ্ট ছিল। এর উপর ৮৮ ফুট উচ্চতার একটি লোহার থাম ছিল। পঞ্চম শতকে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন এ স্তুপের সৌন্দর্য দেখে মুক্ত হন এবং এ স্তুপকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্তুপ বলে উল্লেখ করেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণে এসে স্তুপটি ভগুদশাহসুন্দর অবস্থায় দেখেন বলে উল্লেখ করেন। সন্দাট কণিক পাঞ্জাবেও বুদ্বের স্মৃতি চিহ্ন স্বালিত অনেকগুলো স্তুপ নির্মাণ করেন। রাওয়ালপিণ্ডি হতে পঁচিশ মাইল দূরে পাঞ্জাবের মানিক্যালাতে অনেকগুলো কুশান স্তুপ আবিস্কৃত হয়েছে। এখানে কুষাণামলে নির্মিত বুদ্ধমূর্তিসহ নানা ধরনের প্রত্সামঙ্গী পাওয়া গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তুপটি আবিস্কৃত হয়েছে এখান থেকে দুই মাইল দূরে। যেখানে চারকোণা ধাতুনির্ধান পাত্রের অভ্যন্তরে মুদ্রা এবং লিপি সম্বলিত একটি সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। লিপিতে উক্ত আছে যে কুশানরাজ কণিক তাঁর রাজ্যাভিষেকের বর্ষে বুদ্বের পরিত্ব দেহাবশেষ বা অষ্টি ধাতু রক্ষার জন্য এই আরক চৈত্যটি নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া পাঞ্চবর্তী এলাকায় খননকার্যের ফলে বুদ্বের দুটি ভগ্ন মস্তকও পাওয়া গেছে। এ কারণে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের কাছে এ স্তুপের গুরুত্ব অত্যাধিক।

স্তুপের পাশাপাশি সন্দাট কণিক রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক বিহার বা সংঘারাম নির্মাণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কণিক বিহার, কুঙ্গলবন বিহার, মড়হংবন বিহার, পেশোয়ারের বৌদ্ধ সংঘারামের সোনালি ইতিহাস-ঐতিহ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙের বিবরণাতে এবং মধ্য এশিয়ার খোটানীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে এ মহাবিহারের কথা বর্ণিত আছে। এটি ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার মূল প্রাণ কেন্দ্র। এ বিহারকে কেন্দ্র করে ভারতীয়-গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারার একটি সমন্বিতরূপ আত্ম প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করেছিল। এ সংঘারাম বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ পেশোয়ারের বিখ্যাত কণিক চৈত্যের পশ্চিম ভাগ থেকে আবিস্কৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ শিল্পকলায় সন্দাট কণিকের আরেকটি অমর কীর্তির নাম মূর্তিশিল্প বা ভাস্কর্যকলা। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে খননকার্য চালিয়ে অনেক বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্বমূর্তি ও চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুপ্রস্ত। কিছুটা মতোদ্বৃত্ততা থাকলেও অনেক পাঞ্জিত ধারণা করেন আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের ইন্দুকুশ পর্বত গাত্রে খোদাই করা দণ্ডযামান বুদ্বের মূর্তিগুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে সন্দাট কণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত

হয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় প্রস্তরস্তে খোদাইকৃত ৪০ মিটার উচু প্রাচীন বুদ্ধমূর্তিও সন্দ্রাট কণিকের শাসনামলের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই গান্ধার অঞ্চলেই কুষাণদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। আদি বৌদ্ধ শিল্পের রীতি প্রতীক চিত্রগরীতি হতে সরাসরি বুদ্ধমূর্তির আবিভাব ঘটে। এ অঞ্চলে যে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয় তা হেলেনিস্টিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, বিশেষ করে রোমান মডেলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। কারণ মার্বেলে নির্মিত বুদ্ধমূর্তির গড়ন পোশাকের ভাঁজ এবং অলঙ্করণ-সবই হিক দেবতা এ্যাপোলোর অনুসরণে এবং সমসাময়িক রোমান ভাস্কর্যের অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল (আলম, ২০০৫:২৮২)। সন্দ্রাট কণিক বুদ্ধের মূর্তি ও ভাস্কর্য শুধু যে বিভিন্ন ছানে নির্মাণ করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায়ও দণ্ডযামান বুদ্ধের মূর্তি উৎকীর্ণ করেন। গান্ধারের ন্যায় মথুরা শিল্পকলাও সন্দ্রাট কণিকের বদান্যতায় পরিপন্থতা ও বিকাশ লাভ করেছিল। সারনাথ, শ্রাবণ্তী, কৌশামীতে কুষাণ যুগে নির্মিত অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সন্দ্রাট কণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত সারনাথ জাদুঘরে রক্ষিত ১০ ফুট উচ্চতা ও ৩ ফুট প্রশস্ত দণ্ডযামান বোধিসত্ত্বমূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কণিকের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে হৃবিষ্ণও বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জানা যায় তিনি হৃষিক্ষেত্রের নামক যে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন তা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাঙ এ বিহারও প্রমণ করেন বলে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া বুদ্ধগ্যার প্রসিদ্ধ মহাবোধি মন্দির তিনি সংস্কার করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় (হালদার, ১৯৯৬:৮৮-৮৯)। সমীক্ষায় দেখা যায়, কুষাণ যুগে গান্ধার ও মথুরা শিল্পচর্চা কেন্দ্রের মাধ্যমে মূর্তিশিল্পের ব্যাপক সমৃদ্ধি সাধিত হয়।

২.২.৫. সাতবাহন রাজবংশ (খ্রি: পৃ: ২৩০/৩০-খ্রি: ৩য় শতক)

সাতবাহন রাজবংশের রাজারা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা সিমুক। সিমুকের পরবর্তী রাজা ছিলেন কৃষ্ণ বা কণহ। তাঁরা ত্রাক্ষণ্য ধর্মের অনুসারী হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ রাজবংশের নৃপতিদের মধ্যে পুলুমায়ি এবং যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি বৌদ্ধধর্মে প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বলে বিভিন্ন প্রত্ন নির্দেশন হতে জানা যায়। সাতবাহন নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জুন্নার, অমরাবতী, ভাজা, নাসিক, ঘটসাল, ভট্টিপুল, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ গুহা-মন্দির ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল (বড়ুয়া, ২০১৬:১২২)। ইতিহাস প্রসিদ্ধ অমরাবতী স্তুপ দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ নদীর দক্ষিণ তীরে এবং অস্ত্র প্রদেশের গুটুর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাণ্তি শিলালিপি ও প্রত্ন নির্দেশন বিশ্লেষণ করলে স্তুপটি নির্মাণে বিভিন্ন রাজবংশের অবদানের কথা জানা যায়। শিলালিপিতে উক্ত আছে স্তুপটি মৌর্য সন্দ্রাট অশোকের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। স্তুপটি ভরঙ্গত ও সঁচী স্তুপের আদলে গড়া। এখানেও স্তুপগাত্রে বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও জাতক কাহিনী পাথরে খোদাই করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এখানে প্রাণ্তি আরেকটি শিলালিপি থেকে জানা যায় প্রাচীরের প্রদক্ষিণ পথ এবং স্তুপের কিছু অংশের সংক্ষার ও সংযোজনের কাজ সাতবাহন রাজাদের সময়কালে হয়েছিল। লিপিতে আরো উল্লেখ আছে, সাতবাহন নৃপতি পুলুমায়ির রাজত্বকালে (খ্রিষ্টায় ২য় শতকে) জনৈক উপাসক একটি ধর্মচক্র দান করেন (সরকার, ১৯৯৭: ৫৩)। সাতবাহন রাজাদের আরেক অমর কীর্তি হলো ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক গুহা স্থাপত্য। এখানে কারুকার্যময় ও সুন্দর চৰিশাটি গুহাগুছ রয়েছে। অনুমান করা হয় ১৮ নং গুহাটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং এটি খ্রিষ্টায় প্রথম শতকে তৈরি করা হয়েছিল। বিরাটকায় ২০ নং গুহাটি মূলত একটি বিহার। জানা যায় এটি আনুমানিক ১৭৪-২০২ খ্রিষ্টাব্দে সাতবাহন রাজ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির রাজত্বকালের সম্ম বর্ষে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এর পরিবর্ধন এবং সংক্ষার কাজ হয়। এখানে দণ্ডযামান অবস্থায় বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি ও পদ্মপাণির মূর্তি রয়েছে।

২.২.৬. গুপ্ত রাজবংশ (খ্রি. ৪৭-৬ষ্ঠ শতক)

গুপ্ত রাজবংশের অবদান ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বলা হয়ে থাকে গুপ্তদের আগমনের ফলে এ উপমহাদেশ একটি সংস্কৃতিবান শাসকগোষ্ঠী লাভ করে। মগধে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরা একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন (চট্টোপাধ্যায়, ২০০২: ৩৪৩)। গুপ্ত রাজবংশের প্রথম শাসক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। পরবর্তীতে ঘটোৎকচ, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত প্রমুখ রাজন্যবর্গ রাজ্য শাসন করেন। মূলত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁর সাম্রাজ্যভূক্ত হয়ে যায় এবং তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গুপ্ত ন্যায়িকদের শাসনামলে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্ম ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে তার কয়েকটির আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

মূর্তিশিল্প

মূর্তিশিল্প গুপ্ত শাসনামলের গৌরবনীয় কীর্তি। এ সময় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা ও সারনাথ। এ দুটি কেন্দ্রে গুপ্ত শাসনামলের অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। মূর্তি নির্মাণে এ সময় চুন-সুরক্ষি এবং বেলেপাথরের অধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অপূর্ব শিল্পশৈলীর জন্য গুপ্তযুগকে উত্তর ভারতীয় শিল্পকলার ‘সুবর্ণযুগ’ বলা হয়। মূর্তিতত্ত্ববিদগণ গুপ্তযুগের শিল্প সম্ভারকে ‘প্রক্ষপনী বা ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পযুগ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন (Rowland, 1967:215)। এই যুগে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির পাশাপাশি অন্যান্য পৃজ্য বৌদ্ধ সম্ভাবনার ভাস্কর্যও নির্মিত হয়। মথুরার বিখ্যাত দণ্ডয়মান বুদ্ধের মূর্তিটি চতুর্থ শতকের শেষে অথবা পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল। মূর্তির মাথার পেছনে খোদাই করা নকশাযুক্ত প্রভামণ্ডল রয়েছে। মূর্তি পর্যবেক্ষণ করলে শান্ত-সমাহিত ভাবগান্ধীর্যপূর্ণ এক প্রশান্তিময় অভিব্যক্তির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এছাড়া এলাহাবাদের কাছে মনকুয়ারে প্রাপ্ত মুগ্ধিত মস্তক বুদ্ধমূর্তি গুপ্ত যুগের শৈলিক উৎকর্ষতার অনন্য দৃষ্টান্ত। গুপ্ত শাসনামলের আরেকটি ভাস্কর্য হচ্ছে সারনাথে প্রাপ্ত পঞ্চম শতকে নির্মিত বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। চুনার বালিপাথরে নির্মিত ভাস্কর্যটির উচ্চতা ফুট ৩ ইঞ্চি। এটি গুপ্ত শিল্পকলার আদর্শ মডেল হিসেবে গৃহীত (আলম, ২০০৫:২৮৯)। মূর্তিটিতে হাত দুটি ধর্মচক্র মুদ্রায় বুকের কাছে তোলা রয়েছে। এর মাধ্যমে বুদ্ধের ধ্যানময় করণাময় রূপের প্রকাশ ঘটেছে। পেছনে রয়েছে কারুকার্যময় বিশাল প্রভামণ্ডল। প্রভামণ্ডলের দু'পাশে দুটি উড়ন্ত দেবতা রয়েছে। এছাড়া মূর্তিটিতে হরিণ এবং প্রার্থনারত শিষ্য দ্বারা সারনাথে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গুপ্তযুগের শেষের দিকে মূর্তি নির্মাণে ধাতব পদার্থ ব্যবহারের প্রবণতা বুদ্ধি পায়। বিশেষত বিহারের নালন্দা অঞ্চলে বিশাল আকৃতির প্রচুর ধাতব পদার্থের বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়।

গুহা চিত্র

গুপ্ত শাসনামলের আরেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বিস্ময়কর নির্দর্শন হলো অজস্তার গুহা চিত্র। এটিকে বলা হয় প্রক্ষপনী চিত্রকলার সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দর্শন। ভারতের মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদ শহর থেকে ১০২ কিলোমিটার উত্তরে জলগাঁও রেলস্টেশনের কাছে আজিত্তা বা অজিত্তা নামক ধামের প্রান্তে গুহামন্দিরগুলো অবস্থিত। ধারণা করা হয় গুহাগুলি দুটি পর্যায়ে নির্মিত, প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ আরম্ভ হয়েছি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, দ্বিতীয় পর্যায় নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় ৪০০-৬৫০

অন্দের মধ্যে। অজন্তায় বিশাল পর্বতের পাথর কেটে ৩০টি গুহামন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১নং, ২নং, ১৬নং, ১৭নং ও ১৯নং এ পাঁচটি গুহা গুপ্ত শাসনামলে নির্মিত হয় এবং গুহামন্দিরগুলো অপূর্ব বৌদ্ধ স্থাপনা, ভাস্কর্য ও চিত্রকর্মে সুশোভিত। নির্মাণ কোশলের দিক থেকে ১নং এবং ২নং গুহা অতুলনীয়। ১নং গুহাটি একটি বিহারধর্মী গুহা। বিশটি কারুকার্যময় স্তম্ভে এবং বর্গাকৃতির হলে ভাস্কর্য ও ফ্রেক্ষেচিত্রের সমন্বয় ঘটেছে। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের চিত্র ও পদ্মপাণির মূর্তি এ গুহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র ও মূর্তি। ১৭নং গুহাটি বৌদ্ধ গুহা মন্দির। এ গুহামন্দিরকে বলা হয় অজন্তা চিত্রের স্বর্ণ-ভাঙ্গার। এর প্রাচীর গাত্রে অসংখ্য জাতক কাহিনি আঙ্কিত আছে। এ গুহার মর্মস্পর্শী ও বিখ্যাত চিত্রকর্ম হলো ‘গোপা-রাঙ্গল-বুদ্ধ’ চিত্রটি। ১৯নং গুহাকে আদর্শ চৈত্যের নির্দর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। এর সম্মুখভাগে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা আছে। এখানেও অসাধারণ দেয়াল চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপনার সমন্বয় লক্ষ করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংঘারাম

গুপ্ত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত যে প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি, গৌরব ও সমৃদ্ধি সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল সোটি হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। গুপ্তযুগের এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। গুপ্ত রাজা কুমারগুপ্তের অর্থায়নে নির্মিত সংঘারামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। পরবর্তীতে রাজা ক্ষমগুপ্ত, জাতগত গুপ্ত, বালাদিত্য ও রাজা বজ্জ এ বিদ্যায়তনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিউয়েন সাঙ্গে বিবরণী থেকে জানা যায় যে, গুপ্তরাজবংশের পাঁচজন রাজা নালন্দায় পাঁচটি সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে বালাদিত্য সংঘারামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৩০০ ফুট উঁচু একটি মন্দির-উপাসনালয় নির্মাণ করেন। এছাড়া নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা ও সীলমোহর প্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নালন্দার সমৃদ্ধিতে গুপ্তরাজগণের আনুকূল্য ছিল (সরকার, ১৯৯৭:১৪৪; বড়ুয়া, ২০০৭:৪৩)।

৩. উপসংহার

বৌদ্ধ শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের জীবন-দর্শনকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ শিল্পকলার সূচনা হয়েছিল। বুদ্ধসময়কাল থেকে শুরু করে বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষে নান্দনিক ও বিস্ময়কর বৌদ্ধ শিল্পকর্ম তৈরির সূচনা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ধনাদ্য ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, নানা অঞ্চলের মানুষের সূজনশীলতা, মননশীল চিঞ্চ-চেতনা এবং কারিগরী দক্ষতায় বৌদ্ধ শিল্পকলা স্মৃদ্ধ হয়ে উঠে। যুগ পরিক্রমায় বৌদ্ধ শিল্পকলা ধীরে ধীরে নানা আঙ্গিকে বিকাশ লাভপূর্বক বিশ্ব শিল্পকলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্থান করে নেয়। বুদ্ধের সময়ে শুধুমাত্র বিহার এবং স্তুপ স্থাপত্যের প্রচলন ছিল। এ সময় মূলত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশালকায় বিহার বা সংঘারাম গড়ে উঠে। এ বিহারগুলি শুধুমাত্র ভিক্ষুদের আবাসস্থল ছিল না, এগুলো ক্রমে ক্রমে বিদ্যা চর্চার মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এরপ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে যিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন তিনি মগধ রাজ বিহিসার। পরবর্তীতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা প্রমুখ রাজন্যবর্গ ও ধনাদ্য ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ ধরনের আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অন্যদিকে স্তুপ স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টিতে মগধরাজ অজাতশত্রু অবদান সর্বাগ্রে স্মর্তব্য। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তিনি প্রথম বুদ্ধের দেহভূষ সংরক্ষণে স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য বা নৈবেদ্য নিবেদনের এটিই ছিল প্রথম স্থাপত্যকর্ম। বুদ্ধোত্তর সময়ে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক অনেক স্তুপ ও স্তম্ভ নির্মিত হয়। বুদ্ধের দেহধাতু

সংরক্ষিত স্থপ পূজার মাধ্যমে বৌদ্ধদের মাঝে পূজা-আচন্নার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের পথকে প্রশংস্ত করেছিল। পরবর্তীতে শঙ্গ রাজবংশ, ইন্দোচীন রাজবংশ, সাতবাহন রাজবংশ বৌদ্ধ শিল্পকলার বিকাশে অসামান্য অবদান রাখেন। কুষাণ রাজবংশের নৃপতিগণ বিশেষত সন্তুষ্ট কণিক মূর্তিশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শঙ্গগুণে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের চরম বিকাশ সাধিত হয় এবং এ সময়কে ভারতীয় শিল্পকলার প্রস্তরীয় যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শঙ্গ শাসনামলে গুহামন্দিরের দেয়াল চিত্র, ভার্জর্য এবং ছাপনা প্রাচীনকালের বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট শৈলীক নির্দশনের অপূর্ব সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া, ভাব ও ভাষার চমৎকার সম্মিলন ঘটে এই যুগের শিল্পকলায়।

টীকা

১. এ প্রসঙ্গে দীপবৎস গ্রহে (শ্লোক নং ৫৮, ততীয় অধ্যায়) উল্লেখ আছে-
জাতিবস্মু মহাবীরং পঞ্চতিংস অনুনকং,
বিষ্ণুর সমা তিংসা জাতবস্মো মহীপতি,
বিসেসো পঞ্চহি বসুসেহি বিষ্ণুরস্ম গোতমো (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০৪:৫৪)।
অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, রাজা বিষ্ণুর তখন ত্রিশ বছরে উপনীত হয়েছিলেন, বুদ্ধ বিষ্ণুর অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড় ছিলেন।
২. মহাবৎস গ্রহে (শ্লোক নং ২৫, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে-
বিষ্ণুরো চ সিদ্ধার্থকুমারো চ সহায়কা,
উভয়ং পিতরো চাপি সহায়া এব তে অঙ্গং (বড়ুয়া ও তালুকদার, ২০১১:৪৮)।
অর্থাৎ, রাজা বিষ্ণুর এবং রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধ ছিলেন, উভয়ের পিতারাও তাঁদের মতো বন্ধু ছিলেন।
৩. ‘ধর্মকন্দ’ অর্থ-ধর্ম পরিচ্ছেদ বা বিষয় বিভাগ। অর্থাৎ ত্রিপিটকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ও বহু প্রত্যেক বিষয়কে এক একটি কন্দ বলা হয়। ত্রিপিটকে একপ সর্বসাকুল্যে চুরাশি হাজার (৮৪০০০) ধর্মকন্দ রয়েছে। তন্মধ্যে বিনয় পিটকে একুশ হাজার (২১০০০), সূরাপিটকে একুশ হাজার (২১০০০) ও অভিধর্ম পিটকে বেয়ালিশ হাজার (৪২০০০)। এই চুরাশি হাজার বুদ্ধবচন বা বুদ্ধ উল্লিখিত বিষয় বা শাস্ত্রবাক্য এই ত্রিপিটকে বিদ্যমান (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০০:৫)।
৪. এ প্রসঙ্গে দীপবৎস গ্রহে (শ্লোক নং ১২-১৪, দ্বাদশ অধ্যায়) উল্লেখ আছে-
মহিন্দো নাম নামেন সংঘথেরো তদা অহু,
ইট্টিয়ো উত্তিয়ো থেরো ভদ্দসালো চ সম্ভলো।
সামগ্নেরো চ সুমনো ছলভিএঞ্জে মহিন্দিকো,
ইমে পঞ্চ মহাথেরো ছলভিএঞ্জে মহিন্দিকা
অসোকরামহ নিক্খন্ত চৱমানা সহঘণাঃ;
অনুপুরেন চৱমানা বেদিস্সপণিরিয়ং গতা (বড়ুয়া ও বড়ুয়া, ২০০৪:১২১)।
অর্থাৎ মহেন্দ্র ছবির ছিলেন দলনেতা। তিনি ইট্টিয়, উত্তিয়, ভদ্দশাল ও সম্ভল থেরকে নিয়ে যাত্রারাস্ত করেন। তাঁদের সঙ্গী সুমন শ্রমণ ছিলেন ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন ও মহাখান্দিবান। ষড়াভিজ্ঞ সম্পন্ন ও মহাখান্দিবান পাঁচ মহাথের অশোকরাম থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে ভ্রমণ করতে করতে বেদিয় পর্বত অতিক্রম করলেন।

সহায়কপঞ্জি

আন্তোনভা, কোকা ও লেভিন, ত্রিগোরি বোনগার্দ ও কতোভস্কি, ত্রিগোরি (১৯৮২)। ভারতবর্ষের ইতিহাস। অগতি প্রকাশন, মঙ্গো।

আলম, ড. রফিকুল (২০০৫)। বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা। চয়ানিকা প্রকাশনী, ঢাকা।

চট্টগ্রামাধ্যায়, স্মৃণীল (২০০২)। আচীন ভারতের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুষ্টক পর্যবেক্ষণ, কলকাতা।

নেপাল, সুভাষ কাণ্ঠি বড়ুয়া (২০১১)। বৌদ্ধধর্ম বিকাশে কুষাণ সন্দ্রাট কশিক। কৃষ্ণ। ২৪ বর্ষ, শুভ প্রবারণা ও কাঠিন চীবর দানোৎসব সংখ্যা।

বন্দেয়াপাধ্যায়, ডক্টর অনুকূলচন্দ্র (১৯৮৯)। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বড়ুয়া, সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কাণ্ঠি (২০০০)। ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বড়ুয়া, ড. রেবতপ্রিয় (সম্পাদনা) (২০০২)। সন্দ্রাট অশোক। চট্টগ্রাম।

বড়ুয়া, ড. সুমঙ্গল ও বড়ুয়া, বেলু রানী (২০০৪)। দীপবৎস। বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার ফর বুডিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা।

বড়ুয়া, ড. দীপক্ষেন্দ্র শ্রীজ্ঞান (২০০৭)। বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম।

বড়ুয়া, ড. সুমঙ্গল ও বড়ুয়া, বেলু রানী (২০১০)। বুদ্ধবাচীর মূলতত্ত্ব। পালি এড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বড়ুয়া, দিলীপ কুমার ও তালুকদার, মৈত্রী (২০১১)। মহাবৎস। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

বড়ুয়া, জ্যোতি বিকাশ (২০১৬)। বৌদ্ধসভ্যতা ও বৌদ্ধকীর্তি: দেশে দেশে। কাশবন প্রকাশন, ঢাকা।

মহাস্থানি, পশ্চিম ধর্মাধার (১৯৯৫)। মিলিন্দ পঞ্চ। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলকাতা।

সরকার, ড. সাধনচন্দ্র (১৯৯৭)। বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য। মহাবৌদ্ধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৯৮৯)। আচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুষ্টক পর্যবেক্ষণ, কলিকাতা।

হালদার (দে), ড. মণিকুম্ভলা (১৯৯৬)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। মহাবৌদ্ধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

Ahir, D. C. (1995). *Asoka the Great*. B.R. Publishing Corporation.

Barua, Beni Madhab (1946). *Asoka and his Inscriptions*, Part 1&2, New Age Publishers Ltd., Calcutta.

Beal, Samuel (1869). *Travels of Fah-hian and Sung-Yun, Buddhist pilgrims from China to India*. Trubner and Co., London.

Chaudhury, Binayendra Nath (1982). *Buddhist Centers in Ancient India*. Sanskrit College, Calcutta.

Davids, T.W. Rhys (1890). *The Questions of King Milinda*. Part I, At the clarendon press, Oxford.

Davids, T. W. Rhys & Carpenter, J. Estlin (1903). *Dīgha Nikāya*. Vol. II, Mahā Vagga, Pali Text Society, London.

Geiger, Wilhelm (1908). *The Mahavamsa*. Pali Text Society, London.

Horner, I. B. (1946). *Buddhavamsa Commentary*. Pali Text Society, London.

- Jayawickrama, N. A. (1971). *The Chronicle of Thupa and The Thupavamsa*. Luzac & Company Ltd. London.
- Law, Bimala Churn (1954). *Historical Geography of Ancient India*. Societe Asiatique De Paris, France.
- Morris, Richard (1888). *Āṅguttara Nikāya*. Vol. II Catukka Nipāta, Pali Text Society, London.
- Mookerji, Radha Kumud (1943). *Chandragupta Maurya and His Times*. University of Madras.
- Mukhopadhyaya, S. K. (1963). *The Asokavadana*. Sahitya Akademi, New Delhi.
- Malalasekera, G. P. (1998). *Dictionary of Pali Proper Names*. Vol. 1, 2, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, New Delhi.
- Norman, H. C. (1906). *The Commentary on the Dhammapada*. Pali Text Society, London.
- Oldenberg, Hermann (1879). *Vinaya Piṭaka*. Vol. I (Mahāvagga), Pali Text Society, London.
- Rowland, Benjamin (1967). *The Art and Architecture of India: Buddhist, Hindu, Jain*. Pelican History of Art, Penguin.
- Raychaudhuri, H. C. (1972). *Political History of Ancient India*. Calcutta.
- Smith, Helmer (1916). *Suttanipāta Commentary being Paramatthajotikā II*. Vol.1, Pali Text Society, London.
- Stede, W. (1931). *Sumaṅgalavilāsini*. Vol. II, Pali Text Society, London.
- Sircar, Dr. D. C. (1975). *Inscriptions of Asoka*. Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 3rd print.
- Smith, Vincent A. (2013). *Asoka The Buddhist Emperor of India*. Low Price Publication, Delhi.
- Takakusu, J. (1924-34). *Taishō Shinshū Daizōkyō* (Taisho No.125), Zouichi Agonkyo, vol. 28, Daijo Shuppan, Tokyo.
- Takakusu, J. and Nagai, M. (1968). *Samantapāśādikā*. Vol. III, Pali Text Society, London.
- Woods, J. H. & Kosambi, D. (1922). *Papañcasūdanī*. Vol. I, Pali Text Society, London.
- Walleser, M. (1924). *Manorathapūraṇī*. Vol. I, Pali Text Society, London.
- Woodward, F.L. (1926). *Udāna Commentary (Paramatthadīpanī I)*. Pali Text Society, London.
- Watters, Thomas (1996). *On Yuan Chwang's Travels in India*. Vol. 1, 2, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi.

প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের নির্দশন 'সাংকাশ্য': অতীত ও বর্তমান
(The 'Sāmkāshya' As A Sign of Ancient Buddhist Traditions:
Past and Present)

ড. শামীমা নাসরিন*

সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্থান বলতে সেই স্থানকে বোঝানো হয় যেখানে বুদ্ধীবর্ণনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রসিদ্ধ থের-থেরী কিংবা ভিক্ষু-ভিক্ষুনী এবং অতীতের বৌদ্ধ রাজা-মহারাজা, শ্রষ্টী তথা স্বামাধন্য মহাপুরুষের মেখে যাওয়া কৃতি উপস্থাপিত হয়েছে এমন স্থানকে নির্দেশ করে। এমন সব কীর্তি কালের আবর্তে কখনো কোনোটি টিকে গিয়েছে আবার কখনো কোনোটি হারিয়ে গিয়েছে। মেটি হারিয়ে গিয়েছে সেটি পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা তা আবার আবিক্ষার করেছেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এমন অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে এবং সেই ঐতিহাসিক স্থানসমূহও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে 'অষ্টমহাতীর্থস্থান' নামে যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ রয়েছে তা প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে। তেমনি 'সাংকাশ্য' হলো 'অষ্টমহাতীর্থস্থান' ও প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। ত্রিপিটক তথা বৌদ্ধ ইতিহাসে এবং রামায়ন-মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এই 'সাংকাশ্যের' নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। যার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আজও গৌরবের সাথে বহন করছে। 'সংকস্স' হলো উত্তরপ্রদেশের ফারুক্কাবাদ জেলার একটি গ্রাম। বর্তমানে এর নাম 'সংকিশ-বসন্তপুর'। এই 'সাংকাশ্য' ভগবান বুদ্ধের ও ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল স্থান। সংকৃতি, ভাষা, ধর্ম ও ভূসংস্থানের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমন্বয় ভূমি ভারতবর্ষ, আর পথিবীতে শ্রেষ্ঠ গন্তব্যস্থল হিসেবে এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে রয়েছে ভারতবর্ষের এই 'সাংকাশ্য নগরী'।

সূচকশব্দ: প্রত্নতত্ত্ববিদ, সাংকাশ্য, অষ্টমহাতীর্থস্থান, মহাজনপদ, কপিথ ও মৃৎশিঙ্গ।

Abstract

Buddhist heritage or historical place refers to the place where the works left by the famous 'Thera-Therī' or monks and nuns and the Buddhist kings-mahārājās of the past, great or renowned Mahāpurusha, are presented. Some of these feats have survived, and some have been lost. What was lost was later rediscovered by historians. The Buddhist tradition encompasses numerous historical sites, all of which hold significant importance. In the history of Buddhism, the famous historical places known as 'Ashtamahātīrthasthāna' have survived as witnesses of the ancient

* সহকারী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ই-মেইল: shamima.nasrin@du.ac.bd

Buddhist tradition. Likewise, 'Sāṃkāshya' is one of the 'Ashtamahātīrthasthāna' and one of the ancient Buddhist traditions. The name of this 'Sāṃkāshya' is mentioned in Tipitaka, or Buddhist history, as well as in the Ramayana-Mahabharata and other ancient texts. People still carry its history and tradition with pride. 'Saṃkassa' is a village in the Farukkabad district of Uttar Pradesh. Currently, its name is 'Saṃkisha-Basantpur'. This 'Sāṃkāshya' is one of the most glorious places among the memorials of Lord Buddha and Dhamma. India is a rich land with diversity of culture, language, religion, and topography, and this 'Sāṃkāshya Nagar' of India has earned a prominent place as the best destination in the world.

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, সম্পদায় বা দেশের পরিচিতির জন্য এমন কিছু অংশে, স্মৃতিচিহ্ন বা প্রতীক থাকে যা পুরো দেশ বা জাতির কাছে সৌন্দর্যশিলীর আকর্ষণীয় নির্দর্শন। বিশেষের কাছে ভারতভূমি প্রাচীন সভ্যতার বিচ্চির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার দেশ। সভ্যতার আলোর বালকে প্রাচীন পৃথিবীর যেসব এলাকা প্রথমবারের মতো উন্নতিসূচিত হয়েছিল ভারত সেসব এলাকার একটি। ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-প্রকৃতি ছিলো বৈচিত্র্যময়। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সুনীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচারের সময়ে ভারতের নানা জায়গায় বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন এবং ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। সে সমস্ত পুরিত্ব বুদ্ধভূমি তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত। বুদ্ধানুরাগী ভক্তরা তাদের ঐকান্তিক শুদ্ধা নিবেদনের জন্য ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে থাকেন। বৌদ্ধতীর্থস্থান হিসেবে 'সাংকাশ্য নগর' অন্যতম একটি স্থান হিসেবে বিবেচিত। তাই এটি তীর্থস্থান দর্শনের পুণ্যার্জনের একটা বিশেষ স্থান হিসেবে বিবেচিত। যেহেতু এই তীর্থস্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ ও বহন করছে এবং সেকারণে সময়ের পরিক্রমায় একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার 'সাংকাশ্য' তথা 'সাংকাশ্য নগর' বর্তমান যে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে, সারা পৃথিবীর বৌদ্ধধর্মালম্বীদের নিকট এটি কেমন গুরুত্ব বহন করছে এবং সারা বিশেষ পর্যটকদের এটি কিভাবে আকৃষ্ট করছে ইত্যাদি উপস্থাপন করা এ গবেষণার অন্যতম একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফলে 'সাংকাশ্য' সম্পর্কে নতুনভাবে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করা যায়।

১. বুদ্ধের বিচরণ ক্ষেত্র

'সাংকাশ্যের' মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বুদ্ধ কোথায় কোথায় বিচরণ করেছিলেন তার একটি চিত্র জানা প্রয়োজন। জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হওয়ার পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া যায়। ত্রিপিটক সাহিত্যে বিশেষ করে বিনয় পিটকের অঙ্গর্গত 'মহাবঞ্চ', 'চূলবঞ্চ' এবং 'সূত্রবিভঙ্গ' গ্রন্থে। এছাড়া 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র', 'সংযুক্তনিকার্য' এবং সুন্নিপাতি প্রভৃতি গ্রন্থেও বিক্ষিপ্তভাবে নানা তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, অবস্থান ও বিচরণের রাজ্যসহ স্থানসমূহ উল্লেখ করা হলো; যেমন-

অঙ্গ : চম্পা, ভদ্দিয়, কোটিঘাম, আপগ, অঙ্গুত্তরাপ।

মগধ : রাজগৃহ, দক্ষিণাগিরি, চোদনাবঞ্চ, পাটলিঘাম, নালন্দা, উরবেলা গয়াশীর্ষ।

বজ্জি : বৈশালী, নাদিক, বেলুব, ভগুঘাম, হস্তীগাম, জয়ুগাম, ভোগনগর।

মল্ল : পাবা, অনুপ্রিয়, কুশীনারা।

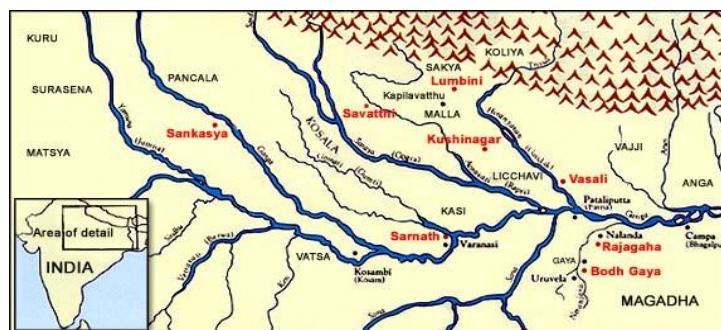
কোসল : শ্বাবঙ্গী, কপিলবস্তু, আতুমা, বেরঞ্জ।

কাসি : বারাণসী, কিটাগিরি, আলবী।
 বৎস : কোসাধী, বালকলোকনকারগ্রাম, পারিলেয়, ভঁঁ বা সংসুমাগিরি, প্রয়াগ।
 চেতি : প্রাচীন বৎসদায়, ভদ্বতিকা।
 পাথগাল : সোরেয়ে, সাংকাশ্য, কণ্ঠকুজ্জ।

অন্যান্য স্থানের মধ্যে অস্সপুর, কিষ্মিলা, চালিকা, বিদেহ, মিথিলা, শাক্যনগর, কোলিয়, সাকেত, শাল, দেশক, নালকপণ ও কুরু।

২. সাংকাশ্যের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রথমেই ‘সাংকাশ্যের’ ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের ঘোড়শ মহাজনপদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ জনপদের মতো পাথগাল রাজ্যও অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড ও ফারংকাবাদ জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকা নিয়ে এ রাজ্যের অবস্থান। ভারতের উত্তর প্রদেশের ফারংকাবাদ জেলায় বর্তমানে ‘সংকিস’ নামে পরিচিত প্রাচীন ‘সঙ্কস্স’ পাথগাল রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ নগরী। ইঙ্গু নদীর তীরে অবস্থান ছিলো ‘সাংকাশ্য নগরীর’। সামগ্রিকভাবে উত্তর প্রদেশে বৃদ্ধ মতবাদের জনপ্রিয়তা অধিক ছিল। বুদ্ধের সময়কালে ‘সঙ্কস্স’ ছিলো বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। মনে করা হয় তৎকালে অত্যন্ত প্রাপ্তব্য অবস্থায় ছিলো। বাংলায় বলা হয় ‘সাংকাশ্য’ যা পালি ‘সংকস্স’ এবং সংস্কৃতে ‘সংকাস্য’ নগর নামে পরিচিত ছিল। চীন দেশে ‘সাংকাশ্য’ নগর ‘কপিথ’ নামে চিহ্নিত। এ রাজ্যের ইতিহাস ঐতিহ্য ও বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নিদর্শন ‘সাংকাশ্য’ নগরে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক তথ্যের সম্মান পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থ ‘মহাভারতে’ও পাথগাল রাজ্যের প্রসিদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরু এর প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে পাথগালের নাম ছিলো সুপরিচিত। সংস্কৃত মহাকাব্য ‘রামায়ণে’ এই স্থানটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সীতার পিতৃব্যের (জেঠা বা খুড়া) রাজ্যের রাজধানী ‘সাংকাশ্য’ বলে মনে করা হয়। প্রথমদিকে এই রাজ্যে রাজতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অব্দ থেকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতীয় ইতিহাস নতুন আলোয় আলোকিত হয়েছিল। পাথগাল রাজ্যের মুদ্রা সাধারণত পুরু, গোলাকার বা ডিম্বাকার।^১



প্রাচীন ভারতের ঘোড়শ মহাজনপদ ও তার অন্তর্গত পাথগালে ‘সাংকাশ্যের’ অবস্থান।^১

মানচিত্র-১

‘চেতিয় জাতক’ পাঠে জানা যায় যে, চেদি বা চেতিরাজ উপচরের চতুর্থ পুত্র যে স্থানে মণিমুক্তা খচিত রাজকীয় চক্রপঞ্জর লক্ষ্য করেন সেই স্থলে যে নগর প্রতিষ্ঠা করা হয় তার নাম রাখা হয়

উত্তর পাঞ্চাল। ‘সাংকাশ্যের’ অবস্থান যথাযথভাবে প্রদর্শনের উপায় ও নিম্নে উপস্থান করা হলো।



অন্যান্য আটটি বৌদ্ধ তৈর্থস্থান এবং উল্লেখযোগ্য কাছাকাছি শহরগুলির সাথে সম্পর্কিত ‘সাংকাশ্যের’ মানচিত্র।
মানচিত্র-২

‘সাংকাশ্যে’ যাতায়াত করার জন্য উত্তর রেলপথের সাইরিয়াবাদ-ফারুক্কাবাদ শাখার পাখন্তে নামতে হবে, যে ট্রেন দিল্লী বা আগ্রা থেকে আসছে। পাখন্ত থেকে ঘোড়ার টানা টাঙ্গর চড়ে ‘সাংকাশ্যে’ আসতে হবে। ফতেপুরগড় থেকে বাসেও আসা যায়। আর থাকার জন্য PWD-বাংলো (Ex.Engn-Fategarth.Dist Farrukhabad) যাত্রী নিবাস ও ধর্মশালা আছে।

৩. বৌদ্ধ সাহিত্যে নগর

‘সাংকাশ্যে’ এর আর একটি পরিচিতি হলো প্রাচীন বৌদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান ও নগর। তাই ‘সাংকাশ্যে নগরের’ বিজ্ঞারিত আলোচনার পূর্বে নগরের ধারণা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। মানুষ কখন কিভাবে নগর গড়ে তুলেছে তা নিশ্চিত করে বলা বেশ কঠিন। নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ বেশ প্রাচীন। নগর বলতে আমরা বুঝি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পেশার বহসংখ্যক লোকের বসবাস এবং শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান। এখানে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পেশার বহসংখ্যক জনসংখ্যার সমষ্টিকে ইঙ্গিত বহন করে এবং যার ফলে নগর জীবন গড়ে উঠতে পারে। আর বাণিজ্য হচ্ছে নগর গড়ার প্রধান উৎস। কারণ বাণিজ্যের প্রসারতার সাথে সাথে শিল্পের প্রসারতা গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপন্নিত দ্রব্যের জন্য বাজারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা ক্রমান্বয়ে নগরের উৎপত্তি করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতে সর্বপ্রথম নগরের উৎপত্তি হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার নগরসমূহ এই সময় ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, শিল্পকলা ও নাট্যকলার অপূর্ব মিলনে যেমন শহরের নদনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে; তেমনি জ্ঞানের বিকাশ, দলিল লিখন, রেকর্ড ও মুদ্রণ আবিস্কার, আমলাতন্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নগর সভ্যতার বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটায়। এরই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে মিশরীয় নগরসমূহের বিকাশ, খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে প্রাচীন ভারতীয় ও চীনের নগরসমূহের এবং খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে মেঝিকোর মায়া ও ইনকা সভ্যতার বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খ্রিঃ পৃঃ পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ এথেন নগরীর মতো খ্রিঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের বৈশালী, কোশালী, শ্রাবণী, রাজগঢ়, প্রভৃতি নগরী ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। এছাড়াও বুদ্ধের স্মৃতিময় স্থানগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন শব্দ যেমন- নিগম, নগর, নগরক, রাজধানী, পুর ও পতন প্রভৃতি। উপরিউক্ত শব্দগুলোতে নগর বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচয় থাকার কারণে সেগুলোকে নগররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নগরের প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো- গ্রামাঞ্চলের তুলনায় স্থলমাত্র স্থান আশ্রয় করে অধিকতর সংখ্যক লোকের

বসবাস, সীমাবদ্ধ বাসস্থল, প্রধানত খাদ্যোন্তর সামগ্রীর উৎপাদন এবং অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্যে গ্রাম নির্ভরতা, বণিকশ্রেণির সাথে গভীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এমন কি, ব্যবসা বাণিজ্যগত এবং কখনো ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।» পালি সাহিত্যে নগরের বর্ণনায় পুনঃপুনঃ প্রাকার (পাকার), পরিখা, তোরণ (ঘার), গড় (অট্টালক) প্রভৃতির উল্লেখের মধ্যেও নগরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিশেষ করে বৌদ্ধবুঝে নগর, গ্রাম ও জনপদ সমৃদ্ধিময় ছিল। ‘মিলিন্দ পঞ্চহঁ’ প্রাচীন মধ্যে নগর, গ্রাম ও জনপদের বহু নাম পাওয়া যায়। যেমন- অমরাবতী, কপিলবর্ষু, কাসিপুর, কুসাবতী এবং দেবনগরী প্রভৃতি। এ সকল নগরীসমূহের আকার-আয়তনকে সুরক্ষণ ব্যবস্থা, কোথায় কোনো বাজার, রাজধানী, সৈন্য-শিবির, বাণিজ্যিক স্থান, পর্যটন কেন্দ্র, তীর্থস্থান, নদ-নদী ও বন্দরের অবস্থান যে ছিল পালি সাহিত্যে তার সত্যতা পাওয়া যায়।

নগরকে লক্ষ্য করে সত্যতা গড়ে উঠেছে। নগরকে বলা হয় উন্নয়নের মাপকাঠি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা নগরের পরিবর্তন হয় এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো নানাভাবে করায়ত করা যায়। আর নগর মানুষের কল্যাণময় চিন্তারই এক অনিবার্য ফলশ্রুতি। নগর ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় সদা প্রবাহমান। আর এই প্রবাহমানতার কারণেই নগরকে নিয়ে বিভিন্ন পাত্রতদের চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য বিদ্যমান। প্রাচীন নগরসমূহের বিকাশকে গোরডেন সাইল্ড (Gordon Childe) নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে নগর বিপুব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।¹⁰ যেমন:

১. জনবহুল স্থানে স্থায়ী বসতি,
২. কৃষি কাজবিহীন বিশেষ কার্যাবলি,
৩. ট্যাক্স ও পুঁজির সঞ্চয়ন,
৪. বিশেষ আকর্ষণীয় সরকারি ভবন,
৫. একটি শাসক শ্রেণি,
৬. লিখন পদ্ধতি,
৭. ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান বিজ্ঞান। যথা : পাটিগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা,
৮. শৈল্পিক দ্রষ্টিভঙ্গি,
৯. নিয়ন্ত্রণোজনীয় দ্রব্যের জন্য বাণিজ্য ও
১০. সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জ্ঞাতি সম্পর্কের পরিবর্তে আবাসিক সদস্যের ধারণা।

ভগবান তথাগত তাঁর জীবদ্ধশায় কয়েকবার এই ‘সাংকাশ্য’ নগরে এসেছিলেন। শুধু তাই নয় বুদ্ধ এখানে অবতরণও করেছিলেন। এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও রয়েছে। বুদ্ধ তিনমাস মাতৃদেবীকে দর্শন ও কৃতজ্ঞতাস্ফূরণ মাতৃদেবীকে তাবতিংস স্বর্ণে অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় ‘সাংকাশ্য’ নগরেই অবতরণ করেছিলেন। সেকারণে ‘সাংকাশ্য’ আজও পৃথিবীর ইতিহাসে এত মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মালঘীরা ও অন্যান্য পর্যটকরা ‘সাংকাশ্য’ পরিভ্রমণ করে থাকেন।

৪. নগর ও সাংকাশ্য নগর গড়ে উঠার কারণ

নতুন নগর গড়ে উঠার পেছনে রাজনৈতিক কারণ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকটা স্পষ্টতর হয় মূলত বষ্ঠ শতক থেকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজারা পরিকল্পিত উপায়ে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন: কপিলাবস্তু, বারাণসী, রাজগুহ, চম্পা, কোশাস্থী প্রভৃতি নগরগুলো। এগুলো গড়ে উঠার পেছনে রাজনৈতিক কারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রাচীনকালে উত্তর ও পূর্ব-ভারতের রাজারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বণিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। নদী অববাহিকা অঞ্চল হওয়ায় বণিকদের

সাথে রাজাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। বণিকরা রাজাদের উপর নির্ভরশীল ছিল নিজ নিরাপত্তা, পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। অপরদিকে রাজাদের প্রশংসনিক কাজে বণিকরা সাহায্য করতেন। কেনোনা প্রশংসনের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতোই প্রাচীন এবং মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একথা সত্য যে, কোনো রাষ্ট্রে কোনো নগরই বণিকদের সাহায্য ছাড়া স্থায়ীভাবে লাভ করতে পারে না। পণ্ডিত Gideon Sjoberg মহাশয়ের উক্তিটি প্রধান যোগ্য। তিনি বলেন, “কোনো সমাজ তার নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণানুসারে অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্প্রসারণ ঘটায়। ফলে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা পরিচালনায় কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্বীকার্য। পক্ষান্তরে, কোনো রাজ্যের অর্থনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে মূলত কোনো এক কেন্দ্রীভূত শক্তির উপর; ফলস্বরূপ কোনো নগর এমনকি, বাণিজ্যিক নগরও বিশেষভাবে কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ব্যবৃত্তি টিকে থাকতে পারে না।”^{১০} এ মূল্যবান উক্তিটি ‘সাংকাশ্য’ নগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পালি সাহিত্যে নগরগুলো সাধারণত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্টি হলেও উভয়ের পেছনে নতুন লৌহ-প্রযুক্তির অবদান ছিলো অপরিসীম। উন্নত নগর সভ্যতার উভব ও বিকাশে অবদান রেখেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। কৃষি ছিলো এ যুগে অর্থনৈতির প্রধান অবলম্বন। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে একথাও সত্য। যেমন-লোহার ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রায় আনে নতুন গতি। পাথরের হাতিয়ারের বদলে লোহার হাতিয়ার ও কৃষি উপকরণ কৃষিক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তন আনে। এছাড়া অনেক পতিত জমি উদ্ধার করে ফসলাদি উৎপাদনের আওতায় আনা হয়। লৌহ-প্রযুক্তির অবদানের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনও অনেক বেড়ে যায়। উন্নত খাদ্যশস্যের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পায়। উন্নত ফসলের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে এরই পথ ধরে ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা রাজ কর্মচারী ও তার সৈন্যদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলে। খুব সহজেই লৌহ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শাসক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত উন্নতি ঘটে। এসবের ফলশ্রুতিতে শাসকরাও নব উদ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে বহু নতুন নতুন নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূলে। ঐ সময়ে বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পজাত দ্রব্য ছিলো সূতি বস্ত্র, হাতির দাঁতের দ্রব্যসামগ্রী এবং মৃৎশিল্প। নদী তীরবর্তী নগরগুলোর অবস্থান হওয়ায় তখনকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য গতি পেয়েছিল। বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে হিসেবে ধাতব মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। বুদ্ধযুগেও ধাতব নির্মিত ছাপাংকিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম থেকে শিল্প-বাণিজ্য চর্চা ও অনুশীলনে উৎসাহ লাভ করেছিল। ‘সুতনিপাত’ গ্রন্থের ‘মহামঙ্গলসুত’তে বলা হয়েছে—“বহুবিধি শিল্প ব্যবসায় জ্ঞানার্জন শ্রেষ্ঠ মঙ্গলজনক কাজ”^{১১} বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদের ধর্ম। এখানে কুশল-অকুশল দুটি কর্মই প্রধান হিসেবে বিভাজিত। বৌদ্ধরা সদা কুশল কর্মে উদ্ভাসিত। সুতরাং বৌদ্ধমতে ‘জন্মে নয় কর্মেই আসল পরিচয়’। একটি প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য আছে—“যেমন কর্ম তেমন ফল”। আপন জন্মের ব্যাপারে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। এমনকি ধনী বা দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়াটা মানুষের নিজের ইচ্ছা বা কর্মের উপর নির্ভর নয়। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের উপর বর্তায়। তাই পথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে বৎশ পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে ‘ব্রাহ্মণ বর্গে’ এর প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে এভাবে-

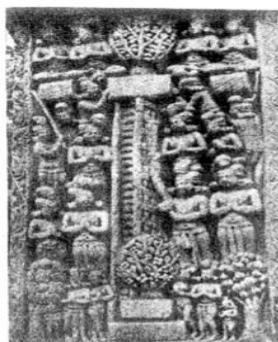
“ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হেতি ব্রাক্ষণো,
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাক্ষণো।

অর্থাৎ- জটা, গোত্র কিংবা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।^{১০} জন্ম কোথায় হলো তা দেখার বিষয় নয়। অভিজাত বলে অনেকে বংশ গৌরব বড় করে দেখে, কিন্তু তার কাজকর্মে যদি কোনো গুণ প্রকাশ না পায়, তবে সে বংশ গৌরবের কোনো সম্মান নেই। যেমন সরোবরের শ্যাঙ্গলা অপেক্ষা গোবরের পদ্মফুলের র্যাদা অনেক বেশি। তাই বলা যায় যে, তিনিই পবিত্র যিনি সত্য ও ধর্মের অনুশীলন করেন। আর আজও সত্যধর্ম চর্চাকারীদের কাছে এই ‘সাংকাশ্য’ বুদ্ধের দ্বিতীয় জন্মস্থান, কারণ তেব্রিশ স্বর্গের সিঁড়ি এখানেই বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন। যে কেউ চাইলে এই সিঁড়ির পুণ্য মৃত্তিকা মাথায় নিয়ে চলতে পারেন রাজগ়হে। যেখানে বিষ্ণুসারঃ পুত্র অজাতশত্ৰু হিংসা ত্যাগ করে ভগবান তথাগতের পদতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

৫. সাংকাশ্য নগরে বুদ্ধের অবতরণ

বুদ্ধের মতে প্রত্যেক বুদ্ধমাতা প্রথম সন্তান জন্মের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যু পরবর্তী তাবতিংস স্বর্গে অবস্থান করেন। একইভাবে গৌতম বুদ্ধের মাতা মহামায়া ও সিন্দার্থের (পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ) জন্মের এক সপ্তাহ পরে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। কারণ বুদ্ধমাতার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান আসতে পারেন না। এছাড়াও জগতে এক সাথে দুঃজন সম্যক সম্মুক্ত উৎপন্ন হন না। একজন মাত্র সম্যক সম্মুক্ত উৎপন্ন হন। ভদ্রকল্পের পঞ্চবুদ্ধের মধ্যে বর্তমান চলছে চতুর্থতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের শাসন। গৌতম বুদ্ধের শাসন বিলুপ্তির পরে ভদ্রকল্পে শেষ বুদ্ধ আর্যমেত্রীয় বুদ্ধ পৃথিবীতে আবিভূত হবেন। এ সম্পর্কে গৌতম সম্যক সম্মুক্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে লালিত পালিত হবেন। এজন্য তাঁকে গৌতম বলা হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি ৩৫ বছর বয়সে সম্যক সম্মুক্ত ফল লাভ করেন। জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হওয়ার পর তিনি দিব্যজ্ঞানে মাতৃদেবীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। মাতাকে দুঃখমুক্তি দানের মানসে বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে গমন করলেন শুভ আশাট্টি পূর্ণিমা তিথিতে। সেখানে তিনমাস অবধি অভিধর্ম পিটক (চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা) দেশনা করে মাতাকে মুক্তিমার্গ দান করেছিলেন। সাথে অসংখ্য দেব ব্রহ্মণ ধর্মচক্র লাভ করেছিলেন। অতঃপর বর্ষাবাসের পরে তথাগত বুদ্ধ স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন। সেদিন ছিল শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। আর সেটি ছিল বুদ্ধের জীবনের সপ্তম বর্ষাবাস। মর্ত্যলোকে অবতরণের সময়ও এক অবিনাশী শৃঙ্গি সম্মুক্ত ঘটনা ঘটে যায়। বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে বর্ষাবাস যাপনকালে মাতৃদেবীকে উদ্দেশ্য করে ধর্মদেশনা করলেও পরে সেই দেশনাবলি ছিল দেব উপযোগী। সেই দেশনায় অসংখ্য দেব ব্রহ্মণ ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন দেব পরিষদ চিন্তা করলেন তারা কিভাবে বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী মতে, বিশ্বকর্মা দেবপুত্র বুদ্ধের সম্মানে দৈব শক্তিতে তাবতিংস স্বর্গ থেকে ভারতের ‘সাংকাশ্য’ নগর পর্যন্ত তিনটি স্বর্গীয় সিঁড়ি রচনা করলেন। মধ্যখানের সিঁড়ি ছিল মুণিমুক্ত খচিত, বামপাশের সিঁড়ি ছিল রোপ্য খচিত এবং ডানপাশের সিঁড়ি ছিল স্বর্ণ খচিত। বুদ্ধ মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে দেবলোক হতে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন।^{১১} বামপাশের সিঁড়ি বেয়ে দেবগণ বুদ্ধের প্রতি দিব্যপুস্প বর্ষণ করতে করতে সাধু সাধু ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকস্পিত করে বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছিলেন। সেদিন স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল এমন এক বিরল এবং দুর্লভ সময় সন্দিক্ষণ যেই ক্ষণে দেবতা এবং মানুষ সরাসারি পরম্পরাকে দর্শন করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।



অয়োন্ত্রিংশ দেবতাদের স্বর্গলোক হতে বুদ্ধের মর্ত্তে (সাংকাশ্যে অবতরণ প্রস্তর ভাস্কর্য-সঁচী)।

(প্রায় থ: পঃ: দুই-শতক) ।^{১১}
চিত্র-১

তথাগত উপলক্ষ্মি করতে পেরেছেন ভোগের মধ্যেই সুখ নিহিত নয়। কেননা সুখপ্রয়াসী সাধারণ মানুষ নিরন্তর ভোগের উপকরণ সংগ্রহেই মত থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ভোগপ্রবণতা মানুষকে বিলাসী, কর্মবিমুখ ও স্বার্থপূর্বে পরিণত করে। তারপর ভোগের ক্ষমতাও লোপ পায়। যথার্থ সুখ পরিভোগ প্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিরন্তর কাজের মধ্যে, দেশব্রতী ও মানবব্রতী ভূমিকার মধ্যে। তখন তিনি উপলক্ষ্মি করলেন- উদয়াচিত হয়েছে জগতের সৃষ্টি রহস্য, পরিভ্রান্ত হয়েছে জগতের মূল তত্ত্ব, উন্মোচিত হয়েছে পরম সত্য। জগতের সকল তত্ত্ব, তথ্য অধিগত করে তিনি লাভ করেছেন সর্বজ্ঞতা, হয়েছেন সমুদ্ধি। সর্বোপরি তিনি নির্মূল করে হয়েছেন জন্ম-মৃত্যুর আতীত।^{১২} জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় নানা যোনিতে জন্মান্তর পূর্বক পারমিতাসমূহ পূর্ণ করে সম্মোধি লাভ করার ফলে যখন ‘বুদ্ধ’ হলেন তখন আনন্দোচ্ছাসে বললেন-

“অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সৎ অনিবিস্সৎ,
গহকারকং গবেসন্তো দুকুখা জাতি পুনপুনং,
গহকারকং! দিটঠেসি পুন গেহং ন কাহসি,
স্বব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকৃটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্বগা।”^{১৩}

অর্থাৎ- দেহরূপ গৃহের নির্মাতাকে সন্ধান করতে গিয়ে (যথার্থ জ্ঞানাভাবে) তাকে না পেয়ে বহু জন্ম-জন্মান্তরের সংসারে পরিভ্রমণ করেছি। বার বার জন্মান্তর করে বহু দুঃখভোগ করেছি। হে গৃহকারক! এবার আমি তোমার সন্ধান পেয়েছি। পুনরায় তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহের সমস্ত উপকরণ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। আমার সংক্ষারমুক্ত চিত্ত সমুদয় ত্রুটার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধ লাভের অষ্টম সপ্তাহে বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চবগীয় ভিক্ষুর কাছে প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ সূত্রের দেশনা করলেন। দেশনার ফলে পঞ্চবগীয় ভিক্ষুদের মধ্যে অন্যতম কোণ্ঠিণ্যের পাপরাজি মুক্ত ও পাপ মলবিহীন হয়ে ধর্মচক্র প্রস্ফুটিত হলো। অপর চারজনও মার্গফলাদি লাভ করে অর্হৎ ফল লাভ করেন। বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশে এ পাঁচজনই তাঁর প্রধান শিষ্য। তিনি সেদিন সেই ধর্ম প্রথম প্রচার করেন সেটি ছিল বিশ্বের সর্বদেশের সর্বকালের হিতার্থে, কল্যানার্থে, সুখার্থে বুদ্ধলক্ষ সত্যধর্ম তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রথম যে দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে আরও বলা হয়েছে- সেই ধর্ম আদিতে, মধ্যে ও অত্তে কল্যাণকর সেই পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্যধর্ম প্রচার কর। গাথাটি নিম্নরূপ:

‘চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায, বহুজন সুখায,
লোকানুকম্পায, অথায হিতায, সুখায, দেব মনুস্মানং
... দেসেথ ভিক্খবে ধমং আদি কল্পাণং,
মজৱে কল্পাণং, পরিযোসান কল্পাণং ... পকাসেথ’^{১০}

উপরোক্ত তিনটি ঘটনা ছাড়াও এ তিথিতে বুদ্ধ শ্রাবণীতে যমক প্রতিহার্য (অলোকিক শক্তি) প্রদর্শন করেছিলেন এবং মাতৃদেবীকে ধর্মদেশনা করার জন্য ত্রয়ঙ্গিশ স্বর্গে গমন করেছিলেন।

আবার ‘কণহজাতক’ (৪৩৭), ‘ধ্যাপদ্টৰ্থকথা’ হতে জানা যায়, তথাগত বুদ্ধ শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাবতিংস দেবলোক থেকে সিনেরু পর্বত অতিক্রম করে দেবরাজ প্রদত্ত সোপানে করে এই নগরে অবতরণ করেন। আর সিনেরু পর্বতের অবস্থান হলো চক্ৰবালের মধ্যভাগে। সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের পরমায় পঞ্চশত বছর। সিনেরু পর্বতের উচ্চতা চুৱাশী হাজার যোজন। ছয়টি স্বর্গের মধ্যে প্রথম স্বর্গ হলো চতুর্মহারাজিক স্বর্গ। এই স্বর্গের পূর্বদিকে পূর্ববিদেহ নামক মহাদ্বীপ, দক্ষিণ দিকে জন্মুদ্বীপ, পশ্চিমদিকে অপরগোয়ান এবং উত্তরভাগে উত্তরকুরু। বিয়াল্পিশ হাজার যোজন উচ্চে যুগন্ধর পর্বতের মাথায় এই স্বর্গের অবস্থান। আর এই যুগন্ধর পর্বতের সুউচ্চ দিক নিয়ে চন্দ-সূর্য সিনেরুর চারপাশে পরিভ্রমণ করে থাকে।

ছয়টি স্বর্গের মধ্যে প্রথম স্বর্গ সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। আরো পাঁচটি স্বর্গ হলো তাবতিংস স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নিম্নাগরতি স্বর্গ ও পর নিমিত্ত বসবত্তি স্বর্গ। উপরোক্ত ছয়টি স্বর্গের মধ্যে দ্বিতীয় স্বর্গ যেখানে বুদ্ধ তার মাতাকে ধর্মদেশনা প্রদান করেছিলেন। সেই তাবতিংস স্বর্গের অধিপতি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এই দেবলোকে দ্বিতীয় পৃথিবীজন, ত্রিতীয় পৃথিবীজন ও অষ্ট আর্যপুদগল এই দশ শ্রেণির ব্যক্তিগণ জন্মহাঙ করে থাকেন। আমাদের একশত বৎসরে তাবতিংস স্বর্গের এক দিন-রাত। স্বর্গলোকবাসীদের গণনায় তাদের পরমায় এক হাজার বছর, কিন্তু মনুষ্য গণনায় তিনকোটি ষাট লক্ষ বৎসর। তাবতিংস স্বর্গ আমাদের এই পৃথিবীর সাথে সংলগ্ন।^{১১}

মানুষেরা প্রায়শঃ মৃত্যুর পর এবং এমন কি কখনো কখনো মর্ত্যলোকে জীবিতকালে যে স্বর্গ পরিভ্রমণ করতেন পালি সাহিত্যে এ সম্পর্কিত অনেক গল্প, উপাখ্যান উক্ত হয়েছে। ‘নিমিজাতকে’^{১২} বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা নিমি স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং নিমোক্ত দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দৃশ্যগুলো হলো:

১. বীরনী বিমান বৃক্ষ, পুষ্প, কল্পবৃক্ষ, পুঞ্জরণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ একটা উদ্যান।
২. সোণদিন্ম দেবপুত্রের সপ্তস্বর্ণ বিমান।
৩. ফলিকবিমান।
৪. মণি বিমান ও
৫. বেলুরিয়বিমান।

তিনি সুমেরু পর্বতে গমন করেন এবং সপ্ত পর্বত বেষ্টিত চতুর্মহারাজিক দেবগণের আবাস স্থান সুমেরু পর্বত দর্শন করেন। সেখানে থেকে তিনি তাবতিংস দেবলোকে ইন্দ্রের মূর্তি দর্শন করেন। সেখান থেকে তিনি সুনির্মিত সুচিকৃত সুন্দর অষ্ট অংশে বিভক্ত স্তুযুক্ত দেবগণের সম্মানে গমন করেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ নিমিক্তে সংবর্ধনা জানাতে আগমন করেন এবং দেবগণের প্রধান ইন্দ্রের পাশে তাঁকে আসন প্রদান করা হয়।

৬. পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে সাংকাশ্য এবং এর প্রত্যাভিক সম্পদ

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বৌদ্ধ পুণ্যতীর্থসমূহ বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। এখানে দেশ-দেশান্তর হতে অসংখ্য পর্যটক ছুটে এসেছে অনেক আশা নিয়ে। পর্বতগাত্রে,

শিলালেখে তার প্রতিধ্বনি এখনো বর্তমান। নিম্নোক্ত পর্যটকরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁদের দেখা নগরের বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁরা ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর এক প্রাণ থেকে অন্য প্রাণে। তাঁদের সেসব অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন পুঁথিতে। সেকারণে পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনীগুলো ইতিহাস-ঐতিহ্য আবিস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন 'সাংকাশ্য' নগরে তথাগত বুদ্ধের স্বর্গ থেকে অবতরণ স্থানে স্থাট অশোকের তৈরি একটি বিহার দেখেন। এছাড়াও বহু স্তুপ মন্দির এবং ১৬ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বুদ্ধমূর্তি লক্ষ্য করেন। তিনি বিহারগুলোতে অসংখ্য ভিক্ষু বসবাস করতে দেখেছিলেন।^{১১} সেখানে বুদ্ধমন্ত্রে সর্বত্র মুখরিত ছিল। অবিরত সেই মন্ত্র উচ্চারিত হত। বিহারগুলো ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। শুধু ধর্ম নয় জ্যোতিষ, আয়বেদ, চিকিৎসা ও ভাস্তৰ্য প্রভৃতি সকল প্রকার পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করতেন। যেমন বলা যায়, নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন খাল, বিল, নালা সমস্তই জলে পূর্ণ হয়ে যায়; বৌদ্ধধর্মের অমৃতরসও সেরাপি জোয়ারের মত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল। আর সেই প্লাবন শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি অন্য দেশেও পরিব্যাঙ্গ হয়েছিল।

হিউয়েন সাং এর বিবরণী সপ্তম শতকের ভারত ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য ভ্রমণ করেন, বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণ করেন। হিউয়েন সাং তাঁর শাসন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি একজন উদার ও প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে দ্বিতীয় চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং 'সঙ্কক্স' পরিদর্শন করেন। এই নগরকে তিনি একটি দেশ রূপে উল্লেখ করেন। সীমানা নির্ধারণ করেন মাত্র ২০০ লি (প্রায় ৩৩৩ মাইল)। এতে মনে হয় পরিব্রাজক নগরটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোও তাঁর পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজধানীর বিস্তৃতি নির্ধারণ করেন মাত্র ২০লি (প্রায় ৩.৫০ মাইল)। বিহার প্রাঙ্গণে আছে তিনটি সিঁড়ি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাঝখানের সিঁড়ি স্বর্ণ নির্মিত, বাম পাশেরটা স্ফটিকের ও ডান পাশেরটা রৌপ্য নির্মিত ছিল। বুদ্ধ প্রয়ত্নিশৰ্ঘণ্গে মাকে ধর্মদেশনা করেন, মধ্যের সিঁড়ি দিয়ে জমুদ্বীপে নেমে এসেছিলেন। ব্রহ্মা একটি সাদা ঝালুর ধরে রৌপ্যের সিঁড়ি দিয়ে ও ইন্দ্র একটি মূল্যবান ছাতা ধরে স্ফটিকের সিঁড়ি দিয়ে বুদ্ধের সাথে এসেছিলেন। বুদ্ধের পিছনে পিছনে আরো অনেক দেবতা ও বোধিসত্ত্বরা নেমে এসেছিলেন। ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কয়েকশত বছর ধরে রাজন্যবর্গ বিভিন্ন সময়ে ইটপাথর দিয়ে সিঁড়ি বাঁধিয়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। ইটপাথরের সিঁড়ি মণিমুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা ছিল। হিউয়েন সাং ৭০ ফুট সিঁড়ি দেখেছিলেন। সিঁড়ির উপর মন্দির নির্মাণ করে স্বর্গ থেকে নেমে আসা বুদ্ধ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তাছাড়া যে স্থান থেকে বুদ্ধ স্বর্গে গিয়েছিলেন ও ফিরে এসেছিলেন সে স্থানে স্থাট অশোক সাত ফুট উঁচু পাথরের বেদীর উপর ৭০ ফুট উঁচু পাথরের একটি পিলার স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েন সাং এই নগরে বহু বিহার ও দেব-দেবীর মন্দির লক্ষ্য করেন।^{১২} সত্যিই শিল্পকর্মের কী এক মহান ঐতিহ্য। ভ্রমণবিলাসীদের মন জয় করে নেয়।

উল্লেখিত বিবরণাদির ভিত্তিতে কানিংহাম 'সংকিস' (সাংকাশ্য) বসন্তপুর নামক গ্রামকে একটি নগর রূপে অভিহিত করেন। এই গ্রামটি বর্তমান খিলান নামে খ্যাত। যার পরিমাপ হলো ৪০০ মি. x ৩০০ মি. x ১২ মি. এটি একটি ঢিবির উপর অবস্থিত। এর প্রায় ২৮৮ মি. উত্তরে ইটের মন্দিরের অন্য একটি ঢিবি রয়েছে। এছাড়াও মন্দির ঢিবি থেকে ১২২ মি. দূরে মৌর্য স্থাট অশোকের একটি স্তম্ভ রয়েছে। উত্তর প্রদেশে এসেছিলেন তখন এখানে প্রায় ৫ কি.মি.

সীমানাব্যাপী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকের তিনটি তোরণও আবিস্কৃত হয়েছে। এখানকার মাটির তৈরি সিলমোহরগুলোকে খ্রি.পু. ২০০ অব্দের বলে মনে করা হয়। 'সংকিসে' (সাংকাশ্যে) আবিস্কৃত অন্যান্য মূল্যবান প্রত্নবস্তুর মধ্যে আহত মুদ্রা, ছাপাংকিত তাম্রমুদ্রা এবং ইন্দেসিথিয়ান রাজা ও মথুরা শক্রপদের মুদ্রা, ভিক্ষুণী উৎপলার প্রতিকৃতিসহ একটি সিঁড়ির খোদিত একটি শীলালেখ, মহাপরিনির্বাণ শিয়ায় শায়িত বুদ্ধের একটি কালপাথরের মূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।^{১০} মূলত গৌতম বুদ্ধের স্তুতি জনচিত্তে জাগ্রত রাখার জন্য বৌদ্ধ শিল্পের সৃষ্টি।

'সাংকাশ্য' নগরে একটি বিশাল জলাধার বা পুকুরিণী রয়েছে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা 'কারেয়ার নাগ-দেবতা' নামে পূজা করেন। সাংকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শৈব সম্প্রদায়ের বহু ভজ্ঞ ও দশটি মন্দিরের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এখানে চারটি বিহারে প্রায় এক হাজার শ্রমণকে বাস করতে দেখেছেন চীনা পরিব্রাজকরা। পরিব্রাজকরা তাঁদেরকে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ে বলে মনে করেন। অন্যান্য বিত্তীর্ণ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে কিছু মন্দির রয়েছে, মন্দিরগুলো দেখতে অত্যন্ত মনোরম ও আকর্ষণীয় এবং এতে বিসারা দেবীর মূর্তি রয়েছে। প্রত্যেক আঘাটী পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। এছাড়াও এখানে কয়েকটি চিবি রয়েছে। স্থানীয় লোকদের কাছে 'কিল্লা' নামে পরিচিত এই চিবিগুলো। চিবিগুলোর কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ্যধর্মের তৈরি ভাস্কর্য ও অন্যান্য প্রত্ন-সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। মথুরার বেলে পাথরের তৈরি (প্রায় খ. এক শতক) একটি প্রাকার স্তুতি ও পাওয়া গেছে।^{১১}

বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্মের প্রাচীন ও সুন্দরতম উন্নতির নির্দশন হলো ভারহৃত ও সাঁচী স্তুপ। অতীত ঐশ্বর্যের স্বরূপের কারণে আজও সকলের শন্দা আকর্ষণ করে। ভারহৃত স্তুপের ন্যায় সাঁচী স্তুপটি ও তৎকালীন বাণিক ও উপাসক শ্রেণির দানে কালে কালে সমৃদ্ধ ও বিবর্ধিত হয়। এখানকার মঠ, চৈত্য, তোরণ, স্তুতি প্রভৃতিতে অপূর্ব সব ভাস্কর্যের মাধ্যমে জাতকের কাহিনী ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভারহৃত ও সাঁচীতে বুদ্ধের শরীর ভাস্কর্যে নির্মিত হয়নি। এখানে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- চক্র, স্তুপ, ঘোড়া, বোধিবৃক্ষ, পায়ের ছাপ ও ছাতা ইত্যাদি। এখানে চক্রের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তাঁর প্রথম ধর্ম প্রচারকে, বোধিবৃক্ষ দিয়ে বুঝানো হয়েছে তাঁর জ্ঞানলাভকে। এই ঐতিহাসিক বৃক্ষের নিচে বসেই শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ মারকে পরাজিত করে সম্মোধি জ্ঞান লাভ করে জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। স্তুপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা। ঘোড়া দ্বারা তাঁর রাজপ্রসাদ থেকে সন্ন্যাস যাত্রাকে বুঝানো হয়েছে। শূন্য সিংহাসন ও ছাতা দ্বারা বুদ্ধের উপস্থিতি বুঝানো হয়েছে।^{১২} ভারহৃত ও সাঁচী স্তুপের উত্তরদিকে তোরণের গায়ে তথ্যগত বুদ্ধের তেক্রিশ স্বর্গ হতে অবতরণের দৃশ্য খোদিত রয়েছে। সাতবাহন যুগে তোরণটি নির্মিত হয়েছিল। ভারহৃত নিবি-কা-কোট নামে পরিচিত বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ অনেকটা স্থান নিয়ে রয়েছে। নিবি-কা-কোট নামে পরিচিত অপর একটি মন্দির চিবির প্রায় ১৮৩ মি. পূর্বে অন্য একটি চিবি রয়েছে যাকে বিহার বলে মনে করা হয়। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে বহু সংখ্যক স্তুপের চিবিও লক্ষ্য করা যায়। এসব চিবি নিয়ে গঠিত সমগ্র নগরটি ৩৮৯ মি. বিস্তৃত এক প্রতিরক্ষা প্রাচীরে মেরাও ছিল।^{১৩} অনেকে মনে করেন এই নিবি-কা-কোট নামক স্থানে বুদ্ধ দেবলোক থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছিলেন। নিবি-কা-কোট মূলত এই 'সাংকাশ্য' নগরেই অবিস্কৃত।

তারহতে সাংকাশ্যের বংশধর।^{১০}

চিত্র-২

গান্ধারে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পে সাংকাশ্যের বংশধর।^{১০}

চিত্র-৩

বুদ্ধ সাংকাশ্যেতে প্রচার করছেন।^{১০}

চিত্র-৪

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) ‘শরণ’ কবিতায় বৌদ্ধ ভারতের অতীত সৃতি রোমাঞ্চন করা হয়েছে। কেনোনো মহাকালের অতীতকে কখনো ভুলে যাওয়া বা অস্মীকার করার কোনো অবকাশ নেই। অতীতের প্রভাব বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর পড়ে। মহাকাল অনাদি, অনন্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রত্যেক জাতিই তাদের জীবনের জয়গাঁথা নিয়ে অগ্রসর হয়। ইতিহাসের শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথ চলার নির্দেশনা দেয়। মানব জীবনে অতীতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বর্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির পেছনে রয়েছে অতীত নির্দেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানুষ যখন নিজ নিজ অঙ্গ হারাতে বসে, তখন পথ নির্দেশনা ঘৰপ আকঁড়িয়ে ধরে আপন অতীত ইতিহাসকে। অতীত হলো সমাগত বর্তমানে উভরণের সিঁড়ি এবং অনাগত ভবিষ্যতের পথ পরিকল্পনার সেতুবন্ধন। তাই বুদ্ধের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস মুছে ফেলা যায়নি। তাঁর জীবনের নানা ঘটনার সাথে যেসব স্থান জড়িয়ে আছে সেখানকার নির্দেশনসমূহ বিশ্ববাসীকে আজও আকৃষ্ট করে। লৌকিক দৃষ্টিতে অতীত অতীতই,

কিন্তু কবির কাছে অতীত মানে অবলুপ্তি নয়। অতীত বিরাট মহীরহের ন্যায় কর্ম, জ্ঞান ও কৃষ্ণ নিয়ে মানুষের উপর ধীর মন্ত্র গতিতে তার কাজ করে যাচ্ছে। তাই কবি লিখেছেন-

দেশ-দেশান্তর হতে ভারতের মন্দির প্রাঙ্গণে

অগাণিত তীর্থ্যাত্মী স্মরণের পুণ্য মহোৎসব

এসেছ কি আশা লয়ে, কি মহান স্মৃতির বন্ধনে !

কালের চরণক্ষেত্র সমাকীর্ণ বিস্মৃতির শবে-

আশাহীন মরণভূমি । ॥

৭. ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের গুরুত্ব

মনে আনন্দময় অনুভূতির সংগ্রহ করা ছাড়াও জীবনে ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের তাৎপর্য রয়েছে। যেকোনো ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দ্বারা মানুষ মুখোমুখি হয় অতীত ইতিহাসের ফেলে যাওয়া নির্দেশনসমূহের। এমন নির্দেশনের ইতিহাসের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটানোর মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করে। ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ ইতিহাসকে হাতে ছুঁয়ে দেখতে পারে। সে ইতিহাস হতে পারে ধর্মীয় ইতিহাস বা অন্য যেকোনো ইতিহাস।

মানবজীবন একটি অনন্ত ভ্রমণের অংশবিশেষ। তীর্থস্থান তথা ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন একটি আনন্দময় পুণ্য এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞাও ও অভিজ্ঞাতার উৎসও বটে। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের কীর্তি সম্পর্কে জানা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আবার এভাবেও বলা যায় তীর্থ্যাত্মা নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের যাত্রা। সাধারণত, এটি ব্যক্তির আস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসকৃত স্থানের জন্য যাত্রা। যদিও কখনও এটি কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে রূপক যাত্রা হতে পারে।

তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব নানাভাবে প্রতীয়মান হয়। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্মেরই অংশ। ধর্ম পালন করা যেমন কর্তব্য তেমনি এগুলো দর্শন করাও পবিত্রকর্ম ও কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ বিভিন্ন সময়ে এ সব দর্শনীয় স্থান ভ্রমণে যেয়ে থাকেন। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান ভ্রমণে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এটিই সত্য। এতে মন পবিত্র হয় ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত হয়। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থানে নানা দেশের লোক সমাগম ঘটে থাকে। তাঁদের সাথে মেলামেশা ও চলাফেরার সুযোগ ঘটে। যার ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে উঠে। এগুলো দর্শনের ফলে মানুষের দৃঢ়ত্ব খণ্ডন ও অকুশল পরিহার হয়ে থাকে। আবার ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে যে যত বেশি ভ্রমণ করবে তার জ্ঞান ততো বেশি বৃদ্ধি পাবে। ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মনের পবিত্রতা সৃষ্টি, পুণ্য অর্জন ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব। তাই সবার তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করা উচিত। আর ‘সাংকাশ্য’ এমন একটি ভ্রমণের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্থান হিসেবেই বৌদ্ধধর্মালয়ী জনগোষ্ঠী ও পর্যটকদের নিকট গুরুত্ব পেয়েছে।

৮. অর্থনৈতিক উপযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্তুরসমূহ যেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ, তেমনি অর্থনৈতিক সম্পদও। একটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এটি পর্যটনস্থানও। কাবণ বৌদ্ধধর্মালয়ীরা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে বৌদ্ধ তীর্থস্থানের পাশাপাশি পর্যটনস্থান হিসেবে পরিভ্রমণ করে থাকেন। সকল ধর্মের সকল প্রকার প্রাচীন তীর্থস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যেভাবে চিন্তা করতে পারি এবং

সংজ্ঞায়িত করে থাকি ঠিক সেটি প্রত্ততাত্ত্বিক সম্পদ। বুদ্ধগয়া, নালন্দা, রাজগীর, শ্রাবণ্তী, কুশিনগর কিংবা অজত্তা-ইলোরার মত সাংকাশ্যও একটি মহামূল্যবান পর্যটন সম্পদ। ঠিক একইভাবে পর্যটকের দৃষ্টিতে এসব ঐতিহ্য ও পর্যটনস্থান বা পর্যটন শিল্প হিসেবে পরিগণিত। কারণ সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর অনেক কিছুর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে তাতে মূলতড়ের কোনো পরিবর্তন, র্মাদা ও ধর্মীয় গুরুত্ব হারায় না। এ কারণে সাংকাশ্যকেও এই অর্থে পর্যটন শিল্পও বলা যেতে পারে। পর্যটন শিল্প পৃথিবীর একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্থাকৃত। পর্যটনের গুরুত্ব সর্বজনীন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে পর্যটন এখন অন্যতম প্রধান অঞ্চাকার খাত। ১৯৫০ সালে পর্যটকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ মিলিয়ন; যা ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২৩৫ মিলিয়নে।

২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়নেরও অধিক আন্তর্জাতিক পর্যটক বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করেন। ২০০৯ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৬.৬% বেশি ছিল।^{১১} ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটনে ৯১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬৯৩ বিলিয়ন ইউরো আয় হয়েছিল। যা ২০১৯ সালে প্রায় ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছিল, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তবে ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে এই শিল্প থেকে আয় ৫৩৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে।^{১০}

ধারণা করা হচ্ছে, এ বছর প্রায় ১৩৯ কোটি ৫৬ লাখ ৬০ হাজার পর্যটক সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন। অর্থাৎ বিগত ৬৭ বছরে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি ব্যাপকভাবে লাভ করেছে। পর্যটনের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে। ২০১৭ সালে বিশ্বের জিডিপিতে পর্যটনের অবদান ছিল ১০.৪ শতাংশ, যা ২০২৭ সালে ১১.৭ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া ২০১৭ সালে পর্যটকদের ভ্রমণখাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার। আর একই বছর পর্যটনে বিনিয়োগ হয়েছে ৮৮২.৪ বিলিয়ন ডলার। পর্যটনের উন্নয়নের একটি খণ্ডিত্র আমরা এর থেকে পেতে পারি।^{১১} বৌদ্ধ তীর্থস্থান, প্রত্ততাত্ত্বিক সম্পদ ও পর্যটন খাত বা শিল্প হিসেবে সাংকাশ্যকেও এ হিসেবের বাহিরে রাখা যায় না। কারণ বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থানসহ চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর পর্যটকরা প্রতি বছর ‘সাংকাশ্য’সহ বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রথমে সিংহলে (শ্রীলংকা) এবং পরে অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে আর এর ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠে। রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ নতুন দিল্লিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্ম সম্মেলনে যথার্থই বলেছেন যে, ভারত থেকে বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার বিশ্বায়নের প্রথম ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালের ১৫ অগস্টে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের সামুদ্রিক প্রতিবেশী আসিয়ান দেশগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে এই সমস্ত দেশের হাজার বছরের পুরনো ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে এবং বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যগুলো তাদের সাথে আমাদের সংযুক্ত করে।

যদিও ভারত বৌদ্ধধর্মের আবাসস্থল তবুও মনে করা হয় যে, বিশ্বের বৌদ্ধ পর্যটকদের কেবলমাত্র একটি ছোট অংশই এখানে আসে। বিশ্বায়নের বৌদ্ধ পরিম্বল ছাড়াও, বিদেশ থেকে আরো বেশি তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য ভারত বড় ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পীঠস্থান। পাল রাজাদের চারশত বছরের ইতিহাসে এসব ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত গৌরবের। যেমন পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতি শালবন বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়, চট্টগ্রামের

পঞ্চিত বিহারসহ অসংখ্য স্থাপনা। এমনকি বিক্রমপুরের অতীশ ভিটা, নরসিংহদীর ওয়ারি বটেশ্বর এবং খুলনা-যশোরের ভরত ভায়না প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারতের ‘সাংকাশ্য’ তথা ‘সাংকাশ্য নগরী’ এখন পর্যন্তও বৌদ্ধদের জন্য পবিত্র তীর্থস্থান হয়ে আছে এবং ‘ত্রিপিটকে’ উল্লেখ রয়েছে প্রত্যেক সম্যক সম্মুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গ থেকে উক্ত ‘সাংকাশ্য’ নগরে অবতরণ করবেন। এটিকে অপরিবর্তনীয় স্থান বলা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ‘সাংকাশ্য’ বৌদ্ধধর্মের ‘অষ্টমমহাতীর্থস্থানের’ অন্যতম একটি। আর ‘অষ্টমমহাতীর্থস্থানের’ মধ্যে অন্যান্যগুলো হলো-লুমিনী, বুদ্ধগায়া, সারনাথ, কুশিনগর, রাজগংহ, বৈশালী ও শ্রাবণী। এছাড়াও বৌদ্ধ ঐতিহ্যখ্যাত আরও যেসকল স্থানসমূহ রয়েছে সেগুলো হলো: গান্ধার, মথুরা, সঁচী, অজান্তা, ইলোরা, তক্ষশীলা, নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতি প্রভৃতি। বৌদ্ধ তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভারত-বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহের অত্যন্ত গৌরবময় কীর্তি। এ সব স্থানসমূহ বৌদ্ধ সভ্যতা ও কৃষ্ণ-সংস্কৃতির পীঠস্থানও বটে। সারা পৃথিবী হতে যেমন বৌদ্ধধর্মালয়ীরা এই ভারতভূমিতে অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থস্থান ভ্রমনে আসেন ঠিক তেমনি ‘সাংকাশ্য’-ও ভ্রমনের মধ্যে দিয়ে আত্মতুষ্টি ও পৃণ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। এছাড়া পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে পর্যটকরা ‘সাংকাশ্য’ পরিভ্রমণের মাধ্যমে নিজের মন ও আত্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। জানতে চেষ্টা করেন প্রাচীন ভারতের নান্দনিক সৌন্দর্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে। যার ফলে পর্যটকরা এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে বিকশিত ও সম্মুদ্ধ করে থাকেন। অপরদিকে প্রাচীন ভারতভূমির যে ঐতিহাসিক গৌরবময় অর্জন সেটিও নতুনভাবে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ ও স্থাবনা সৃষ্টি হয়। আবার ঐতিহ্য মানুষকে সাংস্কৃতিক চর্চা করতে ও শেখাতে সাহায্য করে, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রচার করে, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ার সুবিধা দেয়। শুধুমাত্র পরিচয়কে শক্তিশালী করে না বরং ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। সুতরাং প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের ইতিহাসে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে, এমনকি উপমহাদেশে তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে ‘সাংকাশ্য’ তথা ‘সাংকাশ্য নগরী’ ঘুর্ণোরবে-স্থমহিমায় তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা ধারণ করে টিকে ছিলো, আছে এবং আগামীতেও থাকবে সেটি আমরা একবাক্যে ধ্যাকার করতেই পারি। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদও এর বাহিরে নয়। আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্যসমূহকে ধারণে, লালনে এবং বিশ্ব দৃষ্টি আকর্ষণে আরও যত্নবান হবো-এটাই এ নিবন্ধের উপসংহার।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ত্রিপিটকে কুরু রাজ্যের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। তবে এ রাজ্যে বুদ্ধ একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। এখানে ‘কম্বাস্সধ্য’ নাম এক গ্রামে ভারতবাজাগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের সাথে বুদ্ধের দীর্ঘক্ষণ তত্ত্ব আলোচনা হয়। পরে পরিব্রাজক মাগন্দিয় ও ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দীক্ষা ইহণ করেন। এছাড়া খুলুকোত্তি নামক গ্রামে বুদ্ধ একবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। এ সময় তাঁর ধর্মদেশনা শুনে রট্টপাল (রাষ্ট্রপাল) বুদ্ধের দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে রট্টপাল বুদ্ধ শাসনের প্রভৃত উন্নতি সাধন করেন। কুরুরাজ্য বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের আমিন, কার্মল ও পানিপথ জেলা নিয়ে গঠিত। রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর (বর্তমান দিল্লীর কাছে ইন্দ্রপুর এলাকা) বুদ্ধের সময়ে কুরুরাজ্যের রাজা ছিলেন ধঞ্জয়। ইনি খুবই ধার্মিক রাজা ছিলেন।
২. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নকীর্তি, সময় প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৬৪

৩. <https://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/mapbud.htm> (Date: 07/10/2022)
৪. স্থানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, জাতক, তৃতীয় খঙ, কলকাতা, করণ্ণা প্রকাশনী, ১৪২২, পৃ. ২১৭
৫. Wikipedia, the free encyclopedia
৬. Leo A. Oppenheim, *Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization*, University of Chicago Press, Chicago, 1964
৭. এটি বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের মোজাফফপুর জেলার নাগরা বসার নামে পরিচিত। বৈশালী বজ্জী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল। তথাগত বুদ্ধের সময়ে নগরটি সমৃদ্ধ, জনবহুল ও খাদ্য সম্ভারে ষষ্ঠ সম্পূর্ণ ছিল। একদা এখানে দুর্তিক্ষ দেখা দিলে তা প্রতিকারের জন্য নগরবাসী লিছিবীরা বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ আনন্দ ছবিরকে সঙ্গে নিয়ে তথায় উপস্থিত হন। বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ ছবির রতনসূত্র পাঠ করলে বৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে স্বষ্টি ফিরে আসে। বৈশালীর সৌন্দর্য সবাইকে মুঞ্চ করত। উদেন চৈত্য, পোতমক চৈত্য ও স্বত্বস্বক চৈত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বৈশালীর মহাবন কূটগার শালা নামক বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ বহু লোককে স্বধর্মে দীক্ষা দেন। এখানেই আনন্দ ছবিরের অনুরোধে বুদ্ধ বহু লোককে সদর্মে দীক্ষা দেন। এখানেই আনন্দ ছবিরের অনুরোধে মহাপ্রজাপতি গোতমীসহ বহু শাক্য রমণীকে দীক্ষা প্রদানের অনুমতি দিয়ে সর্বস্থথম ভিক্ষুভীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বীরশ্রেষ্ঠ ইক্ষাকুর পুত্র রাজা বিশালের নামানুসারে বৈশালী নামের উভব। অপরপক্ষে বিশাল রাজ্যের রাজধানী বলে নগরটির নাম বৈশালী রাখা হয়।
৮. পালি 'কোসমী' বা সংস্কৃত কোশাস্মী হল বৎস জনপদের রাজধানী। বর্তমান নাম কোসম, যা ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ এলাহাবাদের বত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। বারাণসী হতে কোশাস্মীর দুরত্ব নদীপথে প্রায় ২৪০ মাইল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কোশাস্মী নগরের যোসিতারাম বিহারটি দেখেছিলেন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং নগরটি পরিদর্শনকালে ভগুদশায় বহু বিহার, দেবমন্দির, স্তুপ ও ঘোসিত শ্রেষ্ঠীর বাড়ি দেখেন এবং বিহারগুলোতে বসবাসকারী বহু ভিক্ষুও দেখেন। পরবর্তীতে প্রত্বত্ত আবিষ্কারে নগরের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়।
৯. এটি প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোগা জেলার প্রাচীন অচিরাবতী (রাপতি) নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমান নাম সায়েত-মায়েত। 'সক্রমেথ অর্থীতি সাবথি'-এখানে সবকিছু পাওয়া যেত বলে এর নাম শ্রাবণ্তী। এক সময় আমদানী-রঙ্গানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী নির্মিত 'জেতবন মহাবিহার', বিশাখার 'পূর্বরাম বিহার', রাজা প্রসেনজিতের 'রাজকারাম', তাঁর অগ্রহায়ী মল্লিকার 'মল্লিকারাম' এখানে অবস্থিত। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সাথে শ্রাবণ্তীর নিরিঢ় সম্পর্ক আছে। বুদ্ধ শ্রাবণ্তীর জেতবন বিহারে উনিশ বর্ষা এবং পুর্বারাম বিহারে ছয় বর্ষা-সর্বমোট পঁচিশ বর্ষা শ্রাবণ্তীর জেতবনে যাপন করেছিলেন। স্মার্ট অশোকের সময়েও শ্রাবণ্তীর খ্যাতি ছিল। খ্রিস্টীয় ৫ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন শ্রাবণ্তী পরিদর্শন করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি তীর্থ্যাত্মীদের জন্য বৌদ্ধরাষ্ট্র নতুন বিহার ও যাত্রী নিবাস নির্মাণ করেছে।
১০. ভারতের বিহার প্রদেশের নালন্দা জেলার বর্তমানে রাজগির নামে পরিচিত মগধ রাজ্যের রাজধানী 'রাজগহ' মহাপরিনির্বাণ সুন্দর অনুসারে, প্রাচীন ভারতেরই ছয়টি প্রধান নগরের মধ্যে অন্যতম ছিল। নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বপ্নত মহাপোবিন্দ। অধিকাংশ প্রাচীন পালিগ্রহে নগরটির উল্লেখ থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রাক-মৌর্য ও মৌর্য্যুগে তা প্রাগবন্ত অবস্থায় ছিল। রাজগহ ছিল মগধের প্রথম রাজধানী। বৌদ্ধযুগে তা রাজগহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজগহ নগরের প্রধান দুর্গ অংশ ছিল। পর্বত বেষ্টিত প্রাচীন অংশটির নাম ছিল গিরিবজ এবং পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত পরবর্তী অংশটি রাজগহ। রাজগহ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ পীঠঘান।

১১. করুণানন্দ ভিক্ষু, পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৯
১২. এটি ত্রিপিটক বহিভূত ছয়। কিন্তু ত্রিপিটকের সারসংক্ষেপ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে যুক্তি, তর্ক, উদাহরণ ও উপমা সহকারে।
১৩. V. Gordon Childe, *The Urban Revolution*, Town Planning Review, Vol : 21, 1950, p. 4-7
১৪. Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City of Past and Present*, New York, 1960, pp. 69, 75
১৫. সাধনানন্দ মহাস্থানীয়, সুভানিপাত, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৭১
১৬. সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮
১৭. বিষিসার (৫৫৮ খ্রিঃপৃঃ-৪৯১ খ্রিঃপৃঃ) হর্যক্ষ রাজবংশের রাজা ছিলেন।
১৮. হর্যক্ষ রাজবংশের রাজা ছিলেন, যিনি ৪৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মগধ শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে হর্যক্ষ রাজবংশের শাসন সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। অজাতশক্তি হর্যক্ষ রাজবংশের রাজা বিষিসার ও কোশল রাজকন্যা চেলেনার পুত্র ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের প্রতি দৈর্ঘ্যপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেবদত্তের পরোচনায় অজাতশক্তি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠাপোষক বিষিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের মতাদর্শে বিখ্যাতী বিষিসার এই ঘটনায় তাঁর পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশক্তি বিষিসার ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীকে গৃহবন্দী করে নিজেকে মগধের শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ৪৯১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৃহবন্দী অবস্থায় বিষিসারের মৃত্যু ঘটে। এই সময় দেবদত্তের প্ররোচনায় তিনি গৌতম বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেন। পিতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দন্ত অজাতশক্তি শাস্তিলাভের আশায় বিভিন্ন ধর্ম উপদেষ্টা ও দাশনিকের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁদের উপদেশে শাস্তিলাভে ব্যর্থ হয়ে রাজবৈদ্য জীবকের উপদেশে গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হলে বুদ্ধ তাঁকে সামঞ্জস্যফলসূত্র ব্যাখ্যা করেন।
১৯. সময় গণনাকে পালিতে কল্প বলে। কল্প মানেই অতি অতি দীর্ঘকাল সময়কে কল্প বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কল্প মোট ৬টি রয়েছে। তার মধ্যে ভদ্রকল্প একটি। ভদ্রকল্পে ৫জন উৎপন্ন হয়।
২০. মনোরঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৮
২১. Wikipedia, the free encyclopedia
২২. রণধীর বড়ুয়া, মহামানব বুদ্ধ, ১৯৫৭, চট্টগ্রাম, পৃ. ১১০
২৩. ধর্মাধার মহাস্থানীয়, ধর্মপদ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্গুর সভা, কলিকাতা ১৯৫৪, পৃ. ৫৮
২৪. H. Oldenberg ed. *Vinaya-pitaka*, PTS, London, 1969, p.12
২৫. ধর্মতিলক, সন্ধাম-রঞ্জকর, দি করপোরেট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন, তাইওয়ান, ১৯৩৬, পৃ. ৪০২
২৬. দ্বীশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, করণা প্রকাশনী, ১৪২২, পৃ. ৬৭
২৭. করুণানন্দ ভিক্ষু, পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, পৃ. ১৬২
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩
৩০. বিমল চন্দ্র দত্ত, বৌদ্ধ ভারত, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, পৃ. ৯৮
৩১. রফিকুল আলম, বিশ্ব সভ্যতা ও শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৩২-২৩৩

৩২. কর্কণানন্দ ভিক্ষু, পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪,
পৃ. ১৬২
৩৩. *Wikipedia, the free encyclopedia*
৩৪. *Wikipedia, the free encyclopedia*
৩৫. *Wikipedia, the free encyclopedia*
৩৬. হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত, বৃক্ষপ্রণাম, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা-
১৯৯৩, পৃ. ৩১
৩৭. *UNWTO world Tourism Highlights, 2011*, ১৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে আর্কাইভ
করা। সংগ্রহের তারিখ ৯ জানুয়ারী ২০১২
৩৮. ‘International tourism revenue’, *Statistics*, সংগ্রহের তারিখ ১৮.০৫.২০২২
৩৯. মোহাম্মদ বদরজামান ভুঁইয়া, যুগান্তর পত্রিকা, ০৪ ফেব্রুয়ারি ১০১৯

**মালবেদে জনগোষ্ঠীর জাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত মুসিগঞ্জ
জেলার গোপালপুর গ্রাম**

(Kinship and Descent System of Malbedey Community: A Case
Study of Gopalpur Village in Munshiganj District.)

কাজী মিজানুর রহমান*

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধটিতে মুসিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রামের মালবেদে জনগোষ্ঠীর জাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা বিশেষ করে মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত এবং পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় জাতি এবং বংশধরদের ভূমিকা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর একটি উপশাখা হলো মালবেদে যারা আতীতে নৌকায় বসবাস এবং নদীপথে ঘুরে ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করতো। এই জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা সাপধরা ও বিক্রি, কবিরাজি, কড়িমালা বিক্রি, তাবিজ বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠী নৌকা জীবন ত্যাগ করে ডাঙায় ছায়ী ও অছায়ীভাবে বসবাস করছে এবং তাদের অনেকেই প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে গ্রামীণ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতেও জাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতে রঞ্জ, বিবাহ ও কাল্পনিক আতীয়তার সম্পর্ক এবং বর্ণনামূলক পদাবলি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এই ব্যবস্থায় এতেককে নির্দিষ্ট করে সংযোধন করা হয়। যেমন- মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, খালা, খালু, চাচা, চাচি, মামা, মামি, দুলা ভাই, ভাবি, ননদ, শালা, শালি, খালাতো ভাই, খালাতো বোন, চাচাতো বোন, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, মামাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুফাতো বোন, ভাতিজা, ভাতিজি, ভাইঝা ও ভাঙ্গি ইত্যাদি। এছাড়া তাদের মধ্যে পিতৃসূরীয় বংশধারা প্রচলিত রয়েছে। এই ধারায় উত্তরাধিকার, বংশধারা, সম্পত্তি, পদবি ও মর্যাদা পিতা থেকে পুরো ওপর বর্তায়। উল্লেখ্য প্রবন্ধটি রচনায় ন্তৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্যের পাশাপাশি ধারণায়নের জন্য মাধ্যমিক উৎসের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

Abstract

The paper analyzes the kinship and descent system of Malbedey Community at Gopalpur village in Munshiganj District. An attempt has been made to explore the role of kin and descent in the traditional and changing life systems of the Malbedey community, in particular. Here Malbedey is a sub- branch of Bedey community

* সহযোগী অধ্যাপক, ন্তৃবৈজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইল: kazimizanurr@yahoo.com

in Bangladesh who had lived on boats travelling along the rivers for their livelihood since past. They are also a marginal group who customarily catches and sells snakes. Additionally, they are a folk healer, selling beads, amulets and a few more items. At present, the Malbedey community has come out the boat life to live permanently settling on land, and many of them have abandoned their traditional occupations to make a living through various informal economic activities in rural areas. The Malbedey community has the same kinship and descent system having extended as part of larger population. Research shows that blood, marriage, fictitious kinship and descriptive kinship terminologies do exist among the Malbedey community. In their kinship system everyone is addressed specifically in descriptive kinship terminologies like, Mother, Father, Grandfather, Grandmother, Aunt, Uncle, Cousin, Nephew, Niece and so on. Apart from this, patrilineal descent is common among them. In this section inheritance, descent, property, titles and status are passed from father to son. It should be noted that in writing the article, data have been collected through intensive fieldwork in an anthropological method which is additionally supplemented by secondary data.

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে বিভিন্ন প্রাচীক জনগোষ্ঠী রয়েছে, তার মধ্যে বেদেরা অন্যতম। বেদে জনগোষ্ঠী অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের জীবিকার প্রয়োজনে নৌকায় এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় বলে প্রচলিতভাবে অনেকেই তাদেরকে 'যায়াবর' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। বেদেরা সাধারণভাবে বাদিয়া বা বাইদ্যা নামে পরিচিত (খান, ২০১১ক:৪৪৫)। এই জনগোষ্ঠী সাপের খেলা দেখিয়ে ও নানা ভেজ ঔষুধ এবং ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আবার এদের মধ্যে অনেকে বানর খেলা ও যাদু দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। এছাড়া বেদেরা সাপের কামড়ের চিকিৎসা, মাজা-কোমড়, হাত পায়ের ব্যথা নিরাময়ের জন্য সিঙ্গা লাগায় ও বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্য তাবিজ বিক্রি করেন (কাজল, ২০২১)। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ (২০২১) অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯ জন মুসলিম এবং ৯০ ভাগ নিরক্ষর। বেদে পুরুষরা কর্মবিমুখ ও অলস প্রকৃতির। তবে নারীরা সাহসী ও পরিশ্রমী। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় বেদেরা বসবাস করছেন। তবে মুসিগঞ্জ, সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার শ্রীপুর এলাকায় অধিকাংশ বেদেরা বসবাস করেন। ধারণা করা হয়, এই জনগোষ্ঠী শরণার্থী আরাকানরাজ বল্লাস রাজার সাথে ১৬৩৮ সালে ঢাকায় প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরা প্রথমে মুসিগঞ্জ জেলায় (পূর্ব নাম বিক্রমপুর) বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে ছড়িয়ে পড়ে (বাংলাপিডিয়া, ২০১৫)। Wise (1883) হচ্ছে সর্বপ্রথম লেখক যিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির নাম লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বেদেদের ৭টি বিভাগের কথা বলেন। এগুলো হচ্ছে—বা-বাজিয়া, বাজিকর, মাল, মীর-শিকারী, সাপুড়িয়া, সানদার এবং রাসিয়া। এদের মধ্যে মালবেদে জনগোষ্ঠী মুসিগঞ্জ ও সাভারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। তাদের প্রথাগত পেশা হলো সাপ ধরা এবং বিক্রি করা, কবিরাজি, তাবিজ বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। তবে এই জনগোষ্ঠী বর্তমানে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে গ্রামীণ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে (রহমান, ২০১৪:৫৮)। মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে নৌকায় অঞ্চলিক অঞ্চলে বসবাস করতো। কিন্তু বর্তমানে আর কোন মালবেদে

পরিবার নৌকায় বসবাস করে না। এখন তারা ডাঙায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা বর্ষাকালে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এবং কার্তিক-অহোয়ণ (শুকলো মৌসুমে) মাসে গোপালপুর থামে চলে আসে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় তাদের মধ্যে বর্ণামূলক পদাবলি ব্যবস্থা এবং পিতৃসূত্রায় বৎসরার ব্যবস্থা বিশেষণ করা। এমন প্রেক্ষাপটে গবেষণা প্রবন্ধটি রচনায় মুসিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর থাম থেকে প্রত্যক্ষ নিরিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার ব্যবস্থা নিয়ে বস্ত্রনির্ণয় কোনো গবেষণা পত্র এখনো রচনা হয়নি। এমন অবস্থায় এই জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা জরুরী। গবেষক মনে করেন প্রস্তাবিত অনুসন্ধান তাদের প্রথাগত এবং পরিবর্তিত জীবন ব্যবস্থায় জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার ভূমিকা কী তা স্পষ্ট করবে। এই যৌক্তিকতায় বর্তমান গবেষণা পত্রে মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মালবেদেদের জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বৎসরার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রাণ্তিক এই জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষিত এলাকা

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি ন্যূবেঙ্গানিক পদ্ধতিতে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করে রচনা করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা পত্রটি বস্ত্রনির্ণয় করার প্রয়োজনে গুরুত্ব উপাত্তের পাশাপাশি পরিমানগত উপাত্ত সান্ত্বিতে করা হয়েছে। উল্লেখ্য গবেষণায় প্রত্যক্ষ মাঠকর্মের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে গোপালপুর থামে একটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপ অনুযায়ী গোপালপুর থামে মালবেদে খানা সংখ্যা ২৫৫টি এবং মোট বেদে সংখ্যা ১৪১৫ জন। তমধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন এবং নারী ৬৮৫ জন। তারপর ২৫৫টি খানা থেকে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫৫ জন তথ্যদাতা নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় (১৮ জন নারী, ১২জন পুরুষ) এবং ২৫জন পরিবর্তিত পেশা আর্থ- অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত (১৭জন পুরুষ, ৮ জন নারী)। কাঠামোগত ও আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা অনুসারে নির্বাচিত ৫৫ জন তথ্যদাতার নিরিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মূল তথ্যদাতাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে মালবেদে জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থায় জ্ঞাতি ও বৎসরদের ভূমিকা, তাদের আচার-অচরণ, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়। এবং মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই ও ত্রুসচেক করার জন্য দলগত আলোচনা করা হয়। এছাড়া বেদে জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষনাকর্ম (পূর্বেকার), বই, প্রবন্ধ ও ফিচারসমূহ গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। গবেষণার মাঠকর্মটি ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারী থেকে ২০২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত করোনার কারণে বিরতি দিয়ে চলমান থাকে।

বর্তমান গবেষণার জন্য মুসিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর থামকে নির্বাচন করা হয়। গবেষিত থামে গৃহস্থ (বাঙালি মুসলমান), হিন্দু ও মালবেদে জনগোষ্ঠী বসবাস করে। গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা যায়, গোপালপুর থামে ১টি প্রাথমিক

বিদ্যালয়, ২টি মদ্রাসা, ৪টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ১টি বাজার, ১টি ক্লাব, ১টি পোস্ট অফিস ও ১টি পুকুর আছে। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার একবার হাট বসে। কাজীর পাগলা নামে গোপালপুর গ্রামের পাশে একটি হাইস্কুল আছে। এছাড়া মাঠকর্মে দেখা যায় মালবেদেরা বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও করুতর পালন করেন। এবং বাড়ির আঙিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলের ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ আছে। এমনকি তাদের অনেকের ঘরে টিভি, ফ্রিজ ও ফ্যান রয়েছে। তবে কয়েকটি ঘরে এখনও বিদ্যুত সংযোগ নেই। গোপালপুর গ্রামের বিলে বাঙালি গৃহস্থরা আমন ধান চাষ করে। এছাড়া গ্রামে আম, জাম, পেয়ারা, বড়ই, কাঠাল, কামরাঙা, নারকেল ও বিভিন্ন কাঠ গাছ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি, আর এ কারণে তাদের কেউ কৃষিকাজ করে না। তবে মজুরি শ্রমিক হিসেবে অনেকে কৃষি জমিতে কাজ করে। মালবেদের ঐতিহ্যবাহী পেশা হল সাপ ধরা এবং বিক্রি, সিঙা লাগানো, কবিরাজি, কড়ি মালা ও তাবিজ বিক্রি। বর্তমানে গোপালপুর গ্রামের অনেক মালবেদে তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন অনন্তর্ণানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। যেমন: মুদি দোকান, ফলের ব্যবসা, বইয়ের দোকান, সেলুনের দোকান, কাঠ মিঞ্চী, ফেরি করা, হোটেল ব্যবসা ও টেইলারী। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় মালবেদেরা সৈদুল আয়হায় গোপালপুর গ্রামে চলে আসে এবং সকলে একত্রিত হয়ে সৈদুল উদ্যাপন করে ও পশু কোরবানি দেয়। মজার বিষয় হল, এই সময় সাধারণত মালবেদে নারী-পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং নানাবিধি সমস্যা ও অপরাধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

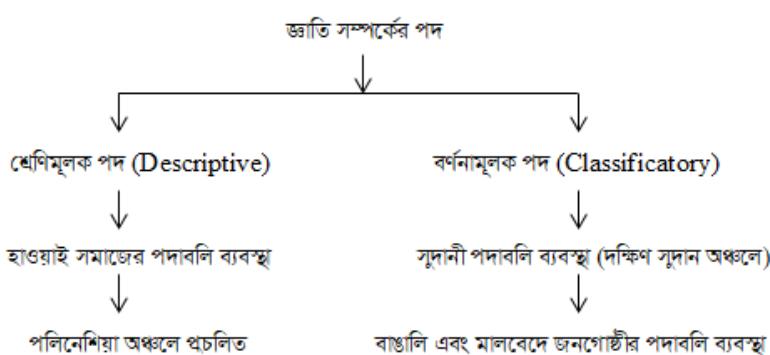
জ্ঞাতিসম্পর্ক

জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো রক্ত, কান্নানিক এবং সামাজিক বন্ধন। অর্থাৎ প্রকৃত, অনুমিত অথবা কান্নানিক রক্তের সমন্বয় দ্বারা সম্পর্কিত ব্যক্তিসমূহ (Fox, 1967:33)। আর এই সম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। ন্যুরিজনী Radcliffe Brown (1952) আত্মীয়তার সম্পর্কের সংজ্ঞা দিতে শিয়ে বলেন, জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল এবং এই সম্পর্কই গঠন করে সমাজ কাঠামো। এনিকে Majumder and Madan (1995) বলেন, সকল সমাজে মানুষ নানা সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক ও সর্বজনীন বন্ধন হলো মানুষের জৈবিক প্রজননের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা আত্মীয়তা ব্যবস্থা। আবার Crapo (2002) আত্মীয়তা সম্পর্কে বলেন, বিবাহ ও বংশানুক্রমের বন্ধনের দ্বারা সম্পর্কিত মানুষদের শ্রেণি বিভাজনের ব্যবস্থা হলো আত্মীয়তা। আত্মীয়তা সম্পর্কের দুটি দিক আছে। একটি হলো সামাজিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রধান দুটি প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়, যেমন- ১। রক্ত-সম্পর্কিত, ২। বৈবাহিক। এছাড়া Murdock (1949) বলেন, আত্মীয়তা ব্যবস্থা কোনো গোষ্ঠী ব্যবস্থা নয়, এটা হলো সম্পর্কের গাঠনিক বিন্যাস। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হয় (উদ্ভৃত, বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৩:১৪৪)। মজার বিষয় হলো অনেক সংস্কৃতিতে, আত্মীয়তা সম্পর্ক, প্রজনন এবং সত্তান-পালন প্রতীক এবং বিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকে। আত্মীয়তা ব্যবস্থা একটি সংস্কৃতিতে প্রধানত আত্মীয় সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে উঠে এবং নানা ধরনের আচার-আচরণ জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে ন্যুরিজনীরা আবিক্ষার করেন যে, আত্মীয়তা অশিল্পায়িত এবং রাষ্ট্রাধীন সংস্কৃতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ সুশৃঙ্খল নীতি। আত্মীয়তা গোষ্ঠী বিবাহ আয়োজনের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সদস্যদের নিশ্চয়তা দেয় এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং উৎপাদন, ভোগ এবং বট্টন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সদস্যদের প্রধান মৌলিক চাহিদাগুলো সরবরাহ করেন। বৃহৎ পরিসরে শিল্প সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন বিদ্যমান। তবে সামাজিক বন্ধনের অন্যান্য রূপ মানুষকে একত্রিত করে (Miller, 2007:202)। আত্মীয়তা হলো সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। রক্ত (consanguineal) এবং বিবাহ সম্পর্কের (affinal) মাধ্যমে আত্মীয়তা গড়ে উঠে, যা মানুষকে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতার জালে যুক্ত করে। আত্মীয় সম্পর্ক সাংস্কৃতিকভাবে সংজ্ঞায়িত, যার দুটি মৌলিক কার্যাবলি রয়েছে। প্রথমত, আত্মীয় সম্পর্ক প্রজন্মের মধ্যে ধারাবাহিকতা প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তা বিশেষ অন্যদের নির্দিষ্ট করে, যার ওপর একজন ব্যক্তি সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে পারে। বিভিন্ন আত্মীয়দের শ্রেণিকরণের জন্য নির্দিষ্ট পদ রয়েছে যাকে জাতি পদাবলি ব্যবস্থা বলা হয় (Nanda and Warms, 1997:182)।

যে শব্দ বা পদ দ্বারা কাউকে ডাকা বা সম্মোধন করা হয় তাকে জাতিসম্পর্কের পদ বলা হয়। যেমন—বাবা, মা, মামি, খালা, খালু, চাচা, চাচি ইত্যাদি। Morgan (1871) জাতিসম্পর্কের পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—একটি শ্রেণিবাচক পদ, অন্যটি বর্ণনামূলক পদ। শ্রেণিবাচক পদ দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায় না। কারণ এটা প্রাক-একক বিবাহ পরিবার সময়কালে বিরাজমান ছিল এবং সে সময় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গঠিত হতো। ফলে একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের আত্মীয়তার সম্পর্ক চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য ছিল। তাই, জাতি সম্পর্ককে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণির সকলকে বোঝাতে একটি পদ বা শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে মর্গান বলেছেন, ইগো (Ego) বা আমার নিজের বোন এবং আমার মায়ের বোনের কন্যারা সবাই আমার বোন; আমার নিজের ভাই এবং আমার পিতার ভাইয়ের পুত্রা সবাই আমার ভাই। এ ব্যবস্থাকে তিনি মালয় ও তুরানীর বলে উল্লেখ করেছেন। আর বর্ণনামূলক পদ বা শব্দ দ্বারা রক্ষের সম্পর্ক স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যায়। কারণ, এ পর্যায়ে যুগল বিবাহ পরিবারের আবিভাব ঘটে। এ প্রক্ষিতে এক বা একাধিক পদ ব্যবহার করে প্রত্যেক আত্মীয়কে নির্দিষ্ট করে সম্মোধন করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী, স্বামীর ভাই, বোন, পিতা, পিতার ভাই, বোন, পিতার ভাই ও বোনের সন্তান, মা, মায়ের ভাই, বোন, মায়ের ভাই ও বোনের সন্তান এবং স্ত্রীকে নির্দিষ্ট পদ দ্বারা সম্মোধন করা যায়। এ প্রথাকে মর্গান আর্য, সেমেটিক ও উরালিয়ান পরিবারভূক্ত করেছেন (উদ্ধৃত, রহমান, ১৯৮৮:৩২৯)।

চৰক ১: জাতি সম্পর্কের পদাবলি ব্যবস্থা



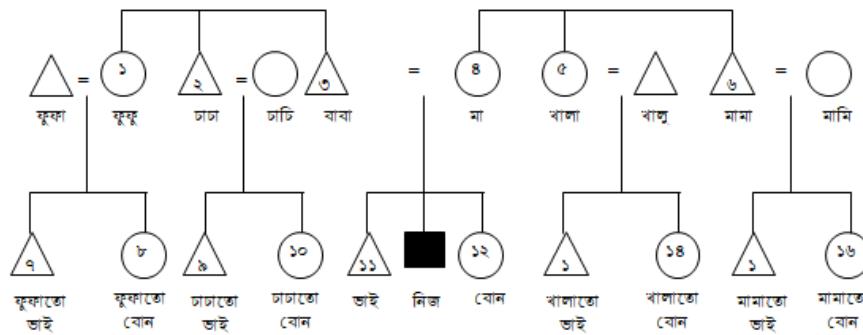
(উৎস: মর্গানের তথ্যসূত্র থেকে পরিবর্তন করে গবেষকের মাঝ-কর্মভিত্তিক তথ্য থেকে গঢ়ীত)

ন্তরিঙ্গনী Murdock (1949) ছয় ধরনের জাতিবাচক পদব্যবস্থার কথা বলেন। যেমন- ১. সুদানীয় ব্যবস্থা, ২. হাওয়াইয়ান ব্যবস্থা, ৩. ইরোকুয়া ব্যবস্থা, ৪. ওমাহা ব্যবস্থা, ৫. ক্রো ব্যবস্থা, ৬. এঙ্কিমো ব্যবস্থা। সুদানীয় ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বর্ণনামূলক বা নির্দিষ্ট। কেননা এ ব্যবস্থায় প্রতিটি আতীয়কে, যেমন- মাতা, পিতা, মাতার বোন, মাতার ভাই, পিতার বোন, পিতার ভাই এবং নিজ জেনারেশনের (ইগোর) সকল আতীয়, যেমন-ভাই, বোন, পিতার ভাইয়ের সন্তান, পিতার বোনের সন্তান, মাতার ভাইয়ের সন্তান, মাতার বোনের সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। সুদানীয় ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। আর হাওয়াইয়ান ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শ্রেণিমূলক। একেত্রে বিশেষ বিশেষ আতীয়কে পৃথক পদ দ্বারা ডাকার সুযোগ নেই। হাওয়াইয়ান ব্যবস্থায় পিতার জেনারেশনে পিতা, পিতার ভাই এবং মাতার ভাইকে একটি পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। আবার মাতা, মাতার বোন এবং পিতার বোনকে একটিমাত্র পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। নিজ জেনারেশনের বেলায় (ইগোর জেনারেশন) একই পদ আপন বোন এবং সকল মেয়ে কাজিনদের (চাচাতো, মামাতো, খালাতো) একটি পদ দ্বারা এবং আপন ভাই ও সকল পুরুষ কাজিনদের (চাচাতো, মামাতো, খালাতো) একটি পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয় (উদ্ভৃত, রহমান, ১৯৮৮:৩৩১)।

গবেষিত মুসিগঞ্জের হলদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের মালবেদেদের মাঝে প্রচলিত জাতিসম্পর্কের পদসমূহ বৃহত্তর বাঙালি মুসলিম সমাজের বর্ণনামূলক পদব্যবস্থার অনুরূপ। মালবেদেরা বৃহৎ (মুসলিম) সমাজের মতো দাদা-দাদি, নানা-নানি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা-খালু, ভাই-বোন, নন্দ, খালাতো ভাই, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, মামাতো ভাই, মামাতো বোন, আপা, দুলা ভাই, শালা-শালী, ভাই, ভবি ইত্যাদি পদাবলি ব্যবহার করেন। মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্ত ও বিয়ে সম্পর্কিত জাতি ছাড়াও কাল্লানিক বা প্রথাগত জাতি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-টাকিল বাপ, ধর্মের ভাই, সই বা বন্ধু ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় নিকট জাতি থেকেও অনেক সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সম্প্রদায়ের কারও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে বা কেউ অসুস্থ হলে প্রথাগত আতীয়রা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কাল্লানিক বা প্রথাগত জাতি সম্পর্কে জেহাদুল করিমের গবেষণায়ও একই বিশ্লেষণ পাওয়া যায় (Karim, 1990:80)।

মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিসম্পর্ক খুব মজবুত। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিপদে অথবা অসুখে পড়ে, তখন নিকট জাতিরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যেমন-টাকা ধার দেয় এবং অসুখ হলে সেবা করেন। উল্লেখ্য যে মালবেদে জনগোষ্ঠীর কেউ বৃহৎ সমাজ দ্বারা আক্রান্ত হলে বেদেরা সকলে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলে। অতীতে মালবেদেরা নৌকায় বসবাস করত এবং যায়াবরের মতো ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করত। এ সময় নিকট জাতিরা কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করত এবং বিপদ আপদে পরিস্পরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। তবে বেদেদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছতা ও পেশার প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বাইরে থাকার কারণে সেবা ও সাহায্যে করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সংগ্রহ হয় না। বিষ্ট তাদের মধ্যে জাতিসম্পর্কের অনুভূতি বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে মালবেদেদের মধ্যে জাতি সম্পর্কের অনুভূতি বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তবে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছতার কারণে অনেক সময় তাদের মধ্যে জাতিসম্পর্কে শিথিলতা দেখা যায়।

ছক ২: মালবেদে জনগোষ্ঠীর জাতি-পদাবলি ব্যবস্থা



(উৎস: মাঠ-কর্ম, ২০২০-২২)

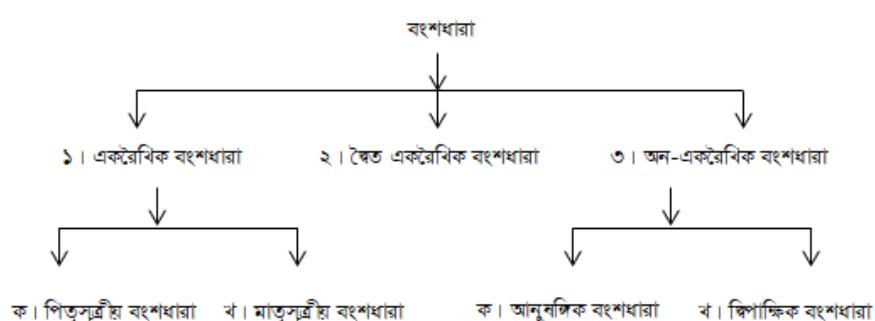
বংশধারা

বংশধারা বলতে বংশের ধারাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বলা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষের সম্পর্ক দুভাবে সংগঠিত হতে পারে, হয় তাঁর বাবা অথবা তাঁর মায়ের বংশ থেকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারণের ধারা হতে পারে, হয় তাঁর কন্যাসন্তান অথবা তাঁর পুত্রসন্তান থেকে। যদি পিতার বংশ থেকে বংশের ধারা বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাকে বলে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা। আবার যদি মাতার বংশ থেকে বংশের ধারা বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাকে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বলে (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৫৮)। বংশধারা পিতা, মাতা অথবা উভয়ের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। বংশধারা যখন পিতা অথবা মাতার মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়, তখন এই গোষ্ঠীগুলোকে যথাক্রমে পিতৃসূত্রীয়, মাতৃসূত্রীয় বংশধারা বলা হয়। সমষ্টিগতভাবে দুটি ধারাকে একসূত্রীয় বংশধারা বলা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজে মাতৃসূত্রীয় এবং পিতৃসূত্রীয় বংশধারা উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে যা একটি জটিল ধরনের বংশধারা তৈরি করে। যেখানে বংশধারা উভয় ধারার সঙ্গে স্বীকৃত এবং স্থায়ী। এ ধরনের বংশধারাকে কগনেটিক বলা হয়। Levi-Strauss (1969) বলেন, সকল বংশধারা ব্যবস্থার এক-তৃতীয়াংশ কগনেটিক (Cited in James Birx, 2010:180)। Fried (1967) বলেন, বংশধারা হলো একটি স্থায়ী সামাজিক ইউনিট যার সদস্যরা মনে করে তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। যদিও দলটির সদস্যপদ পরিবর্তিত হয়। যেমন-সদস্য জন্ম নেয় এবং মারা যায়, সদস্য দলে আসে এবং বের হয়। তারপরও দলটি টিকে থাকে। বংশের বেশিরভাগ সদস্যরা প্রায়শই অন্যান্য বংশ থেকে তাদের সঙ্গে থাকে (Cited in Kottak, 2004: 263)। বংশধারা হলো এক ধরনের আতীয়তা যেখানে একটি বংশধরের সদস্য হওয়ার মানদণ্ড হলো একটি নির্দিষ্ট বাস্তব বা পৌরাণিক পূর্বপুরুষ। বংশধারা এককভাবে পুরুষের মাধ্যমে গণনা করা যেতে পারে। এককভাবে নারীর মাধ্যমে, অথবা ব্যক্তি বিবেচনার ভিত্তিতে। কিছু ক্ষেত্রে, বংশধারা নির্ণয়ে দুটি ভিন্ন ধারা একই সময়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। আতীয়তার সূত্র ধরে একটি সমাজ সংগঠিত হওয়ার উপায়কে ন্যূনতমানীরা বংশধারা বলে। একটি বংশধারা গোষ্ঠী হলো যে কোনো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত সামাজিক কার্যকলাপ যার সদস্যতার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাস্তব বা পৌরাণিক পূর্বপুরুষের রৈখিক বংশধরের প্রয়োজন হয়। একটি বংশধরের সদস্যরা একটি পিতা-পুত্রের সংযোগ ধারার মাধ্যমে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করেন (Haviland,

2018: 289)। আবার অন্যভাবে বলা যায় বংশধারা হলো এক বা উভয় পিতামাতার সাথে সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন। অনেক সমাজে সামাজিক গোষ্ঠীর ভিত্তি হিসেবে বংশধর জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বংশ হলো আত্মায়দের একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের বংশধর হিসেবে চিহ্নিত হয়। বংশ পুরুষ ধারা থেকে গঠিত হলে তাকে পিতৃবংশ বলা হয় এবং নারী ধারা থেকে গঠিত হলে মাতৃবংশ বলা হয়। পিতৃসূত্রীয় সমাজে, একজন ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী যাই হোক না কেন) পিতা, পিতার পিতা এবং ইত্যাদি বংশধরের অন্তর্গত। এভাবে, একজন ব্যক্তি, তার বোন এবং ভাইয়ের, তার ভাইয়ের সন্তান (কিন্তু তার বোনের সন্তান নয়), তার নিজের সন্তান এবং ছেলের সন্তান (কিন্তু তার মেয়ের সন্তান নয়) সকলে একই দলের অন্তর্ভুক্ত। পিতৃসূত্রীয় সমাজে পিতা এবং স্বামী (গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো পুরুষ) আত্মীয় ব্যবস্থাকে কর্তৃত এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। মাতৃসূত্রীয় সমাজের আত্মীয় ব্যবস্থায় একজন নারীর ভাইকে তার স্বামীর পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সন্তানদের মায়ের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত করে, পিতার নয়। এভাবে, একটি মাতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য হলো একজন মহিলা, তার ভাই এবং বোনের, তার বোনের (কিন্তু তার ভাইয়ের নয়) সন্তান, তার নিজের সন্তান এবং তার মেয়ের সন্তান (কিন্তু তার ছেলের নয়) (Nanda and Warms, 1997: 182)।

এছাড়া বংশধারা বলতে পিতামাতা ও তাদের কোনো একজন বা উভয়ের আত্মায়দের সঙ্গে সন্তান-সন্তানের সম্পর্কের ধরন এবং তাকে চিহ্নিত করার নীতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃতিভোদে তিনি ধরনের বংশধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। যেমন- ১। একপার্শ্বিক (Unilineal) ২। দ্বি-পার্শ্বিক (Bilateral) ৩। উভপার্শ্বিয় (Ambilineal)। একপার্শ্বিক নীতির ক্ষেত্রে পিতা বা মাতা যে কোনো একজনের দিকের আত্মায়দের বিবেচনা করা হয়। আবার যেখানে উভয়দিকের আত্মায়দের বিবেচনা করা হয় তা হল দ্বি-পার্শ্বিক। উভপার্শ্বিয় বংশধারা নীতির ক্ষেত্রে কোনো সন্তান পিতা বা মাতা উভয় দিকেরই বিবেচনা করতে পারে। তবে একই সাথে দুদিকের নয় (বন্দেয়াপাধ্যায়, ২০১৩ : ১৩৭)। ন্যূবিজ্ঞানী Fox (1967), Harris (1975), Barnouw (1982)-এর গবেষণার আলোকে বলা যায়, সংস্কৃতিভোদে তিনি ধরনের বংশধারা বিবরজনান রয়েছে। যেমন- ১। একরৈখিক বংশধারা ২। দ্বৈত একরৈখিক বংশধারা ৩। অন-একরৈখিক বংশধারা। একরৈখিক বংশধারা আবার দুই প্রকার। যথা-ক। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা, খ। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা। অন-একরৈখিক বংশধারা আবার দুই প্রকার-ক। আনুমানিক, খ। দ্বিপার্শ্বিক।

ছক ৩: বংশধারার ধরন



(উৎস: Fox, 1967; Harris, 1975; Barnouw, 1982 দের গবেষণা থেকে পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত)

বংশধারা যখন একটি লিঙ্গীয় ধারার উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, অন্যটির উপর নয়, তখন তাকে একরৈখিক বংশধারা বলে। এক রৈখিক বংশধারা দুই প্রকার, যথা-ক। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা, খ। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা। পিতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো পূর্বপুরুষের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ণয় করা। যেমন-বাবা, বাবার বাবা, বাবার বাবা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, একটি পিতৃসূত্রীয় বংশের সবাই একই পূর্বপুরুষের বংশধর। যে সংস্কৃতিতে কর্তৃত এবং সম্পত্তি পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা সমাজের মূলনীতি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এমন কিছু বংশীয় ধারা আফ্রিকার বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিদ্যমান আছে, যেখানে শুধু সমাজ নয়, রাজনৈতিক সংগঠনও বংশধারা অনুসারে গঠিত। উল্লেখ্য, এখানে চিফ বা দলনেতা অনুপস্থিত (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৬০)। ন্যুজিঞ্জানী Evans- Pritchard (1940) এ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনকে নামকরণ করেছেন খণ্ডিত গোষ্ঠী সংগঠন। ন্যুজিঞ্জানীদের মতে, বংশধারার ভিত্তিতে সামাজিক সংহতি এবং আনুগত্য সংগঠিত হয়ে থাকে। এটা প্রকাশিত হয় সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং শক্তিদের মোকাবিলা করার সময়। তাহলে বলা যায়, বংশধারা হলো একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদ। এ প্রক্ষিতে নাইজেরিয়ার টিভি জাতির মধ্যে বিদ্যমান পিতৃসূত্রীয় বংশধারা কথা উল্লেখ করা যায় (উদ্বৃত্ত, আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৬২)। গবেষণায় দেখা যায় বেশির ভাগ সমাজে পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান। শিকার সংঘাতক সমাজ থেকে উন্নত সমাজে এই পিতৃসূত্রীয় ধারা দেখতে পাওয়া যায়। Victor Barnouw (1982) উল্লেখ করেছেন, দক্ষিণের কিছু সমাজ বাদ দিলে গোটা ভারতে পিতৃসূত্রীয় ধারা বিবাজমান। এবং আমেরিকান ইডিয়ান সিওয়ানরা এই নীতির আওতাভুক্ত। এছাড়া পূর্ব আফ্রিকার অনেক উপজাতি, ভারতের নাগা এবং নিউগিনির উপজাতিদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয় প্রথা বিদ্যমান (উদ্বৃত্ত, রহমান, ১৯৮৮:৩১৬)।

মাতৃসূত্রীয় বংশধারা হলো যারা একই নারীর বংশধর থেকে এসেছে। এই ব্যবস্থায় সন্তানদের মায়ের ভাইয়ের (মামা) দলে বিবেচনা করা হয়। কারণ মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা এবং মর্যাদা পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। তবে তা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, নারী বংশধরদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। মাতৃসূত্রীয় বংশধারা কিন্তু মাতৃতত্ত্ব নয়; কারণ এই ব্যবস্থায় পুরুষের আধিপত্য রয়েছে। পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও বংশধারার সদস্য পদ অথবা সম্পত্তি পুরুষ ধারায় নির্ধারিত হয় না। এই ধারায় একজন পুরুষ সম্পত্তি পায় তার মায়ের ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং তার সন্তানরা পায় তার ভ্রীর ভাইয়ের কাছ থেকে। আর এ কারণেই ন্যুজিঞ্জানীরা

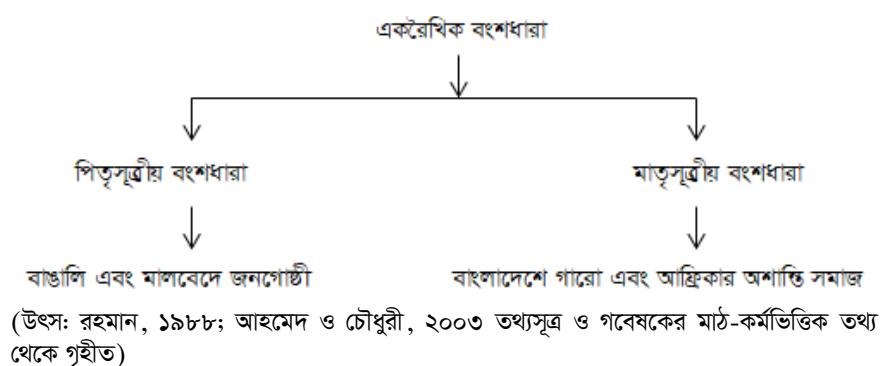
১. সুদানের নুয়েরদের ট্রাইব হিসেবে কোনো কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন নেই। গোষ্ঠী বা বংশগুলো এক একটি রাজনৈতিক একক যার ভিত্তি জাতিসম্পর্ক। নুয়েরদের মধ্যে একেসূত্রীয় বংশধারা বিদ্যমান যা মূলত অংশিত বা খণ্ডিত। খণ্ডিত বা অংশিত গোষ্ঠী ব্যবস্থা (segmentary lineage system) হচ্ছে গোত্রের মধ্যকার আরও ক্ষুদ্রতর বিভাজন। যেমন: নুয়েরদের মধ্যে ২০টির মতো গোত্র রয়েছে যার প্রত্যেকটি একাধিক গোষ্ঠীতে বিভাজিত। গোত্রে প্রথম ভাগকে ম্যাঞ্চিমাল গোষ্ঠী বলা হয়। এছাড়া পর্যাক্রমে রয়েছে মেজর গোষ্ঠী, মাইনর গোষ্ঠী এবং মিনিমাল গোষ্ঠী। যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর কোনো সদস্যের বিবাদ বাধে তাহলে প্রত্যেক গোষ্ঠীও এই বিবাদে সামিল হবে। অংশিত গোষ্ঠী সংগঠনে অভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একজন নাবালক সাবালক হয় এবং যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। যোদ্ধা যদি পরাজিত হয় তাহলে সমাজে সে নিচু হয়ে যায় এবং পুরুষত্বের অবসান ঘটে। কিন্তু যদের জয়ী হলে বাবার সম্পদের উত্তরাধিকার এবং মর্যাদা লাভ করে (Evans- Pritchard, 1940)।

একে মাত্তত্ব না বলে, ভাই অধিকার নামকরণ করেছেন। ভারতের কেরালা রাজ্যের নায়ারদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় বৎশধারা বিদ্যমান (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩ : ৬৩)। এদিকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার গরোদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় বৎশধারা বিদ্যমান। এছাড়া আমেরিকান ইঙ্গিয়ানদের নাভাহো, হপি, জুনি, ক্রো, ইরোকুয়া এবং হায়দা জনগোষ্ঠীতে মাতৃসূত্রীয় বৎশধারা বিদ্যমান। দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের টিয়ার, নায়ার ও মাপিলাদের মধ্যে মাতৃসূত্রীয় প্রথা বিরাজমান রয়েছে। আবার আফ্রিকার অশান্তি, টোংগো, বেমবা এবং ইন্দোনেশিয়ার মিনাং কাবাওদের মধ্যেও মাতৃসূত্রীয় বৎশধারা প্রচলিত (রহমান, ১৯৮৮:৩১৭)।

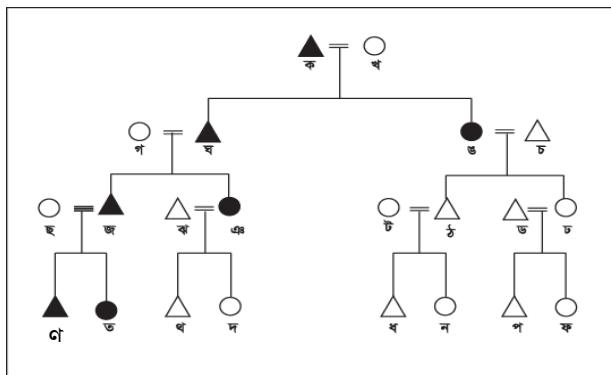
পৃথিবীর সকল সমাজে বৎশধারা পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয়ভাবে নির্ণয় করা হয় না। কিছু সমাজে দুটি একরৈখিক বৎশধারা নীতি বিদ্যমান। এ ধরনের নীতিমালাকে দ্বৈত একরৈখিক বৎশধারা বলে। একরৈখিক এবং দ্বৈত একরৈখিক বৎশধারা নীতি বাদে কিছু সমাজে আরেক ধরনের বৎশধারা নীতি দেখতে পাওয়া যায় তাকে অন-একরৈখিক বৎশধারা বলে। অন-একরৈখিক বৎশধারা আবার দুই ধরনের। যেমন-ক। আনুষঙ্গিক খ। দ্বিপাক্ষিক। আনুষঙ্গিক বৎশধারা বলতে বোঝায় এমন গোষ্ঠী যাদের বংশীয় পরিচয় সমানভাবে পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে সংগঠিত হয় কিংবা দুটোর সংমিশ্রণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য আনুষঙ্গিক বৎশধারার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিপাক্ষিক বৎশধারায় একজন ব্যক্তির (নারী বা পুরুষ) বৎশ-সূত্রিতা, সকল পূর্বসূরি নারী এবং পুরুষ আত্মায়ের সাহায্যে নির্ধারিত হয় (আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩:৫৮)।

মালবেদে জনগোষ্ঠীতে পিতৃসূত্রীয় বৎশধারা প্রচলিত যা একরৈখিক বৎশধারা ব্যবস্থা। পিতার পদবি পুত্রের উপর বর্তায় এবং বৎশধারা পিতার দিক থেকে নির্ণয় হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেন এবং কন্যা বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। পিতা হলো পরিবারের প্রধান। তবে পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত নারী-পুরুষ উভয়ে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করেন।

ছক ৪: মালবেদে জনগোষ্ঠীর একরৈখিক বৎশধারা ব্যবস্থা



ছক ৫: মালবেদে জনগোষ্ঠীর পিতৃসূত্রীয় বংশধারা



উৎস: গবেষকের মাঠকর্মের তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রনীত (মাঠকর্ম, ২০২০-২২)

ছক ৫-এর মধ্যে দেখা যায়, ঘ এবং খ নম্বর ব্যক্তি যারা ক এবং খ নম্বর এর সন্তান, তাঁরা তাঁদের পিতার বংশের সদস্য (কালো ভরাট চিহ্ন)। পরবর্তী প্রজন্মে গ এবং ঘ নম্বরের সন্তান ভরাট চিহ্নিত বংশের সদস্য, যেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষ নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে, যিনি ভরাট চিহ্নিত দলের সদস্য। তবে গ এবং চ নম্বরের সন্তানেরা এই পিতৃবংশের সদস্য নয়। যেহেতু তাঁদের বংশ-পরিচয় নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের পিতার মাধ্যমে এবং যিনি এ বংশের নয়। অর্থাৎ যদিও ঠ এবং ঢ-এর মা এই ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের সদস্য, কিন্তু স্বামী (চ নম্বর) এই পিতৃবংশের সদস্য না হওয়াতে তিনি তাঁর বংশ-পরিচয় গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের সন্তানরা (ঠ এবং ঢ) তাঁদের পিতার বংশের সদস্য। চতুর্থ প্রজন্মে কেবল ণ এবং ত হচ্ছে ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের সদস্য যেহেতু তাঁদের পিতা ভরাট চিহ্নিত পিতৃবংশের পূর্ব প্রজন্মের একমাত্র পুরুষ সদস্য। তাহলে এই ছকে ক, ঘ, ণ, জ, এও, ণ এবং ত পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য, অপর সকল সদস্য অন্য পিতৃসূত্রীয় বংশের সদস্য।

গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অতীতকাল থেকে মালবেদে সমাজে বংশের উত্তরাধিকার, মর্যাদা ও পদবি পিতা থেকে সন্তানের নিকট স্থানান্তরিত হয়। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় একমাত্র পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তান পিতার কোন সম্পত্তি পায় না। তবে পিতা যদি জীবিত অবস্থায় তার কন্যাকে সম্পত্তি লিখে দেয়, তাহলে সে সম্পত্তি পায়। সাধারণত পিতা তার কন্যাকে সম্পত্তি লিখে দেয় না। আবার পিতার মৃত্যুর পর ভাইরা যদি দয়া করে সম্পত্তি প্রদান করে তাহলে বোন তার পিতার সম্পত্তি পায়। তবে পিতার সম্পত্তি বেদে সমাজে কন্যা দাবী করতে পারেনা। অতীতে বেদেরা যখন নৌকায় বসবাস করতো তখন তাঁদের কোন জমি ছিল না। সম্পত্তি বলতে যা ছিল তা হলো নগদ কিছু টাকা, স্বর্ণ, নৌকা, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি। পিতা মারা গেলে তার ছেলে সন্তানরা উত্তরাধিকারসূত্রে উল্লেখিত সম্পত্তি ভোগ দখল করে। এক্ষেত্রে কন্যা সন্তান পিতার কোন সম্পত্তি ভোগ করতে পারে না। বাবা মারা গেলে অভিভাবক হয় পরিবারের বড় সন্তান। তবে সম্পত্তি বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত আচারে খরচ নির্বাহের পর যা থাকে প্রত্যেক ভাই নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। উল্লেখ্য যে মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে কণে পন এখা বিদ্যমান আছে। আর কণে পন পায় কন্যার বাবা। আর বাবা না থাকলে কণে পন কন্যার ভাইয়েরা পায়। আবার বর্তমানে জমি ক্রয় করে ডাঙায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে বাবার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেরা পায়। কন্যা সন্তান কোন জমি পায় না। অর্থাৎ অতীত-বর্তমান কোন সময়ই কন্যা সন্তান তাঁর বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে না। এছাড়া মালবেদে সমাজে সর্দারের

ছেলে সর্দার হয়। সর্দারের ছেলে না থাকলে তার ভাইয়ের ছেলে সর্দার হয়। মেয়েরা কোন সময় সর্দার হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, গবেষিত মালবেদে জনগোষ্ঠী অতীতে যখন নৌকায় বসবাস করতো, তখন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত ছিল। আর বর্তমানে নৌকা ত্যাগ করে ডাঙ্গায় বসবাস শুরু করার পর থেকে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, অতীতে প্রথাগত পেশার প্রয়োজনে তারা দলবেধে বংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো। আর এই প্রথাগত পেশার কোশল তারা নিকট জ্ঞাতি ও নিজ বংশ থেকে শিখে থাকে। মজার বিষয় হলো, এ সময় তারা বিশেষ করে নিকট আত্মীয়রা একসাথে পাশাপাশি নৌকায় বসবাস করতো। এবং বিপদ-আপদ হলে একে অন্যকে টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা টাকা-পয়সা খণ্ড হিসেবে দিতো। তবে খণ্ডের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে দিতো। কিন্তু কেউ যদি খণ্ড গ্রহণ করে মারা যায়, তাহলে তার ছেলেরা খণ্ডের টাকা পরিশোধ করে দেয়। আর যদি একাত্তই খণ্ডের টাকা পরিশোধ না পারে; তাহলে মাপ করে দেয়। আর বর্তমানে ডাঙ্গায় বসবাস করার পর পরিবর্তিত পেশার প্রয়োজনে তাদের অধিকাংশই ব্যঙ্গিগতভাবে ঘুরে বেড়ায়। এবং তাদের মধ্যে দলগত চেতনার পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে বিকাশ ঘটেছে। ফলে বেশির ভাগ পরিবার তাদের ছেলে-মেয়ে ও সৎসার নিয়ে ব্যস্ত। তারপরও বর্তমানে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট আছে। কিন্তু অতীতের মতো মজবুত নয়। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় অতীতে তাদের কোন জমি না থাকায় ব্যাংক তাদের খণ্ড দিতো না। ফলে ধার নেওয়ার একমাত্র অবলম্বন ছিল নিকট আত্মীয়। আর বর্তমানে ডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার কারণে তারা ব্যাংক থেকে খণ্ড গ্রহণ করতে করেন। ফলে অতীতের মতো অসুখ-বিসুখে সব সময় আত্মীয়ের স্মরণাপন্ন না হয়ে ব্যাংকে জমি বন্ধক রেখে খণ্ড গ্রহণ করেন। এছাড়া বর্তমানে তারা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে খণ্ড গ্রহণ করতে অস্বস্তিবোধ করে। কারণ সমাজ এটাকে ভালো চোখে দেখে না এবং অনেক সময় লজ্জা দেয়। এই জন্য তারা খণ্ড সহজে নিতে চায় না। মাঠকর্মের সময় আদিল নামে একজন তথ্যদাতা বলেন, অতীতে ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন বিপদে-আপদে ঝাপিয়ে পড়তো, কিন্তু বর্তমানে ১০০ জনের মধ্যে ২০ জন এগিয়ে আসে। অতীতে নিকট আত্মীয়ের কারণ সাথে অন্য বংশের ঝগড়া-বিবাদ হলে ন্যায়-অন্যায়ের কথা চিন্তা না করে এগিয়ে আসতো। কিন্তু বর্তমানে নিকট আত্মীয়ের কেউ অন্যায় করলে বিচার বিশ্লেষণ করে পক্ষ অবলম্বন করে থাকে।

মাঠকর্ম তথ্য মতে, বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর কেউ তার জমি বিক্রি করতে চাইলে প্রথমে তার বংশের নিকট জ্ঞাতির কাছে অনুমতি বা জিজ্ঞাস করতে হয়। যেমন : আপনি আমার এই জমি ক্রয় করবেন? তিনি ক্রয় করতে অস্বীকার করলে; তখন বংশের বাইরের কারো কাছে বিক্রি করা যায়। তবে এ সম্পর্কে নজরুল বেদে বলেন, অনেক সময় নিকট জ্ঞাতি নয়, প্রথমে পার্শ্ববর্তী জমির মালিককে জমি বিক্রি করার সময় জিজ্ঞাস করতে হয়। তিনি মনে করেন, যদিও তিনি নিকট জ্ঞাতি নয়, তারপরও পাশের জমির মালিককে জিজ্ঞাস করা একটা নেতৃত্ব। কারণ নিকট জ্ঞাতির কাছে জমি বিক্রি করলে সে যদি মানবিক মানুষ না হয়; তাহলে পাশের জমির মালিকের বসবাস করা সমস্যা হবে। তবে জমি ক্রয় করার প্রথম অধিকার নিকট জ্ঞাতির। অতীতে মালবেদেরা নৌকা তৈরি, প্রথাগত পেশার উপকরণ, চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণোজনীয় দ্রব্যসমগ্রী ক্রয় করতে টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে নিকট জ্ঞাতি বা নিজ বংশের লোকজনের কাছ থেকে খণ্ড গ্রহণ করতো। বর্তমানেও তাদের পরিবর্তিত অনানুষ্ঠানিক পেশার প্রয়োজনে নিকট জ্ঞাতি বা বংশের লোকজনের কাছ থেকে খণ্ড গ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে দেখা যায় তারা নিকট জ্ঞাতির পাশাপাশি ব্যাংক অথবা মহাজনের কাছ থেকে খণ্ড গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, গবেষিত জনগোষ্ঠীর সেলুনের দোকান,

খাবারের দোকান, মুদি দোকান থেকে নিকট জ্ঞাতিরা সেবা গ্রহণ করেন। তবে অন্য বংশের দোকানে ভালো মানের পণ্য সুলভ মূল্যে পাওয়া গেলে সেখান থেকেও দ্রব্য করেন। আবার অনুসন্ধানে দেখা যায়, মালবেদে জনগোষ্ঠীতে যে বংশের লোকসংখ্যা ও সম্পত্তি বেশি; সেই বংশের প্রভাব ও মর্যাদা সমাজে বেশি থাকে। ফলে স্থানীয় নির্বাচনে তাদের বংশ থেকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন: আদিল মেম্বর (সর্দার বংশ), নজরুল মেম্বর (খান বংশ) ও জাহানারা মেম্বর (সর্দার বংশ)। এছাড়া কেউ মৃত্যু বরণ করলে নিকট জ্ঞাতি বা নিজ বংশের লোকের কাছাকাছি কবর দেওয়ার রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মতো মালবেদে সমাজেও বিচার-সালিশে স্বজনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কোন সর্দারের নিকট আত্মীয় অথবা বংশের কেউ অপরাধ করলে সালিশে তিনি পক্ষপাত আচরণ করেন। সর্দার অনেক সময় তার আত্মীয়কে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে গুরু দণ্ড না দিয়ে লঘু দণ্ড দিয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ সময় সর্দার সালিশে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন।

উপসংহার

মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বংশধারা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। গবেষিত জনগোষ্ঠীতে বৃহত্তর সমাজের ন্যায় জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদে নিকট জ্ঞাতিরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষরাও সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীতে রক্ত (দাদা, চাচা, বাবা তার সন্তান, চাচাতো ভাই-বোন, ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি), বৈবাহিক (স্বামী, নন্দ, দেবর, ভাসুর, স্ত্রী, শালা, শালি, শঙ্গর, শাশুড়ি ইত্যাদি) ও কাল্পনিক বা প্রথাগত (ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাপ, সেই, বন্ধু ইত্যাদি) জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতো মালবেদেদের মধ্যে বর্ণনামূলক পদাবলি ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পদ দ্বারা সম্বোধন করা হয়। যেমন-বাবা, মা, চাচা, চাচি, খালা, খালু, মামা, মামি, চাচাতো ভাই-বোন, মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন, ফুফাতো ভাই-বোন ইত্যাদি। এছাড়া দেখা যায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে একারেখিক বংশধারা তথা পিতৃসূত্রীয় বংশধারা বিরাজমান। যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশধারা ও মর্যাদা পিতা থেকে সন্তানের ওপর স্থানান্তরিত হয়। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার একমাত্র পুত্র সন্তান। এখানে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জ্ঞাতিসম্পর্কের পাশাপাশি মালবেদে জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত মানসিকতা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে বলা যায় দারিদ্র, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তি স্থান্ত্র্যবোধ, তিকে থাকার প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে মালবেদে জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিসম্পর্কে অনেক সময় শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

গৃহপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

- Barnouw, V. (1982). *An Introduction to Anthropology*. Ethnology. Homewood: Dorsey Press.
- Crapo, R. H. (2002). *Cultural Anthropology*; McGraw Hill; Boston.
- Evans-Pritchard, E.E (1940). *The Nuer: a description of the model of livelihood and political institutes of a Nilotic people*. Oxford: At the clarendon press.
- Fox, R. (1967). *Kinship and Marriage*, London: Penguin.

- Fried, M. H. (1967). *The Evolution of Political Society*. New York: Random House.
- Harris, M. (1975). *Culture, Man and Nature: An Introduction to General Anthropology*; 2nd edition New York.
- Haviland, W.A. (2018). *Cultural Anthropology* (Nineteenth edition). Harcourt Brace College publishers, New York.
- James Birx H. (2010). 21st Century Anthropology. A Reference Handbook. Publisher SAGE Publications, Inc.
- Karim, A.H.M. Z. (1990). *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society*. New Delhi: Northern Book Centre, India.
- Kottak, C.P. (2004). *Cultural Anthropology* (Tenth edition). The McGraw-Hill companies, Inc. New York.
- Levi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. London: Tavistock.
- Majumder, D.N. and T.N. Madan (1995). *An Introduction to Social Anthropology*; Asia Publishing House; Bombay.
- Miller, Barbara D. (2007). *Cultural Anthropology*. (4th edition). Pearson/ Allyn and Bacon, New Jersey, U.S.A.
- Morgan, L.H. (1885) (1871). *Ancient Society*: Researches in the line of human progress from savagery, through barbarism to civilization. Foreword by Elizabeth Tooker. Tucson University of Arizona Press.
- Murdock, G. P. (1949). *Social Structure*, New York: Mccmillan.
- Nanda, S.; Warms, L.R. (1997). *Cultural Anthropology* (Sixth edition). West/Wadsworth publishing company. New York.
- Radcliffe Brown, A.R. (1964). *Structure and Function in Primitive Society*. London: Cohen and West.
- Wise, J. (1883). *Notes On the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal*, London, Harrison & Sons.
- আহমেদ, রেহনুমা ও চৌধুরী, মানস (২০০৩)। নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ : সমাজ ও সংস্কৃতি। একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।
- কাজল , আনোয়ার (২০২১)। একুশে টিভি.কম।
- খান, জয়নাল আবেদীন (২০১১ক)। বেদে, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৯ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান (২০১৩)। সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, পারম্পর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিত্তামণি দাস লেন, কলকাতা।
- বাংলাপিডিয়া (২০১৫)। বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ।
<https://bn.banglapedia.org/index.php/>
- রহমান, কাজী মিজানুর (২০১৪)। মুপ্পগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ধারা : একটি ন্যৈজ্ঞানিক গবেষণা. সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
- রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৮৮)। সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি। হাসান বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০২১)। আগারগাঁও, তালতলা। <http://www.dss.gov.bd>.

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আগিলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধ: গণহত্যা ও গণকবর
(Agailjhara in the Liberation War: Genocide and Mass Graves in
Eyewitness Accounts)

ড. কালিদাস ভক্ত*

Abstract

The history of Bangladesh's great liberation war is as much about sacrifice as it is about glory. The immense courage of Bengalis has played a key role in making this history. Every conscious man wants to know his own historical heritage. These issues include personal identity, social traditions, and personal legends. Agailjhara is an upazila located in remote areas of Barishal district. A quiet village surrounded by nature's greenery. Due to geographical, social and communal reasons, firebombing, genocide, disappearances, torture and snatching of women took place in Agailjhara during the Great War of Liberation. As far as I know, no significant research work has been completed on the context of the Liberation War of this region. However, at present, people are talking about the 13 most brutal genocide by the Pak intruding forces in this region. 7 mass graves remind the brutality of Pakistani forces. At the same time, hundreds of freedom fighters of Agailjhara fought bravely to face the Pakistani intruders and upheld the honor of the motherland. It is important to bring that glorious story to future generations. Today is the 53rd year of independence of Bangladesh. Even after so many years of independence, it was not possible to present the true history of the Liberation War to the new generation. Research on Agailjhara's genocide and mass graves is an important issue in writing a correct and complete history of Bangladesh's Liberation War.

ভূমিকা

যেকোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক তাজা প্রাণ আত্মাহতি দিতে হয়। অনেক ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে হয়। সেক্ষেত্রে আগিলঝাড়াবাসীকেও মর্মান্তিক ও করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় হত্যা-নির্যাতনের মাত্রা ছিল ব্যাপক। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বিলে মায়ের কোলে থাকা বারো দিনের শিশু অস্ফুতকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুটের তলায় পিঘে যেতে দেখা যায়। কোদালধোয়ায় মানুষের

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: kalidasbhakta@du.ac.bd

বিনোদনের জন্য আসা সার্কাস পার্টির হাতি, বাঘসহ অনেক বন্য প্রাণিও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুলেটের শিকার হয়। পাক-আর্মিদের মাটিতে ঠেকে যাওয়া স্পিডবোট উদ্বারের নামে রাজিহারের প্রিস্টান পাড়ার নয় জন প্রিস্টানকে মিথ্যা বলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পতিহারে গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে থেয়ে দৌড় দিতে বলে পরবর্তীতে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করে। এরকম করুণ মৃত্যু আগেলবাড়ায় অনেক ঘটেছে। পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে বেশ কয়েকটি স্থানে গণহত্যা চালিয়েছে। সম্প্রতি সাতটি গণকবর চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আগেলবাড়ার এসকল গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবলী এখন পর্যন্ত স্থান পায়নি। বিষয়গুলো লোক-মুখেই আলোচিত হয়ে আসছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আগেলবাড়ায় যে সকল গণহত্যা ঘটেছে এবং যে কয়টি গণকবর চিহ্নিত হয়েছে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিপূর্ণতা প্রদানে এই বিষয়টি যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করবে।

সাহিত্য বিষয়ক পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু গুরু ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ, একাড়মের ৭১, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বারিশাল জেলা, কেতনার বিল গণহত্যা, কাঠিরা গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রভৃতি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলোতে গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কিত ইতিহাস বিস্তারিতভাবে স্থান পায়নি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস অনুৎসাহিত রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত বিষয়ে নতুন গবেষণা কর্মের সুযোগ ও যুক্তি রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রসঙ্গটি বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। গণহত্যা প্রসঙ্গটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্যও নানাধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার সঠিক চিত্রাখণ্ড পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়নি। বিশেষ করে আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল এবং যে গণকবরগুলো দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণাকার্যটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- ক) আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার বিষয়টিউপস্থাপন করা।
- খ) গণকবরের সঠিক চিত্র তুলে ধরা।
- গ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গঠনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরপ্রতি বার্তা দেওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চের কমিশনের অর্থায়নে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অত্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইতোমধ্যে যে সমস্ত গুরু লিখিত হয়েছে এবং সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগতিনির্ধারণ ও সাধারণ জনগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের লিখিত ও সাংখ্যিক মান ব্যবহার করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে সব স্থানে গণহত্যা হয়েছে, পরে গণকবর দেওয়া হয়েছে সেসকল বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। চিহ্নিত গণকবরগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পূর্ব প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা অনুসরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজের বয়োজ্যেষ্ট

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিশিষ্ট ইতিহাসবেতো ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চায় বিদ্বন্ধ পণ্ডিতদের সাথে আনুষ্ঠানিক ওঅনানুষ্ঠানিক আলোচনা করা হয়েছে। এসকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

আগেলবাড়ার ভৌগোলিক বিবরণ ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

আগেলবাড়া উপজেলা বরিশাল জেলার অঙ্গর্গত। উত্তরে গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলা, পূর্বে গৌরনদী ও উজিরপুর, দক্ষিণে উজিরপুর এবং পশ্চিমে কোটলীপাড়া উপজেলা। ১৯৮১ সালে ১৬ জন গৌরনদী থানা থেকে বিভক্ত হয়ে আগেলবাড়া থানা গঠিত হয়। সে হিসেবে গৌরনদীর ইতিহাস ও আগেলবাড়ার ইতিহাস একই রকম। গৌরনদী সর্ব প্রথমে ঢাকা জেলার অঙ্গর্গত ছিল। ১৮০৬ সালে ঢাকা জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে বাকেরগঞ্জ জেলার সাথে যুক্ত হয়। আগেলবাড়া ১৯৮৩ সালে ৭ নভেম্বর ৫টি ইউনিয়ন, ৭৮টি মৌজা, ৯৬টি গ্রাম নিয়ে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। গৌরনদী ও আগেলবাড়া উপজেলা নিয়ে বর্তমান বরিশাল-১ সংসদীয় আসন গঠিত। নদ-নদী, খাল-বিলসহ প্রকৃতির সবুজ-শ্যামলে আচ্ছাদিত এলাকা হিসেবে উপজেলাটি পরিচিত। দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত নদী আধার মানিকের শাখা সন্ধ্য নদী আগেলবাড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপজেলার আয়তন ১৫৫.৪৭ বর্গকিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠে ২২.৫৪% থেকে ২৩.০০% উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯০.০৩ থেকে ৯০.১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আগেলবাড়ার অবস্থান।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ থেকেই আগেলবাড়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তাল ছিল। উচ্চ পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। এজন্য আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বৃটিশ আমল থেকে অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব গৈলা নিবাসী বিল্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষ বসুর অনুসারী। দেশ মাতৃকার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে ১৯৩১ সালে বৃটিশদের আক্রমেশের শিকার হন। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের হিজলী জেলে বন্দী করা হয়। খুব তাড়াতাড়িই তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। অদ্যেষ্টের নির্মম পরিহাসে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে ইংরেজ অফিসারের নির্দেশে তাঁর উপর হিংস্র প্রহরী দলকে লেলিয়ে দেওয়া হলো। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন বিল্লবী তারকেশ্বর। তাঁর মৃত্যুর পর ২৪ অক্টোবর চিতা ভূমি সমাহিতকরণের জন্য গৈলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন সর্বত্যাগী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু। এভাবে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুজ্বলন্ট নির্বাচন, ৬২'র ছাত্র আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ৭০'র সাধারণ নির্বাচন, ৭১'র মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগেলবাড়ার জনমানুষের অবদান রয়েছে। দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত হেমায়েত বাহিনী ১৯৭১ সালে ১৫মে অত্র উপজেলার আন্তি বাট্ট্রা গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গঠিত হয়। এখানে এলাকার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এ বাস্তীর নেতৃত্বে ছিলেন-

হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম, আসমত আলী খান এমপিএ, হরনাথ বাইন এমপিএ, শহীদ আব্দুর রব সেরানিয়াবাত এমএনএ প্রমুখ। সদস্য ছিলেন উপজেলার আলতাব হোসেন, (পিতা - মকবুল হোসেন, মধ্য শিহিপাশা), মো. হোসেন মিয়া, (পিতা - সফিজ উদ্দিন মিয়া, বাকাল), কাজী ইলিয়াস হোসেন, (পিতা - কাজী আবদুল হাই, ভালুকশী) সেকেন্দার আলী তালুকদার, (পিতা - আলী তালুকদার, বাদুরতলা) বিশ্বনাথ মল্লিক, (পিতা - অশ্বিনী কুমার মল্লিক, বাকাল), এম এ হক, (পিতা - আবদুস সাতার, ফুলশ্রী), কাজী সাইফুল ইসলাম, (পিতা - কাজী আ. কাদের, ভালুকশী),

গোলাম মোস্তফা সরদার, (পিতা - আলহাজ্বি সুলতান মাহমুদ সরদার, নগরবাড়ি), কাজী বদিউজ্জামান, (পিতা - কাজী আবদুল হাই, ভালুকশী), কাজী আকরাম হোসেন, (পিতা - কাজী মুজাফফর হোসেন, ভালুকশী), মো. আবদুল খালেক পাইক, (পিতা - মো. আজাহার আলী পাইক, ফুলশ্রী) প্রমুখ ব্যক্তিগত।

এছাড়া আগেলবাড়ির রাজনৈতিক অঙ্গন যাদের পদচারণায় সর্বদাই ঝান্দি হয়েছে, তাঁরা হলেন- মহাআ অশ্বিনী কুমার দত্ত, যোগেন্দ্র নাথ মঙ্গল, মাওলানা আবুল কাসেম, শহীদ আব্দুর রব সেরিনিয়াবাত, সুনীল গুপ্ত, আলহাজ্বি আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ ও এড. তালুকদার মোঃ ইউনুস প্রমুখ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও আগেলবাড়িবাসীর প্রস্তুতি

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর আগেলবাড়িবাসী মহান মুক্তিযুদ্ধের অশ্বিমত্রে দীক্ষিত হন। কেননা বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণে ছিল এক সঙ্গীবন্ধী শক্তি। প্রিয় নেতার আহ্বানে দেশমাত্কার জন্য কিছু করতে হবে তাই সচেতন জনতা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাঁরা মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট আত্মীয় কৃষকনেতা শহীদ আব্দুর রব সেরিনিয়াবাতের নেতৃত্বে 'মুক্তিসেনা দল' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন- মতিউর রহমান তালুকদার (সুজন কাঠি), মিহির দাস গুপ্ত (গৈলা), আইয়ুব আলী মিয়া (মাঞ্জরা), ফজলু ভূইয়া (বাশাইল), কাজী শাহ্ আলম (ভালুকশী) প্রমুখ। এই নেতৃবন্দ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আগেলবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় জনমত গড়ে তোলেন। তাঁরা বিশেষ করে যুবক ও তরঙ্গদের সংগঠিত করতে থাকেন যুদ্ধের ট্রেনিং এবং কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা মিলিত হয়ে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প ও হাসপাতাল গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- (ক) বাগধা ইউনিয়নে আশকর গ্রামে বৃন্দারাম মহেরের বাড়ি ও কৃষওকান্ত অধিকারীর বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। (খ) রাজিহার ইউনিয়নে বাশাইল গ্রামে দিজেন ঘটের বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প (অস্থায়ী) ও বাশাইল হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। (গ) বাকাল ইউনিয়নে কোদালধোয়া গ্রামে হালদার বাড়িতে ও পাকুরিতা গ্রামে বিশ্বাস বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। (ঘ) রত্নপুর ইউনিয়নে বারো হাজার গ্রামে আকেল ভূইয়ার বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় আগেলবাড়িয়ে দুইটি অস্থায়ী হাসপাতাল গঠিত হয়। (ক) পয়সার হাটে মুক্তিযুদ্ধ হাসপাতাল (অস্থায়ী) (খ) আশকর গ্রামে ঠাণ্ডারাম বৈরাগীর বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ হাসপাতাল।

২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইট ও আগেলবাড়ির মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, পুরাণ ঢাকার হিন্দু অধ্যাষ্ঠিত এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ বেশ কয়েকটি স্থানে হামলা চালায়। বিশেষ করে জগন্নাথ হলের গগহত্যার চিত্র ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদ্যারী। এখানে রাত ৯.৩০ টা থেকে আরম্ভ করে সারা রাত ভর মানুষ ধরে এনে তাঁদের দিয়ে কবর খুঁড়ে সারিবন্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ত্রাশফায়ারে হত্যা করে। এ সমস্ত খবর প্রথমে ২৬ তারিখ খুব সকাল থেকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমে (বিবিসি, ভয়েজ অফ আমেরিকা, আকাশ বানী বেতার) গ্রামে-গঞ্জে পৌছার পর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। বাঙালি জাতি বারংদের আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো গর্জে ওঠে। সেই সাথে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে ধানমণির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। এতে করে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের মতো আগেলবাড়ির মানুষও সেদিন যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৬ মার্চ গৈলা হাই স্কুল মাঠে

বিভিন্ন গ্রামের যুবক ও তরংণদের নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন অত্র স্থলের শিক্ষক মোসলেম মাস্টার, সিপাহি আলাউদ্দিন, আনসার কমান্ডার সেকেন্ডার শাহ প্রমুখ। এছাড়া ডেগাই হালদার পাবলিক একাডেমি মাঠে প্রশিক্ষণ দেন আব্দুল খালেক পাইক ও নজরালী ফকির। তবে পরে নজরালী ফকির শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। গৌরনদী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে আগৈলবাড়ার অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। তখন কয়েক হাজার তরংণ ও যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২৫ এপ্রিল পাকসেনারা বৃহত্তর বারিশাল অঞ্চলে চুক্তে চেষ্টা করে। গৌরনদী উপজেলার কটকছলের মহাসড়কের কাছে আধুনিক অন্তর্শস্ত্রে সজ্জিত পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার দুর্বার মানসিকতায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আধুনিক অঙ্গ-শস্ত্রের কাছে তাঁরা হার মানেন। যুদ্ধে শহীদ হন এলাকার বীর সন্তান গৈলা গ্রামের সিপাহি আলাউদ্দিন, নাটৈ গ্রামের সৈয়দ আবুল হাসেম, চাঁদশী গ্রামের মোকতার হোসেন ও পরিমল মঙ্গলসহ আশে-পাশের অনেক গ্রামবাসী। এই ২৫ এপ্রিল গৌরনদী উপজেলার ঘোচামের বাহিনীর ঘাঁটি দখল করে পাকিস্তানী আর্মি ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপরে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকার বাহিনী ও শান্তি কমিটি গঠিত হয় এবং শুরু হয় ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, গণহত্যা।

এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক, গৌরনদী ও আগৈলবাড়ার সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মোঃ ইউনুস বলেন-

পাকসেনারা গৌরনদী কলেজে মিনি-ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে আগৈলবাড়ায়, কাঠিরায়, কেতনার বিলে, কোদালধোয়ায়, গৈলায়, বাকালসহ বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, বহু সাবালিকা ও নারী ধরে নিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। হঠাত করে এ অঞ্চলে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা এটাই বলতে চাই বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছে ১৬ ডিসেম্বর আর গৌরনদী ও আগৈলবাড়া বিজয় অর্জন করে ২২ ডিসেম্বর। কারণ হলো পাকসেনারা এতো বেশি অত্যাচার-নির্যাতন করেছে যে, যখন পর্যন্ত মিত্র বাহিনী না আসছে ততদিন পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেনি। আর অত্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অঙ্গীকৃতি ভূমিকা পালন করেন জননেতা আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ।

এ প্রসঙ্গে বর্তমান আগৈলবাড়া উপজেলার চেয়ারম্যান ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য আব্দুর রহিত সেরনিয়াবাত বলেন-

দেশের বিভিন্ন এলাকায় যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। আমরাও বারিশালের বৃহত্তর গৌরনদী থানাসহ দক্ষিণাঞ্চলের সকল থানাসমূহে বিদ্রোহ গড়ে তুলি। এর ধারাবাহিকতায় আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের নির্দেশনায় ও রাকিব সেরনিয়াবাতের নেতৃত্বে গৌরনদীর থানা আক্রমণ করে পুলিশের সমন্ত অঙ্গ ছিলয়ে এনে গৌরনদী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হরলাল গাঙ্গুলির বাড়িতে কলেজ হোস্টেলে ক্যাম্প গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার লক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে এক্স সেনা সদস্য, এক্স পুলিশ সদস্য, বিভিন্ন এলাকার সশস্ত্র বিদ্রোহী সদস্য এবং ঘোচামের বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য, সেই সাথে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষকদের এক্যবন্ধ করে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একুশে পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা অজয় দাসগুপ্তবলেন-এক একটি এলাকা দখল করে সেখানে মানুষ মারা হয়েছে পাখির মতো গুলি করে কিংবা বেয়নেটের খেঁচায়। জামায়াতে ইসলামীসহ আরও কয়েকটি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তারা হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে এবং জবাই করেও অনেককে হত্যা করেছে। বসতবাড়ি, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাক আর্মির কাছে মানুষ মারা এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া ছিল নিত্যদিনের খেলার মতো।

১৪ মে পাক আর্মিরা গৌরনদীর উপজেলার বাকাই, দোনারকান্দি থামে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাঠী নামক স্টেশনে নেমে পশ্চিম দিকের মাটির রাস্তা ধরে এগতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যার জন্য স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় বাকাই থামে পৌছে পথমে বাকাই সংস্কৃত কলেজ ও গ্রামের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। এই খবর পশ্চিম দিকের গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে যায়। তারা পাকবাহিনীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দোনারকান্দিসহ আশপাশের লোকজন নিয়ে জয় বাংলা শোগান দিতে দিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাক-বাহিনীও মেটো রাস্তা ধরে রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগতে থাকে। দেশমাতৃকার আহ্বানে আগুয়ান এই জনতাকে নেতৃত্ব দেন দোনারকান্দি নিবাসী অনিল মল্লিক। তাঁরা ঝুপি, ল্যাজা, কতু, দা, বঁটি, লাঠি, লগি, ঢাল, তীর, ধনুক প্রভৃতি দেশীয় অন্ধ-শস্ত্র নিয়ে দুর্বার আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উভয় পক্ষের মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধে চার জন পাকসেনা নিহত হয়। একটি গুলি অনিল মল্লিকের উরতে বিন্দ হলে অবিরাম রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন পাকসেনারা প্রতিশোধের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চারপাশের বিভিন্ন এলাকায় অগ্নি সংযোগ করে ও নির্বিচারে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। তবে আগেলবাড়ার গণহত্যা সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা বাকাইতে বাকাল হয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ ইংরেজি ‘আই’তে ফুলস্টপ না দেওয়ায় বাকাল হয়ে যায়। তাই বাকালের দিকে অগ্রসর হতে হতে টরকী, রামসিন্দি, চাঁদশী, শিহিপাশা, রাজিহার, রাংতা, কেতনার বিল এবং পরে বাকালে গণহত্যা চালায়। তারপরে পশ্চিম সুজনকাঠি, রথখোলা, গৈলা দত্তবাড়ি, পতিহার, কাঠিরা ও বাগদা দাস পাড়ায় সাধারণ জনগণ গণহত্যার শিকার হন। এছাড়া পাকবাহিনী রামশীল ও কোটালীগাড়া যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হেমায়েত বাহিনীর ঘাঁটি উচ্চেদের জন্য আক্রমণ করলে পয়সার হাটে ২১ মে সরাসরি যুদ্ধ হয়। আবার আমবৌলাতে বেইজ কমান্ডার আইয়ুব আলী মিয়ার নেতৃত্বে সরাসরি যুদ্ধ হয় তাতে চার জন পাকসেনা নিহত হয়।

ইংরেজি Genocide কে বাংলায় বলা হয় গণহত্যা। ‘গণ’ অর্থ হলো বহু মানুষ আর ‘হত্যা’ অর্থ হলো প্রাণনাশ বা খুন করা। একসাথে বহু মানুষ হত্যাই গণহত্যা। মূলত পরিকল্পিতভাবে কোনো এলাকায় বহু মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার নামই গণহত্যা। জাতিসংঘের দৃষ্টিতে গণহত্যা হলো একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস। আগেলবাড়ায় অনেকাংশে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মহান স্বাধীনতার দীর্ঘ তিপ্পান বছর পর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা অসম্ভব। কেননা অনেক প্রত্যক্ষদশী মৃত্যুবরণ করেছেন, স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যতটা সম্ভব সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আগেলবাড়া উপজেলায় পাকসেনাদের অনেকগুলো গণহত্যার মধ্যে প্রধানগুলো নিম্নরূপ:

কেতনার বিলের গণহত্যা

কেতনার বিল আগেলবাড়া উপজেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে রাংতা গ্রামে অবস্থিত। বরিশালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আসলে গণহত্যার দিক থেকে কেতনার বিলের নামটি সর্বাংগে চলে আসে। কেননা নিরন্তর মানুষের উপর এ রকম ব্যাপক গণহত্যার ইতিহাস বরিশাল বিভাগে দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৭১ সালের ১৫ মে সকাল দশটার দিকে হঠাৎ গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে যায়। ভয়ে কারো মুখে কথা নেই। খাঁকি পোষাক, মাথায় হেলমেট, পিঠে-কাঁধে অত্যাধুনিক অঙ্গে সজ্জিত পাক-হানাদার বাহিনীর বিশাল বহর রাংতা গ্রামের রাস্তায় হাজির। যাদের অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়ঙ্কর কাহিনি গ্রামবাসী লোক মুখে শুনেছে। যতদূর চোখ যায় সারিবদ্ধ পাকবাহিনীর বিশাল বহরটি এগোচ্চে আর অগ্নি সংযোগে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। মুহূর্তেই ভয়াৰ্ত জনতা ছুটে পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে, ঘন বন-জঙ্গল কিংবা বৃক্ষরাজি

লতা-পাতায় ঢাকা ডোবা-পুকুরের মধ্যে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভীত সন্তুষ্ট কিশোরীরা ও বিভিন্ন বয়সের নারীরা পালিয়ে থাকলে তাদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতনের পর অঙ্গের আঘাতে হত্যা করে। সমগ্র এলাকায় বসত বাড়ি জন-মানব শূন্য। পাক হানাদাররা তাই খোলা মাঠ পেড়িয়ে বিলের দিকে অহসর হচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন বিলে আশ্রয় নিয়েছিল আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রাম জেলা উপজেলা থেকে আসা শত-শত ঘরবাড়ি হারানো মানুষ। পাকসেনারা মুহূর্তের মধ্যে ত্রাশফায়ার এবং ফ্রেনেডের আঘাতে হত্যা করে শত শত মানুষ। অত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে এখানে এক হাজার থেকে দেড় হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে পাত্র বাড়ি, বেপারী বাড়ি ও বিলের নানা ভিটা-ডোবায় আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলো নিশ্চিন্ত ছিল এই গহীন বিলে পাকসেনারা প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তাদের সকল ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। স্থানীয় রাজাকারদের দেখানো পথে অতি সহজেই বিলের মধ্যে চলে আসে পাকবাহিনী।

সৌদিনের প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ পরিবারের সদস্য রাজেন্দ্রনাথ পাত্র জানান-

মিলিটারি আসার খবর পেয়ে কসবা, রামসিদি, ধানডোবা, সমদ্বারপাড়, চাঁদশী, সাত কাপুলা, রাংতা, রাজিহারসহ আশপাশের সমস্ত লোকজন কেতনার বিল নিরাপদ আশ্রয় মনে করে হাটু সমান পানি অতিক্রম করে বিলের মধ্যে পাত্র বাড়িতে এবং পাত্র বাড়ির চার পাশের ধানক্ষেতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মিলিটারিরা সকাল ১১টার দিকে রাস্তার পাশ দিয়ে চুপিচুপি এগুতে থাকে। তারপরে গনি ব্যপারীর বাড়িতে এসে ফাঁকা গুলি করে। সাথে সাথে মানুষ দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি শুরু করে। তখন মিলিটারিরা উত্তর দিকের খাল পাড় হয়ে বেপারী বাড়িসহ আশ-পাশের প্রচুর মানুষ হত্যা করে। এরপরে উত্তর পশ্চিম দিকের কেতনার বিলের মধ্যে উচু ভিটায় ওঠে গুলি শুরু করে। পূর্ব পাশের পাত্র বাড়িতে উঠে আগুন জুলিয়ে দেয়। রামসিদি গ্রাম থেকে আসা নারায়ণ পাল নামে এক ব্যক্তি মানিদের ঢুকে প্রার্থনা করতে থাকে তাঁকে প্রথমে গুলি করে মন্দিরসহ পুড়িয়ে দেয়। এক মহিলার কোলে বারো দিনের এক পুত্র সন্তান ছিল, প্রথমে ঐ মহিলাকে গুলি করে পরে বাচ্চাটিকে পা দিয়ে পাড়া দিয়ে নারি-ভূরি বের করে হত্যা করে। চাঁদশী গ্রামের এক বছরের ছেলে যতীন। তার মায়ের কোলে বসে গুলি লাগে। সে আজও পঙ্খুত্ব বরণ করে বেঁচে আছেন। সৌদিন পাত্র বাড়িতেই ১৯ জনকে মেরে ফেল হয়। তাদের মধ্যে এক পরিবারের এক বছর বয়সী কবিতা নামে এক মেয়ে বেঁচে যায়। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশে ধান ক্ষেতে শতশত লোক আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকে দৌড়াদৌড়ি করে যখন পালাতে চেষ্টা করে তখন মিলিটারিরা বাঁকে বাঁকে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মারতে থাকে। ধানক্ষেত তখন রক্ত গঙ্গা হয়ে যায়।

সৌদিন শত শত শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায়-

১. আব্দুর রাজাক (৪৫), পিতা - হাবিবুর রহমান, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. মেজিদিন হাওলাদার (৪৫), পিতা- আব্দুল কাদির হাওলাদার, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. হেসেন বেপারি (৩০), পিতা - ফৈজদিন বেপারি, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. তালেব বেপারি (৩৫), পিতা - এছিন বেপারি, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. আব্দুল হক ফকির (৪০), পিতা - নোয়াব আলী ফকির, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. ফরহাদ ফকির (২৫), পিতা - ডাঃ জোনাব আলী ফকির, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. রশিদ ফকির (৩০), পিতা - ডাঃ জোনাব আলী ফকির, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল

৮. শ্রীমন্ত পাত্র (৩৫), পিতা - অধর পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. অধর পাত্র (৫৫), পিতা - গোকুল পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. চৈতন্য পাত্র (৫), পিতা - শ্রীমন্ত পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১১. শশু বৈদ্য (২০), পিতা - রামচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. রাজবিহারী বৈদ্য (২৫), পিতা - রাইচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৩. কৃষ্ণকান্ত বৈদ্য (৩৫), পিতা - উপাচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৪. বিমল বেপারি (৪০), পিতা - বিনোদ বেপারি, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৫. নিতাই বেপারি (৩৫), পিতা - মাধব বেপারি, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৬. নিবারণ বিশ্বাস (২৫), পিতা - গোপাল বিশ্বাস, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৭. মঙ্গল পাত্র (৩০), পিতা - বিহারী পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৮. বিনোদ পাত্র (৪০), পিতা - দশরথ পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৯. কাশীনাথ পাত্র (৫০), পিতা - পতকী পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২০. যতি পাত্র (৪৫), পিতা - সদানন্দ পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২১. মোহন পাত্র (৩৫), পিতা - রাত্তল পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২২. বিপুল পাত্র (১০), পিতা - কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৩. সাজু বিবি (৩০), স্বামী - আরেফ উদ্দিন মোল্লা, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৪. সাহেদা বেগম (২৫), স্বামী - আঃ রহমান মোল্লা, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৫. চান বরু (৪০), স্বামী - কাসেম মোল্লা, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৬. সানু আভার (২০), পিতা - শফি মোল্লা, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৭. মালতী রাণী (২৮), স্বামী - রাম প্রসাদ, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৮. শোভা রাণী (৫), পিতা - রাম প্রসাদ, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৯. বকুল রাণী বেপারী (৮), পিতা - বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩০. গীতা রাণী (২৫), স্বামী - অধর পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩১. কানন রাণী (২০), স্বামী - বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩২. কাননী (৩), পিতা - বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৩. গীতা পাত্র (১৫), পিতা - বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৪. সরস্বতী পাত্র (৩৫), স্বামী - মঙ্গল পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৫. বিজয়া (২০), স্বামী - দেবেন্দ্র পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৬. বেস লক্ষ্মী পাত্র (৩০), স্বামী - লক্ষ্মী কান্ত পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৭. ত্রিফুলী পাত্র (৪০), স্বামী - কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৮. মঞ্জু পাত্র (১৮), পিতা - কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩৯. বিষ্ণু পাত্র (৭), পিতা - কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪০. সাবিত্রি ঘরামী (৩০), স্বামী - রজনী কান্ত ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪১. নিভা ঘরামী (১০), পিতা - রজনী কান্ত ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪২. মনিকা রানী ঘরামী (৩০), স্বামী - রঞ্জন ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৩. হরিবালা বাড়ে (২৫), স্বামী - কৃষ্ণকান্ত বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৪. অঞ্জলি বাড়ে (৭), পিতা - কৃষ্ণকান্ত বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৫. কাকলী বাড়ে (৫), পিতা - কৃষ্ণকান্ত বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৬. পরিমল দে, পিতা - বসন্ত দে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৭. নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য, বরিশাল
৪৮. মায়া রানী ভট্টাচার্য, স্বামী - নিমচাঁদ চক্রবর্তী, বরিশাল
৪৯. পুতুল বরকন্দাজ, পিতা - বিনোদ বরকন্দাজ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল

৫০. যুথি বরকন্দাজ, পিতা - সুরেশ বককন্দাজ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫১. বগলা বাছার, পিতা - কাশিশ্বর বাছার, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫২. ললিতা সুন্দরী মাল, স্বামী - হরেন মাল, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৩. সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা - বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৪. গীতা রানী চক্রবর্তী, স্বামী - নিতাই চক্রবর্তী, টরকী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৫. সুভাষ চক্রবর্তী, পিতা - নিরোদ চক্রবর্তী, টরকী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৬. রাধেশ্যাম কর (২২), পিতা - রাখাল কর, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৭. মালতী বেপারী স্বামী - ভগিরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৮. বিজয়া রানী (২৫), স্বামী - মনোরঞ্জন, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৯. বুড়ি বেপারী (১০), পিতা - নিরঞ্জন বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬০. অমিত দাস (২৫), পিতা - জয়দেব দাস, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬১. প্রকাশ দাস (৩০), পিতা - পরিমল দাস, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬২. বসন্ত দাস (৬০), পিতা - উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৩. রজনী পাল (৬৫), পিতা - উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৪. অক্ষয় চক্রবর্তী (৭০), পিতা - উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৫. লেবু গোমতা (৩০), পিতা - উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৬. রেনুকা বালা (৩০), স্বামী - অক্ষয় কুমার মঙ্গল, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৭. বিহারী সিকদার (৬০), পিতা - উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৮. রাখাল কর (৩৫), পিতা - রজনী কর, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৯. কাশীরাম কর (৩০), পিতা - রজনী কর, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭০. ষ্পন কুমার বসু (২২), পিতা - মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭১. যুথিকা বসু (১৯), পিতা - মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭২. শেফালী বসু (১৬), পিতা - মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৩. মায়া ভট্টাচার্য (২৬), স্বামী - নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৪. ননী বালা (৪০), স্বামী - সুবোধ চক্রবর্তী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৫. শক্তি চক্রবর্তী (১৫), পিতা - সুবোধ চক্রবর্তী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৬. দুর্গা বরকন্দাজ (১৭), পিতা - দৈশ্বর বরকন্দাজ, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৭. রেনুকা আচার্য (৩৮), স্বামী - হারান চক্রবর্তী, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৮. প্রকাশ চন্দ্র দাস (৬৫), পিতা - আনন্দ দাস, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৯. জয়দেব দাস (৯), পিতা - প্রকাশ চন্দ্র দাস, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮০. অনন্ত গাইন (৪৫), চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮১. খোকন গাইন (৫), পিতা - অনন্ত গাইন, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮২. ফুলি (৫৫), রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল (ভিক্ষুক)
৮৩. অন্ন বেপারী (৩৫), স্বামী - ভগিরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৪. সরস্বতী বেপারী (৫), পিতা - ভগীরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৫. কেষব দত্ত (৪০), পিতা - রজনীকান্ত দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৬. মনিবালা দত্ত (৩০), স্বামী - কেষব দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৭. কুঞ্জবিহারী দত্ত, (৪৫) পিতা - তারাচাঁদ দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৮. নারায়ণ ভুঁইয়া, রামসিদ্ধি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮৯. নারায়ণ ভুঁইয়ার স্ত্রী (৪০), রামসিদ্ধি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯০. গীতা ভুঁইয়া, পিতা - নারায়ণ ভুঁইয়া, রামসিদ্ধি, আগেলবাড়, বরিশাল
৯১. অতুল পাল, দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগেলবাড়া, বরিশাল

৯২. অতুল পালের মা (৬০), দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৩. নারায়ণ পাল (৬৫), দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৪. রজনী, দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৫. বসন্ত নন্দীর স্ত্রী, দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৬. সুদেব বেপারী (৩৫), দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৭. সেকেন্দার বেপারী (৬৫), দক্ষিণ রামসিংহি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৮. শচীন্দ্র নাথ ভূইয়া, পুরোহিত, তারাকুপি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯৯. সুবোধ চন্দ্র ভূইয়া, সেবাইত, বার্থী, গৌরনদী, বরিশাল
১০০. রমেশ চন্দ্র কাপালী (৫৫), পিতা - তারাকুপি, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০১. লেমন সুন্দরী (৪০), স্বামী - সদানন্দ বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
১০২. শ্যামল বাড়ে (১২), পিতা - সদানন্দ বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।

এছাড়াও শত শত নাম না জানা লোক কেতনার বিলে শহিদ হয়েছেন।

নিহত হয় শিশু অস্ত পাত্র (১২ দিনের), পিতা - কার্তিক পাত্র, রাঙ্তা, আগেলবাড়া, বরিশাল।

সেদিন অনেকেই আহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ ঘটনার তিন-চার দিন পরও মারা যান। এখনও পঙ্খুত্ব নিয়ে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত মানবেতরভাবে বেঁচে আছেন। তাঁরা হলেন-

১. যতীন বাড়ে (৫৯), পিতা - কৃষ্ণকান্ত বাড়ে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল (দিনমজুর)
২. বিল্ল পাত্র (৬১), পিতা - লক্ষ্মী পাত্র, রাঙ্তা, আগেলবাড়া, বরিশাল (দিনমজুর)
৩. করিম মোল্লা (৬২), পিতা - রফিক মোল্লা, রাঙ্তা, আগেলবাড়া, বরিশাল (দিনমজুর)
৪. ভুলু দত্ত (৬৫), পিতা - কেষব দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল (কৃষক)
৫. ভঙ্গি বিবি (৬২), স্বামী-খোরশেদ মিয়া, গ্রাম- উত্তর শিহিপাশা, আগেলবাড়া, বরিশাল (কৃষক)
৬. সুখরঞ্জন বেপারী (৬৬), পিতা - নিরঞ্জন বেপারী, রাঙ্তা, আগেলবাড়া, বরিশাল (কৃষক)

কাঠিরা গণহত্যা-

আগেলবাড়া উপজেলার অতি সন্নিকটে কাঠিরা গ্রাম। উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিনি কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। ৩০ মে কাঠিরা গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের পর থেকে কাঠিরার পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় 'ঘোড়ারপাড় দিপ্তি' ভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়' ও উপজেলা সদরের 'ভেংগাই হালদার পাবলিক একাডেমী' কোনো রকমের ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায় কেননা সবার মনে শুধু আতঙ্ক। ছাত্র- শিক্ষক কেউই বিদ্যালয়ে আসেন না। চারদিকে কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। তবে কয়েকজন উদ্বীগ্ন তরঙ্গের কঠিন খেলাক্ষেত্রে ফুলশ্রী গ্রামের দিক থেকে মিছিল আসে - জয় বাল্লা-জয় বঙ্গবন্ধু ধনি - তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা - একপ নানা শ্লোগানে। কতিপয় ছাত্র বিদ্যালয়ে না গেলেও মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। জনমনে ভয় তাড়িয়ে বেড়ায়। বাড়িতে বন্ধুরা মিলে মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকার যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করে। এমনি উত্তাল অবস্থায় মার্চ-এপ্রিল মাসে আগেলবাড়া ভেংগাই হালদার পাবলিক বিদ্যালয় মাঠে আন্দুল খালেক পাইক ও নজরালী ফকির যুবকদের নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সারে তিন হাত বাঁশের লাঠি দিয়ে ট্রেনিং করাতেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এর ভিতর

নজরালী ফকির কুখ্যাত রাজাকারে পরিগত হয়। বিদ্যালয়ে যেতে হয় না বলে ছাত্রদের আনন্দ, কিন্তু বড়দের মুখে পাকিস্তানি সেনা ও দেশীয় রাজাকারদের কথা শুনে একটি আতঙ্ক সর্বদাই বিরাজ করে। রাতে দেখা যায় কারো চোখে ঘুম আসে না। মানুষ নিষ্পাঞ্চলের দিকে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে প্রাণ রক্ষার তাগিদে আশ্রয় নিয়েছে। কাঠিরা গ্রামের একমাত্র সরকারী চাকুরীজীবী কৃষ্ণদাস হালদার এ প্রসঙ্গে বললেন – বাড়িতে থাকা যাবে না, কোদালধোয়া গ্রামে চলে যাই। সেখানে লক্ষণ দাস মহাশয় সার্কাস দল নিয়ে পালাতে এসেছেন। এভাবে মানুষ নিজের আশ্রয়স্থান ছেড়ে আত্মরক্ষা করে। এই সুযোগে রাজাকারেরা হিন্দু বাড়িতে গিয়ে ধান-চাল, গরু-ছাগল, সহায়-সম্বল লুট-পাট করত, বাড়িতে আগুন দিত এবং নারীদের সন্ত্রমহনী করত।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বর্তমানে কাঠিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র হালদার বলেন—

মিলিটারির উপস্থিতি টের পেয়ে আমি গ্রামের পাশে আক্ষর বিলে একটি ভিটায় আশ্রয় নিই। এরপরে দেখি উত্তর দিক থেকে অগ্নিময় ঝোঁয়া উড়ছে আর মানুষগুলো দক্ষিণ দিকে দৌড়ে আসছে। বেলা তখন চারটা। শোনা গেল মিলিটারি চলে গেছে। আমরা মাকেসহ বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বাড়ি আসতে প্রথম যে মৃত দেহটি দেখলাম তা সাধু রাইচরণ বৈরাগী মহাশয়ের। তিনি আক্ষর শ্রীক্রী হরি মন্দিরে সাধনারত ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে গুলি করে মারা হয়। এ অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি আছে তাঁকে যে মিলিটারি মেরেছে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পাক-আর্মিরা তাকে ধরে গৌরনদী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পরে সে মারা যায়। সেদিন সেনাটি অসুস্থ না হলে পাকসেনাদের তাঙ্গৰ থামত না। তারপরেও যা দেখলাম মনে হয়েছে যেন কারবালার যুদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে একটি লাশ ওখানে একটি লাশ। মানুষেরা তাঁদের স্বজনদের খুঁজছে আর জিজ্ঞাসা করছে – আমার বাবাকে দেখেছে! আমার মাকে দেখেছে! আমার ভাইকে দেখেছে! এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সামনে অহসর হয়ে দেখি আমার বংশের জ্যাঠা মহাশয়সহ তাঁর দুই পুত্রের লাশ পড়ে আছে।¹⁰

কাঠিরার যাঁরা গণহত্যার শিকার হন, তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. শ্যামকান্ত রায়, পিতা – চূড়ামণি রায়, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. হরিপদ মঙ্গল, পিতা – বাসীরাম মঙ্গল, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. লালমোহন হালদার, পিতা – ভূবন হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. দিজবর বাড়ে, পিতা – ভজন বাড়ে, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. মোহন হালদার, পিতা – পরিমল হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. পূর্ণচন্দ্র কর্মকার, পিতা – বিপিন কর্মকার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. দিব্যবৰতী বৈরাগী, পিতা – মনোহর বৈরাগী, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. সুরেন হালদার, পিতা – হরিচরণ হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. দুঃঘৰীরাম হালদার, পিতা – সনাতন হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. শ্রীনাথ হালদার, পিতা – মনমথ হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১১. জগীন্দ্র মধু, পিতা – এককড়ি মধু, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. রঞ্জিত মধু, পিতা – সনাতন মধু, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৩. নারায়ণ মধু, পিতা – হরিচরণ মধু, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৪. মনরঞ্জন মধু, পিতা – হরিচরণ মধু, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৫. রামচন্দ্র বাড়ে, পিতা – শ্রীনাথ বাড়ে, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৬. জলধর কীর্তনীয়া, পিতা – কানাই কীর্তনীয়া, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৭. লালমোহন কীর্তনীয়া, পিতা – জগবন্ধু কীর্তনীয়া, যোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল

১৮. নারায়ণ কীর্তনীয়া, পিতা- রামকৃষ্ণ কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৯. যোগেশ কীর্তনীয়া, পিতা- রজনীকান্ত কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল
২০. অনিল কীর্তনীয়া, পিতা- রজনীকান্ত কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল
২১. লক্ষ্মীরানী সুতার, স্বামী - কানাই লাল সুতার, ঘোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল
২২. হারাধন মিষ্টি, পিতা - নেপাল মিষ্টি, ঘোড়ারপাড়, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৩. অক্ষয় কুমার বিশ্বাস, পিতা - রামচরণ বিশ্বাস, হাওলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৪. যোগেশ চন্দ্ৰ হালদার, পিতা - রাজকুমার হালদার, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৫. দীরেন্দুনাথ হালদার, পিতা - যোগেশ চন্দ্ৰ হালদার, বাকাল আগেলবাড়া, বরিশাল
২৬. রঞ্জিত কুমার হালদার, পিতা - যোগেশ চন্দ্ৰ হালদার, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৭. বাসীরাম হালদার, পিতা - গুরুচরণ হালদার, প্রিচারমাঠ, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৮. জ্যোতিষ রায়, পিতা - আনন্দ রায়, রাহতপাড়া, আগেলবাড়া, বরিশাল
২৯. সাধক রাইচরণ বৈরাগী, পিতা-নন্দরাম বৈরাগী, সমাধি আঙ্কর, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩০. মন্নাথ হালদার, পিতা - পাঁচকড়ি হালদার, কাঠিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল

বাকাল গণহত্যা-

দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় আগেলবাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। রাজাকারেরা বিখ্যাত হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে দেখে দেখে পাকবাহিনী খবর দিয়ে এনে হত্যা করাতে থাকে। এমন অবস্থায় ১৪ জুলাই পাকসেনারা প্রথম বাকাল আক্রমণ করে। পাকহানাদার বাহিনী প্রথমে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি টের পেয়ে পাশের বাগানের মধ্যে একটি গর্তে লুকিয়ে থাকেন। পরে হানাদারেরা পূর্ব পাশের মুসলিম বাড়িতে গিয়ে এক মহিলাকে জিঙ্গাসা করলে সে বলে দেয় লুকানোর স্থান। তখন বাগানের গর্ত থেকে তাঁকে ধরতে গেলে তাঁর হাতের বড় বেতের লাঠি দিয়ে পাকসেনাদের আঘাত করেন। অতঃপর পাকবাহিনীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের ঐ লাঠি দিয়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রথমে পিটিয়ে আহত করে পরে আবার গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। এরপরে বাকাল গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে আগু সংযোগ করে এবং গুলি করে মানুষ হত্যা করতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়সহ ১০-১৫ জনকে হত্যার পর সাধারণ মানুষ বাড়িতে অবস্থান না করে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তবে শূন্য বাড়িতে অগ্নিসংযোগের সাথে সাথে গাছ-পালাও মর্টার শেলে, কামানে, বুলেটে বাঁবাড়া করে দেয়। সেইসাথে রাজাকারেরা লুটপাট করে হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি নিজেদের হস্তগত করে। তবে বাকাল গ্রামের মতো এত বেশি পাকসেনারা আগেলবাড়ার অন্য কোনো গ্রামে আসেনি।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হরেকৃষ্ণ রায় পলাশ বলেন-

সকালে পাতা খেয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। মানিক মোড়ল, মধুসূদন হালদার এবং আমি একসাথে থাকতাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম মিলিটারি এসেছে। অনেক ঘরে আগুন দিয়েছে। আমরা তিনি জন একটা উচু গাছে উঠে দেখতে পেলাম অনেক বাড়িতে আগুন দিয়েছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি খাঁকি পোশাক পড়া, মাথায় লোহার টুপির মতো, পায়ে বড়ো বড়ো জুতা, কাঁধে রাইফেল নিয়ে কাদের যেন খুঁজছে। পাক-আর্মিরা দূরে চলে গেলে আমরা ভয়ে গাছ থেকে নেমে বেহলার পাড় কালী মন্দিরের আন্দিতে (দিঘিতে) কচুরিপানার মধ্যে একবটা লুকিয়ে ছিলাম। মিলিটারি চলে যাওয়ার পরে বিকেলে শুধু মানুষের হাহাকার আর কান্নার রোল শুনতে পেলাম। কেউ কেউ আবার চিংকার করে কান্না করতে নিষেধ করলো। গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশটা বাড়ির পঞ্চাশখানা ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ব পাড়ায় সনাতন কুলুর লাশ, পশ্চিম পাড়ায় দুলাল রাহার লাশের পাশে স্বজনরা ক্রম্বন করছে। পরের দিন আবার মিলিটারি আসার খবর

পেয়ে আমরা তিন জন বড় রেন্ড্রি গাছে উঠে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন মিলিটারি সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজীর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে বাগানের গর্ত থেকে এনে নির্মানাবে পিটিয়ে ও গুলি করে হত্যা করলো।¹

এভাবে বাকাল গ্রামে সাত বার পাকবাহিনীরা আক্রমণ করে। তখন গণহত্যার শিকার হন-

১. সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা - চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. যোগেশচন্দ্র হালদার, পিতা - রাজবিহারি হালদার, পিতা - বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. ধীরেন হালদার, পিতা - যোগেশচন্দ্র হালদার, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. রঞ্জিত হালদার (কুটি), পিতা - যোগেশচন্দ্র হালদার, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. দুলাল রাহা, পিতা - মতিলাল রাহা, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. সনাতন কুলু, পিতা - মাধব কুলু, পিতা - বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা - জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. ননীচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা - জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা - জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. ইসমাই হোসেন হাওলাদার, পিতা - দলিল উদ্দিন হাওলাদার, বাকাল, আগেলবাড়া, বরিশাল

কোদালধোয়া গণহত্যা

তৎকালীন গৌরনদী উপজেলার অঙ্গর্গত কোদালধোয়া একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এটি গৌরনদী উপজেলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হলেও রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো। অত্র এলাকার বিখ্যাত এমবিবিএস ডাঃ সতীশ বালা ঐ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে আগেলবাড়া উপজেলা থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। বাংলা ১৩৭৮ সালে ১ আষাঢ় পাকবাহিনী কোদালধোয়া গ্রামে আক্রমণ করে। এত প্রত্যন্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের কারণ হলো, এখানকার শতকরা একশতাগ লোকই মুজিব আদর্শের অনুসারী এবং হিন্দু ধর্মবলী জনগোষ্ঠী। অপরদিকে পাকিস্তান সার্কাস-এর সন্ত্রাধিকারী লক্ষণ দাস জীবন রক্ষার্থে ঐ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদল রাজাকার তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের গ্রামে নিয়ে আসে। তারা স্পিডবোট আসলেও গ্রামের কাছাকাছি এসে যাতে শব্দ না হয় সেজন্য মেশিন বন্ধ করে গুন টেনে খালের মধ্যে দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল লক্ষণ দাসকে হত্যা করা। তিনি শক্রর আক্রমণ বুঝতে পেরে কোদালধোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কালী মন্দিরের সামনে থেকে ওঠে দোড়ে সরকার বাড়ির পুরুর পাড়ে মেঠো পথ দিয়ে আত্মরক্ষার্থে ডোবার মধ্যে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তখন রাজাকারদের সহায়তায় হানাদার বাহিনীর সদস্যরা পেছনে তাড়া করে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে বাগানের মধ্যে একটি উঁচু ঢিবি ছিল সেখানে তাল গাছের সাথে সার্কাসের হাতিটি বাঁধা ছিল পাকবাহিনী সেটিকেও গুলি করে হত্যা করে। সেইসাথে সার্কাসের অনেকগুলো পশু ও পাখি হত্যা করে। পরে তারা গ্রামে ২০/২৫ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শিশুসহ ১৫ জনের মতো হত্যা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাবার কোলে থাকা এক বছরের একটি শিশুকেও তারা হত্যা করে। এভাবে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই তারা হত্যা করেছে।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুনীল সরকার বলেন-

পাকিস্তানি মিলিটারির উপস্থিতি টের পেয়ে আমি দৌড়ে একটি গাছে উঠে দেখি জয়ধর বাড়ি, মৃড়ি বাড়ি (হালদার বাড়ি), পাওে বাড়ি, বৈষ্ণব বাড়ি, ওৰা বাড়ি, হাজরা বাড়ি ও দাস বাড়িতে আগন্তের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলীর মতো দাউ দাউ করে উপরের দিকে উঠছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দে ভয়ে গা ছমছম করে কাঁপছে। এভাবে মিলিটারির দেড় ঘন্টার মতো তাওৰ চলায়। গাছে প্রায় আধা ঘন্টার মতো থাকার পর গাছ থেকে নেমে বৈষ্ণব বাড়িতে দেখি বাবার কোলে বসে নিহত ২বছর বয়সী স্বপন বৈষ্ণবের লাশ, ওৰা বাড়িতে শিয়ে দেখি নরেশ ওৰা ও ব্ৰজেন্দ্ৰ ওৰার লাশ, পাওে বাড়িতে নিবাৰণ পাওৰে লাশ, হাজৱা বাড়িতে প্যাকা হাজৱাৰ লাশ, দাস বাড়িতে যতীন দাস ও রশিক দাসেৰ লাশ এছাড়া পাক-আৰ্মিৰা দক্ষিণ পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় অনেক ঘৰবাড়ি জুলিয়ে দিয়েছে, অনেক নারী ও পুৰুষ হত্যা কৰেছে তাঁদেৱ নাম মনে নেই।'

সেদিন কোদালধোয়ায় যারা গণহত্যার স্থীকার হন তাঁদেৱ পৱিচিতি নিম্নে উল্লেখ কৰা হলো-

১. লক্ষণ দাস, পিতা - অশ্বিনী কুমার দাস, গৌরনদী, বৱিশাল
২. সুনীল চন্দ্ৰ ঘটক, পিতা - নৱেন্দ্ৰনাথ ঘটক, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৩. নারায়ণ চন্দ্ৰ মঙ্গল, পিতা - লক্ষণ চন্দ্ৰ মঙ্গল, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৪. স্বপন কুমার বৈষ্ণব, (২) পিতা - সনাতন বৈষ্ণব, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৫. নীমচাঁদ পাওে, পিতা - প্ৰসন্ন পাওে, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৬. নিবাৰণ পাওে, পিতা - প্ৰশান্ত পাওে, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৭. ৰাসিক চন্দ্ৰ দাস, পিতা - রঞ্জন চন্দ্ৰ দাস, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৮. যতীন্দ্ৰ নাথ দাস, পিতা - যাদব চন্দ্ৰ দাস, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
৯. অমূল্য বালা, পিতা - ৰাসিক বালা, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
১০. পূৰ্ণ হাজৱা (প্যাকা), পিতা - ধনঞ্জয় হাজৱা, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
১১. নৱেশ ওৰা, পিতা - চন্দ্ৰি চৱণ ওৰা, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
১২. ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ ওৰা, পিতা - গণেশ চন্দ্ৰ ওৰা, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল
১৩. কানাই ওৰা, পিতা - নিত্যানন্দ ওৰা, জলিৰ পাড়, কোদালধোয়া, আগৈলবাড়া, বৱিশাল

ৱাঁতা বেপাৰী বাড়ি গণহত্যা

সবুজ বৃক্ষরাজি ও ফসলি জমি বেষ্টিত প্ৰকৃতিৰ অপাৱ সৌন্দৰ্যেৰ লীলাক্ষেত্ৰ রাঁতা গ্ৰাম। এ গ্ৰামেৰ মধ্যে মেটো রাস্তা থেকে কিছুটা দূৰে বিলেৱ মধ্যে ছিল বেপাৰী বাড়ি। বাড়িটি আগৈলবাড়া উপজেলা থেকে প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূৰ্বে অবস্থিত। ১৪ মে পাকসেনারা গৌৱনদীৰ উপজেলার বাকাই ও দোনাৱকান্দি গ্ৰামে জনতাৰ হাতে চাৰ জন মাৱা যাওয়াৰ পৰ তাৱা উন্মাদ হয়ে বিলাখণ্ডলে হত্যাযজ্ঞ শুৱ কৰে। ১৫ মে গৌৱনদী ক্যাম্প থেকে পাক-আৰ্মিৰা টৱকী, কসবা, রামসিদি, চাঁদশীসহ বিভিন্ন গ্ৰামে ঘড়-বাড়িতে অঞ্চি সংযোগ ও গণহত্যা কৰতে কৰতে পশ্চিম দিকে বিলাখণ্ডলে আসতে থাকে। সাধাৱণ মানুষ মনে কৰেছিল রাস্তা বিহীন বিলাখণ্ডলে আৰ্মিৰা আসতে পাৱে না। তাই বেপাৰি বাড়ি নিৱাপদ আশ্বয় মনে কৰে দূৰ-দূৱাত থেকে অনেক লোক আশ্বয় গ্ৰহণ কৰেন। কিন্তু তাৱে ধৱণা ভুল প্ৰমাণিত কৰে পাক-আৰ্মিৰা হাটু সমান পানি অতিক্ৰম কৰে রাজাকাৰদেৱ দেখানো পথে বেপাৰী বাড়িতে এসে ফাঁকা গুলি কৰে। সাথে সাথে শতশত মানুষ বাড়িৰ উত্তৰ পাশেৰ ডোৰা ও ৰোঁপৰাঁড়ে আশ্বয় নেয়। ছেটাছুটি কৰতে থাকা আতঙ্কিত মানুষগুলোকে তখন পাখিৰ মতো গুলি কৰে মারতে থাকে। সাথে সাথে বাড়ি-ঘৱেও আগুন জুলিয়ে দেয়। তখন বেপাৰী বাড়িৰ চারদিকে

অজন্তু লোক নিহত হন। ঘটনার তিন দিন পর লাশগুলোকে গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণহত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী সাবিত্রী বেপারী বলেন-

রাংতার মাটির বাঞ্ছের সাঁকো পাড় হয়ে মিলিটারির বহর উত্তর দিকে আমাদের পাড়ায় আসে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিক মিলিটারি আসতেছে দেখে আমি তিন বছরের মেয়েকে (মায়া রাণী) নিয়ে দোড়ে গিয়ে জরার মিয়ার বাড়িতে উঠি। আমার স্থামী উত্তর পাশের ডোবার মধ্যে কোনো রকমে কুচিরিপানার মধ্যে নাক জগিয়ে বেঁচে থাকে। মিলিটারির দল রাইফেল উচিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আমাদের বাড়িরই ৭ জনকে মেরে ফেলে। টরকী বন্দর থেকে আশ্রয় নেওয়া নির্মল চক্ৰবৰ্তীৰ বাড়ির ১০ জনকে অত্যন্ত নির্মতভাবে হত্যা করে। এছাড়া আশ-পাশের বাড়িরও অনেককে হত্যা করে। মিলিটারি যাওয়ার পর বাড়ি এসে দেখি ১৯ জনের লাশ পড়ে রয়েছে।¹

সেদিন যারা গণহত্যার স্বীকার হন তাঁদের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

১. সুনীতি বেপারী (৩২), স্থামী - বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. বকুল বেপারী (৮), পিতা - বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. বিমল বেপারী (৪), পিতা - বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. নিতাই বেপারী (৩৫) পিতা - মাধব বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. গোলাপী বেপারী (৩০) পিতা - মাধব বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. মানিক্য বেপারী (২৫) পিতা - মাধব বেপারী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. নিরঞ্জন বেপারীর ভাইয়ের স্ত্রী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. নিরঞ্জন বেপারীর ভাইয়ের মেয়ে, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. ভক্ত বেপারীর ভাইয়ের স্ত্রী, রাংতা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. টরকী বন্দরের ব্যবসায়ী নির্মল চক্ৰবৰ্তীর (গৌরনদী, বরিশাল)

পরিবারের ১০ জন

শিহিপাশা গ্রামে গণহত্যা

আগেলবাড়া উপজেলা থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে শিহিপাশা গ্রাম অবস্থিত। গৌরনদীতে পাকসেনাদের ক্যাম্প শিহিপাশা থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। তাই অতি সহজেই পাকসেনারা শিহিপাশা হাওলাদার বাড়িতে আক্রমণ করে। স্থানীয় রাজাকার গণি ব্যাপারী ও নুরু খান পাকসেনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করে। ১৫ মে সকাল ১১ টার দিকে কয়েক প্লাটুন সৈন্য, হালকা মেশিনগান আৱ আধুনিক অস্ত্রসহ অতর্কিংভাবে এই গ্রামে হামলা চালায়। তারা প্রথমে মোল্লা বাড়িতে, হাওলাদার বাড়িতে, কুমার পাড়ায় গোসাই পালের বাড়িতে, তিলক পালের বাড়িতে ও রাসিক পালের ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মিলিটারির বহর দেখে আতঙ্কিত হয়ে প্রায় সবাই বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সমাজসেবক তরণি পালের ঠাকুরমা সাবিত্রী দেবী ভিটামাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। পাকসেনারা তাঁর ইজ্জত হননের চেষ্টা করলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা চালালে তাঁকে গুলি করে। গুলিবিহু অবস্থায় তিনি ছটফট করতে করতে কয়েক ঘণ্টা পরে গৃহাভ্যন্তরে প্রাগত্যাগ করেন। কুমারপাড়া যখন দাউদাউ করে জুলছে তখন আগুনের কালো ধোঁয়া অজগর সাপের ন্যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। শতশত কৃষক এ সময় আউশ আমনের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে। এসময় মাঠের কৃষকেরা একত্রিত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে নিজের বাড়ি-ঘর ও ঘজনদের রক্ষার জন্য সামনের দিকে এগুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকসেনারা তাঁদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে।

উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অত্র গ্রামের নিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দার মৃধা এ বিষয়ে বলেন-

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকসেনারা রাজাকারদের সহায়তায় আক্রমণ করে গণহত্যা চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে ঘর-বাড়ি জুলিয়ে দেয়। গ্রামটি কিছুটা দুর্গম এলাকা বিধায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর-বন্দর থেকে অনেক মানুষ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা পাকসেনাদের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।¹⁰

এখানে সেদিন নারী ও শিশুসহ সর্বমোট ১৫-২০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন-

১. কামিজ উদ্দিন হাওলাদার (৫৫), পিতা - এসাম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
২. জামিল উদ্দিন হাওলাদার (৩৫), পিতা - এসাম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৩. রূপবান বিবি, স্বামী - কামিজ উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৪. সামসুদ্দিন হাওলাদার, পিতা - কছিম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৫. বরু বিবি (৩৫), স্বামী - সামসুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৬. জালাল হাওলাদার (৫), পিতা - সামসুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৭. আবেদ আলী হাওলাদার (৩৫), পিতা - সোনামুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৮. আনোয়ার হাওলাদার (১০), পিতা - আবেদ আলী হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল
৯. ঘালিমা (১৫), পিতা - কামিজ উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলবাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।

পতিহার ও বিল্ল গ্রাম গণহত্যা

আগৈলবাড়া উপজেলা থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে পতিহার ও বিল্ল গ্রাম নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম অবস্থিত। মূলত গ্রাম দুটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত তাই স্থানীয় রাজাকার শাহে আলীর নির্দেশে পাকহানাদারদের আক্রমের কারণ হয়। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক আন্দুর রব সেরনিয়বাত বাড়ি সেরাল যাওয়ার কথা ছিল। সেই পথে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা পতিহার ও বিল্ল গ্রামের সামনে যাকে পেয়েছে পাকসেনারা তাকেই হত্যা করেছে। দিনটি ছিল ১৬ মে, সকাল ৯টা-১০টার দিকে পাকসেনারা পতিহার গ্রামে ঢুকে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এখানে পাঁচটি পাড়ায় দণ্ড বাড়ি, নাগ বাড়ি, সরকার বাড়ি, বিশ্বাস বাড়ি, কর বাড়ি, সোম বাড়ি, মজুমদার বাড়িসহ বিভিন্ন বাড়িতে ৩০০ থেকে ৪০০ ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। সেই সাথে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা পাক আর্মির উপস্থিতি টের পেয়ে আগেই পালিয়ে মুসলিম বাড়ি, খ্রিস্টান বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে। সেই সুযোগে স্থানীয় রাজাকারেরা ধান-চাল, গৃহপালিত পশু থেকে আরম্ভ করে সরবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বমোট এই গ্রামে নারী ও শিশুসহ ১৫ জনকে হত্যা করা হয়।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নারায়ণ চন্দ্র নাগ বলেন-

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাক-হানাদার বাহিনী গৌরনদীতে ক্যাম্প স্থাপন করার পর থেকেই আতঙ্কে থাকতাম কখন আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে বসে। এর মধ্যে খবর

পেলাম পূর্ব দিকের বিভিন্ন গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। আমি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পাশের গ্রামে (টেমারে) রাজেন্দ্র বাড়িয়ের বাড়ির উত্তর পাশে বেঁপের মধ্যে আশ্রয় নিই। পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখি ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছল করে ফেলেছে। মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালাচ্ছে। ঘণ্টা দেড়েক পর গোলাঞ্জুর শব্দ না পেয়ে বুবাতে পারলাম আর্মিরা চলে গেছে। তখন প্রথমে আমার নিকট আত্মীয় ভদ্র বাড়িতে দিয়ে দেখি রঞ্জনী কান্ত ভদ্রের গুলি বিদ্ধ লাশ। তখন মৃত দেহটি কয়েক জন মিলে মুখে অফিসংযোগ করে মাটি চাপা দেই। এরপর দত্ত বাড়িতে গিয়ে শুনি রাজাকার এবং আর্মিরা নিত্যানন্দ দত্তকে দিয়ে ডাব পাড়িয়ে খেয়ে দৌড় দিতে বলে অমনি পিছন দিক থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে।»

পতিহার ও বিল্ল গ্রাম গণহত্যায় যারা প্রাণ হারান তাঁরা হলেন-

১. বাশীরাম হালদার (৫০), পিতা - শ্রীনাথ হালদার, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
২. লক্ষ্মীকান্ত হালদার (৪৫), পিতা - কালীচরণ হালদার, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৩. রঞ্জনী ভদ্র (৬০), পিতা - অনন্ত ভদ্র, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৪. নিতাই দত্ত (২৫), পিতা - নকুল দত্ত, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৫. নীলা সোম (২৫), ঘামী -যাদব সোম, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৬. নারায়ণ পাল (৫০), পিতা - গোসাই পাল, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৭. চন্দ্রকান্ত শীল (৫৫), পিতা - সঞ্জিত শীল, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৮. কেষ্ট শীল (৪০), পিতা - কাশিনাথ শীল, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল
৯. অনিল কর (৩৫), পিতা - মহেন্দ্র নাথ কর, বিল্লগ্রাম (এলাকার আত্মীয়)
১০. প্রফুল্ল শীল, পিতা - চিত্তরঞ্জন শীল, পতিহার, আগেলবাড়া, বলিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।

রথখোলা গণহত্যা

আগেলবাড়া উপজেলা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব দিকে রথখোলা অবস্থিত। ৩০ মে সকালের দিকে পাকসেনারা রথখোলায় গণহত্যা চালায়। তাদের অতর্কিত আক্রমণে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিলে দুইজন বৃন্দা অগ্নিদণ্ড হয়ে নিহত হন। সর্বমোট এই গ্রামে নারী ও শিশুসহ অনেক হিন্দু জনগণ হত্যার শিকার হয়। অন্যরা পালিয়ে পাশের মুসলিম বাড়িতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সেদিন যারা গণহত্যার শিকার হন তাদের সবার নাম জানা যায়নি। মাত্র কয়েক জনের নাম স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে জানা যায়। তাঁদের মতে অনেকের নাম তারা ভুলে গেছেন, শিশুদের নাম মনে নেই। রথখোলা গণহত্যা সম্পর্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুর হক সরদার বলেন-

গৌরনদী পাকিস্তান ক্যাম্প থেকে একদল সৈন্য রাজাকারদের ইশারায় মুক্তিযোদ্ধা আবদুল সালামকে খুঁজতে থাকে। কারণ সে কটকচ্ছল ঘূঁটে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বাজারের মধ্যে ঢুকে প্রথমে মাছের ডালি মাথায় তিন জন মাছ বিক্রেতাকে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধা আবদুল সালাম টের পেয়ে আকা-বাঁকা জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় গিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী পাল পাড়ায় প্রবেশ করে অফিসংযোগ করে। তাতে দুজন বৃন্দা অগ্নিদণ্ড হয়ে নিহত হন।

রথখোলা গণহত্যায় নিহত যাদের নাম জান গেছে, তাঁরা হলেন-

১. বিশ্বনাথ দেব, (৪৫) রথখোলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. নগেন, (৩৫) রথখোলা, আগেলবাড়া, বরিশাল

৩. পরেশ, (৪০) রথখোলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. কেষ্ট পালের মা, (৫৫) রথখোলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. কৃষ্ণ পালের মা, (৬০) রথখোলা, আগেলবাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জারিপ বরিশাল জেলা।

গৈলা দত্তবাড়ি গণহত্যা

আগেলবাড়া থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গৈলা দত্তবাড়ি অবস্থিত। ১ মে দত্তবাড়িতে নির্মম গণহত্যা সংগঠিত হয়। গণহত্যাটি ‘দত্তবাড়ি গণহত্যা’ নামে পরিচিত হলেও দাসরাড়ি, বক্রী বাড়ির কয়েক জনও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। দেশীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় গৌরনদী আর্মি ক্যাম্প থেকে সকাল দশটার দিকে আর্মিরা হঠাতে করে দত্তবাড়িতে হাজির হয়। সেদিন রাজাকারেরা মিথ্যা কথা বলে উপস্থিত সকলকে বোবায় এলাকায় যাতে করে ডাকাতি-লুটপাট-নারী নির্যাতন না হয় সে জন্য গৌরনদীতে গিয়ে আলোচনা করতে হবে। সে সময় তারা যে সকল পুরুষদের বাড়িতে পেয়েছে তাদেরকে গাড়িতে তুলে গৌরনদীতে বধ্যভূমি নামে খ্যাত হাতেম পিয়নের বাড়ির উত্তর পাশে ঘাটলায় নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। ঐদিন সুরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে প্রভাবশালী হিন্দুকে নিয়ে যায়। সে উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারতো বিধার পূর্বে তাঁকে একবার ধরে নিয়ে একটি পরিচয় পত্র দিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে সেদিন আর তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। এ গণহত্যায় ১৪ জনের তথ্য পাওয়া যায়।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুনীল কুমার দাস বলেন-

দত্ত বাড়ির পাশে আমার মাসি বাড়ি। সেদিন আমাদের কয়েক জনের ঐবাড়িতে ডাব খেতে যাওয়ার কথা ছিল। কোনো এক কারণে যাওয়া হয়নি। সেদিন আগে ১১ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আরও ৩ জনকে ধরে নেয়। প্রথমে সিনিয়র কয়েক জনকে মিথ্যা বলে গৌরনদীতে নিয়ে, পরে তাঁদেরকে হত্যা করে। মৃত্যু প্রভাবশালী হিন্দুদের টার্গেট করে ধরে নিয়ে আমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে। আটককৃতদের গৌরনদীর হাতেম পিয়নের ঘাটলায় নিয়ে গুলি করে ও জবাই করে হত্যা করে। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তাদের সবার নাম জানা যায়নি।^{১০}

সেদিন যাঁরা নির্মম গণহত্যার শিকার হন, তাঁদের তালিকা (অসমাঞ্জ) নিম্নরূপ-

১. বিশ্বনাথ দত্ত, পিতা – সূর্য কান্ত দত্ত, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. সূর্য কান্ত দত্ত, পিতা – কালীকুমার দত্ত, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. শিবশংকর দত্ত, পিতা – নলীনি রঞ্জন দত্ত, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা – বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. উপেন দাস, পিতা – হরগোবিন্দ দাস, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. কালিচরণ দাস, পিতা – নিশিকান্ত দাস, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. নির্মল দাস, পিতা – কালিচরণ দাস, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. সুভাস দাস, পিতা – প্রভাত দাস, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. ভোলানাথ চন্দ, পিতা – উপেন্দ্রনাথ চন্দ, গৈলাৰ জামাই, জেলা - গোপালগঞ্জ, বরিশাল
১০. জীতেন বক্রী, পিতা – ললিত বক্রী, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১১. নান্তু চন্দ, পিতা – অজ্ঞাত, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. নাম না জানা কর্মচারী দুই জন

বাগদা দাসপাড়া গণহত্যা

আগেলবাড়া উপজেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাগদা গ্রাম অবস্থিত। বৃহত্তর এই গ্রামের একটি পাড়া ‘দাসপাড়া’ নামে পরিচিত। ১৬ জুন বিকেলের দিকে পাকসেনারা এখানে আক্রমণ করে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। গ্রামের মানুষ পাকসেনার উপস্থিতি টের পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য পাশের মুসলিম পাড়ায়, কেউ ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে। কিছু লোক বিলে আশ্রয় নিলে তাঁদেরকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। এই দিন কোটালীপাড়া থেকে বেড়াতে আসা তিন জন অতিথি পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এডভোকেট দেবদাস সমদার এ প্রসঙ্গে বলেন –

সেদিন পাক আর্মিরা বিকেল চারটার দিকে স্পিডবোটে করে ধীরেধীরে এসে বিভিন্ন দিকে মর্টার শেল মারে এবং গুলি করতে থাকে। আমি দূর থেকে দেখে জঙ্গলের দিকে ঢুকে পড়ি। সেখান থেকে লক্ষ্য করি তারা পূর্ব পাড়ে নেমে প্রথমে দেবেন চ্যাটার্জীর বাড়িতে যায়, তিনি হাত জোর করে পাক-আর্মিদের অনেক অনুনয় বিনয় করেন, কিন্তু তৎক্ষণাত্ম গুলি করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর আর্মিরা দুইশ গজ দূরে দাস বাড়ির রাস্তার পাশে মানিক দাসকে ধরে গাছের সাথে বেঁধে হত্যা করে। তাঁদের উভয়কেই মুখায়ি করে সমাধিষ্ঠ করা হয়। এরপর কৃষ্ণকান্ত ধূপী ও আমার ভাই সমুন্দু নাথ সমদার পাটের খেতে লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকে কৃষ্ণকান্ত ধূপীকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে। পরে আমাদের দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে আমাদের পুরোহিত সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জীকে হেনেড চার্জ করে পেট ফেরে দেয়। তিনি বাঁচার জন্য একটু জল চেয়েছিল, বিপ্লব সমদার একটু জল দেয়ার পরই মারা গেলেন।¹⁸

এভাবে মোট ১৫ জন নিহত হন। তাঁরা হলেন–

১. সুরেন ধূপী, (১৪) পিতা – নীলকান্ত ধূপী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. কৃষ্ণকান্ত ধূপী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. অমূল্য ধূপী, (৫৫) পিতা – কেদারী ধূপী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. সুধীর ধূপী, (২০) পিতা - কালীচরণ ধূপী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. হরিপদ ধূপী, (৪০) পিতা – লক্ষ্মীকান্ত ধূপী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. গণেশ ধূপী, (৬০) পিতা – বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. দেবেন চক্রবর্তী, (৫০) পিতা – অমৃত চক্রবর্তী, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. সুরেন মুখার্জী, (৬০) পিতা – বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. কেষ্ট শীল, (৩০) পিতা – কালীচরণ শীল, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. সতীশ সমদার, (৩৫) পিতা – মনোহর সমদার, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১১. কালু সমদার, (৪০) পিতা – দীনবন্ধু সমদার, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. রাইচরণ হুর, (৭০) পিতা – অমিক হুর, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৩. ললিত কীর্তনীয়া, (৬০) পিতা – কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৪. অনিল কীর্তনীয়া, (২৫) পিতা – ললিত কীর্তনীয়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৫. নরেন দাসের স্ত্রী, দাস পাড়া, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৬. নরেন দাসের শিশু পুত্র, দাস পাড়া, বাগদা, আগেলবাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।

রাজিহার গ্রামে গণহত্যা

রাজিহার একটি বার্ধক্যগ্রাম। এটি আগেলবাড়া উপজেলা কার্যালয় থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে ঐতিহাসিক কেতনার বিলের পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে গ্রামটি পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম

পাড়া নামে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত। একাধিকবার পাক হালদার বাহিনী এ গ্রামে আক্রমণ করে। পাকসেনারা ১৯৭১ সালের ১৫ মে রামসিদি, চাঁদশী, শিহিপাশা, রাংতা, কেতনার বিল প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা, লুঞ্চ, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ করতে করতে পূর্ব রাজিহারে আক্রমণ করে। সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করেন পূর্ব পাড়ার অধিবাসী প্রত্যক্ষদর্শী, পেশায় ব্যবসায়ী বর্ষীয়ান মানুষ রথীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বর্ণনা মতে—

ঐ দিন সকাল বেলা রাজিহার বাজারে আমার দর্জির দোকানে যাই। বেলা ১০ টার পরেমিলিটারি আগমনের খবর পাই। কিছুক্ষণ পরে পূর্বদিকে ঝোঁয়ার কুণ্ডলী ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি দৌড়ে আধা কিলোমিটার দূরে বাড়িতে আসি। অতি দ্রুত স্তৰী ও শিশু পুরুকে নিয়ে মাঠের মাঝখনে জলমগ্ন পাটক্ষেতে আশ্রয় নেই। ছোট ভাই অমলেন্দ্রনাথসহ আরও অনেকে পাটক্ষেতে লুকিয়ে থাকে। এসময় পাকসেনারা পাশের শিকারী বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। মিলিটারি ও তাদের দোসররা দত্ত বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট করে জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এরপর মিলিটারিদের একটি অংশ খালপাড় সংলগ্ন দত্ত বাড়িতে (বর্তমানে সামাদ মির্যার বাড়ি) আঙ্গন লাগিয়ে দেয়। পর্যায়ক্রমে তাঁরা লক্ষ্মী বোসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তারপর রাজাকারদের সহায়তায় দক্ষিণ পাশে হালদার বাড়ি ও শীল বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা এসময় শারীরিক প্রতিবন্ধী জীতেন সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে ঘরে আবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে নৃসংশ্লিষ্টভাবে হত্যা করে।^{১০}

মধ্য-রাজিহার খ্রিস্টানপাড়া গণহত্যা

স্থানীয় রাজাকার আফতাব মুসি ও জয়নাল মুসিসহ বেশ কয়েক জন দেশীয় দোসরদের সহায়তায় ১৭ জুন সোমবার দুপুরে পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার পাশে খ্রিস্টানপাড়ায় প্রবেশ করে। এই পাড়ার খ্রিস্টান ধর্মাবস্থাদের ধারণা ছিল পাকসেনারা অত্র এলাকায় প্রবেশ করলেও খ্রিস্টানদের মারবে না। পাকসেনারা মূলত হিন্দু এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে যাঁরা যুক্ত তাদেরকে টাগেট করে মারতে-ধরতে আসে। ইতঃপূর্বেও খ্রিস্টানদের হত্যার কোনো খবর তাঁরা পাননি, এ বিশ্বাসে কোনো নারী-পুরুষ পালাবার চেষ্টা করেননি। এমনকি মহিলাদের কাছে বাড়ির পুরুষদের কথা জিজ্ঞাসা করলেও নির্ধিধায় বলে দেয়। পুরুষরা পাকসেনাদের সামনে এসে বলে – বাংলার খ্রিস্টানরা পাকিস্তানের শক্র নয়। এ বিশ্বাসই ১৭ জুন ভুল প্রমাণিত হয়। আটকে যাওয়া স্পিডবোট সরানোর মিথ্যা কথা বলে ৯ জন খ্রিস্টান পুরুষকে ধরে নিয়ে ব্রাশফায়ার ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে। পাক-বাহিনী ৯ জনকে ধরে নিয়ে ব্রাস ফায়ার করলেও ভাগ্যক্রমে মুকুল হালদার ও সুকুমার হালদার গুলির সাথে সাথে শুয়ে পড়ে লাশের ভান করে প্রাণে রক্ষা পান।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ বিমল হালদারের স্ত্রী কমলা হালদার বলেন—

আমাদের বাড়িতে ক্রুশ টানানো থাকলেও দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাক সেনারা দুটি স্পিডবোট পঞ্চিম দিক থেকে এসে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে, ডাব খাওয়ার কথা বলে। বাড়ির পুরুষেরা ঘর থেকে বের হয়ে তাদের দুই কুড়ির মতো ডাব খাওয়ায়। তারপর তারা পুরুষদের বলে আমাদের সাথে পাশের গ্রামে যেতে হবে। আসার পথে স্পিডবোট আসতে সমস্যা হয়েছে তাই আমাদের এগিয়ে দিতে হবে। বাড়ির দুজন পুরুষ একাজে সহায়তার কথা বললেও তারা সকলকে নিয়ে বাকাল হাতে যায়। সেখানে তাঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। গুলির শব্দ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছি তাঁদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে আর্মিরা চলে গেলে বাকালের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে। বিকেলের দিকে নৌকায় করে তাঁদের লাশ নিয়ে এসে একত্রে কবর দেওয়া হয়।^{১১}

সোনিনের ঘটনায় নিহতরা হলেন-

১. বিমল হালদার, (৪০) পিতা - ভোলানাথ হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. স্যামুয়েল হালদার, (৪০) পিতা - গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. নরেন হালদার, (৪৫) পিতা - গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. জয়নাল হালদার, (৪২) পিতা - গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. পেকু হালদার, (৩০) পিতা - নরেন হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. টমাস হালদার, (২৫) পিতা - নরেন হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. অগাস্টিন হালদার, (২০) পিতা - নরেন হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. দানিয়েল হালদার, (২২) পিতা - নরেন হালদার, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. যোগেশ হালদার, (৩৫) পিতা - রেবেশ্বর হালদার, নওপাড়া, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. যোগিন্দ্র নাথ হালদার, (৩০) পিতা - রেবেশ্বর হালদার, নওপাড়া, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. জগদীশ রায়, (২০) পিতা - দুঃখীরাম রায়, রাজিহার, আগেলবাড়া, বরিশাল

পশ্চিম সুজনকাঠি গণহত্যা

পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামটি আগেলবাড়া উপজেলার পূর্ব পাশে অতি সান্নিকটে অবস্থিত। পাক-হানাদার বাহিনী গৌরনদী কলেজে ক্যাম্প তৈরি করার বেশ কিছু দিন পরে ২০ জুন আগেলবাড়ায় স্পিডবোট পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামে হামলা করে। তার কারণ হিসেবে জানা যায়, ভারতে নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল উক্ত গ্রামের মণ্ডি হালদার। সে সেখানে বসে বোমা তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সে বাংলাদেশে এসে বাড়ির উত্তর পাশের বাগানে বসে বোমা তৈরি করে রেখে আসে। তারপরে রাতে বৃষ্টি হয়। সে সকালে বোমাগুলো কেমন আছে তা দেখার জন্য যায়। হাতে ধরতেই প্রচঙ্গ শব্দ হয় এবং তাতে সে আহত হয়। এ খবর পুলিশসহ আশ-পাশের মানুষ জানতে পারলে গ্রামটি স্বাধীনতা বিরোধীদের টার্গেটে পরিণত হয়। তারপরে তাকে ধরে নিয়ে বাজারের একটি দোকানে আটকে রাখলে পেছনের দরজা খুলে খাল পাঢ় হয়ে সে পালিয়ে আবার ভারতে চলে যায়। পরবর্তীতে বোমা তৈরির বিষয়টি পাকিস্তানি আর্মিরা জানতে পেরে পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামে হাজির হয়ে থামক্ষণ বাড়েকে ধরে গুলি করে হত্যা করে। তারপর সামনে যাকে পায় তাকেই ধরে। কাঠিরা নিবাসী নেপাল মণ্ডল (পিতা -বিপিন মণ্ডল) তার ভয়িপতি সনাতন রায়ের বাড়িতে বেড়াতে আসলে তাকেও আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। এভাবে রায় বাড়ি, হালদার বাড়ি, বাড়ে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আট জনকে ধরে নিয়ে যায়। সোনিনের ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করেন উক্ত গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কলেজ শিক্ষক বাবু রঞ্জিত বাড়ে। তাঁর বর্ণনা মতে-

ঘটনার দিন বিকাল বেলায় প্রচঙ্গ বৃষ্টির মধ্যে রাজাকারদের দেখানো পথে তাঁদেরকে ধরে গৌরনদী ব্রিজের পাশে গয়না ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সবাইকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করলে নেপাল মণ্ডল খালে পড়ে গিয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। সে কিছু দূর খালের জলে ভাসতে ভাসতে আসলে স্থানীয় লোকজন উদ্বার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বাকির সবাই নিহত হন।^{১১}

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নিতাই রায়কে যখন পাকিস্তানী আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। তখন তাকে ছাড়িয়ে আনতে তার পিতা সুরেন রায় পাকিস্তানী আর্মির অনেক অনুনয়-বিনয় করে পা জড়িয়ে ধরেন, তারপরও তার ছেলেকে না ছাড়ায় কেঁদে কেঁদে পিছন পিছন দৌড়ে যান স্পিড বোটের কাছে। তখন সাথের এক রাজাকার বলে ‘বুইরগা যহন আইছে তহন ওডারেও লন’ (বৃদ্ধ যখন আসছে তাই একেও নিয়ে চলেন)। এর কিছু দিন পরে শোনা গেল বর্তমান

চি.এন. চি অফিসের কাছে ফলিয়া বাড়ি যেতে যে পুলটি তৎকালীন সময়ে যেটি ছিল একটি বাঁশের সাকে এর নিচে ভেসে-ভেসে এসে সুরেন রায়ের লাশ বেঁধে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আগেলবাড়ার অনেক হিন্দু পরিবারগুলো তাত সন্তুষ্ট হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন।

সেদিনের ঘটনায় যারা নিহতরা হলেন-

১. সুরেন রায়, পিতা - গোপাল রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. নিতাই রায়, পিতা - সুরেন রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. নিমল বৈরাগী, পিতা - ব্রজেন্দ্র নাথ বৈরাগী, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. নারায়ণ চন্দ্র রায়, পিতা - উমেশ চন্দ্র রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. রাজকুমার বাড়ো, পিতা - লক্ষণ বাড়ো, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. নারায়ণ হালদার, (পাত্র), পিতা - অনন্ত হালদার, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. বসন্ত রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগেলবাড়া, বরিশালবাবুরাম, রাহতপাড়া, আগেলবাড়া, বরিশাল

এছাড়া আগেলবাড়ার পাকসেনা ও দেশীয় রাজকারদের প্রতিহত করতে গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মানের শিকার নিম্নোক্ত শহিদেরা-

১. সেনা সদস্য আলাউদ্দিন, পিতা - আব্দুল হাসেম সরদার, গৈলা, আগেলবাড়া, বরিশাল
২. মোস্তফা হাওলাদার, পিতা - ফেলু চৌকিদার, উত্তর শিহিপাশা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৩. নুরুল ইসলাম, পিতা - কাসেম হাওলাদার, দক্ষিণ শিহিপাশা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৪. সেনা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, পিতা - বলু সেপাই, সেরাল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৫. মান্নান মোল্লা, পিতা - রওসেন মোল্লা, মধ্য শিহিপাশা, আগেলবাড়া, বরিশাল
৬. আব্দুল মান্নান খান, পিতা - আদরী খান, ভালুকশী, আগেলবাড়া, বরিশাল
৭. গোলাম মাওলা, পিতা - মুসি মতিউর রহমান, বাশাইল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৮. সেকেন্দার আলী বেপারী, পিতা - শাহমদ্দিন, ছেট বাশাইল, আগেলবাড়া, বরিশাল
৯. আব্দুল হক হাওলাদার, পিতা - ফয়জোর আলী হাওলাদার, বসুন্দা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১০. আব্দুল আজিজ সিকদার, পিতা - হাসান উদ্দিন, বাশাইল, আগেলবাড়া, বরিশাল
১১. সামসুল হক, পিতা - খাদেম আলী, পয়সা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১২. ইপিআর সদস্য মনসুর আহমদ আকন, পিতা - ইমাম আকন, ফুলশ্রী, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৩. তৈয়ব আলী বক্তিয়ার, পিতা - ইউসুফ আলী বক্তিয়ার, চাতৌশিরা, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৪. কাজি আব্দুল সালাম, পিতা - আব্দুস সাত্তার, বেলুহার, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৫. ফজলুল হক হাওলাদার, পিতা - হোসেন হাওলাদার, রত্নপুর, আগেলবাড়া, বরিশাল
১৬. ইপিআর সদস্য মহশিন আলী, পিতা - আব্দুল আজিজ, বরিয়ালী, আগেলবাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।

গণকবর পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় বরিশাল জেলার আগেলবাড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে লাশ ফেলে যায়। পরে স্থানীয় জনগণ লাশগুলো একত্রিত করে গণকবর দেয়। বরিশাল জেলায় মোট একত্রিশটি গণকবর রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি রয়েছে আগেলবাড়া উপজেলায়। সরকারিভাবে গণকবরগুলো চিহ্নিত না হলেও সাধারণ লোক মুখে ছয়টি গণকবরের কথা আলোচিত হয়ে আসছে। সেগুলো হলো—

১. কেতনার বিলে কাশীনাথ পাত্র বাড়ি গণকবর
২. কেতনার বিলে মাখন পাত্র বাড়ি গণকবর
৩. রাংতা বেপারী বাড়ি গণকবর
৪. কাঠিরা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গণকবর
৫. রাজিহার প্রিস্টান পল্লী গণকবর
৬. বাগদা দাসপাড়া নীলকান্ত ধূপী বাড়ি গণকবর
৭. বাগদা দাসপাড়া নারায়ণ ধূপী বাড়ি গণকবর

১. কেতনার বিলে গণকবর

রাংতা গ্রামের কেতনার বিলের মধ্যে পাত্র বাড়িতে বরিশাল জেলার সবচেয়ে বড় গণকবর রয়েছে। বিলের পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে হাজার হাজার জনতা নিরাপদে থাকার জন্য কেতনার বিলে আশ্রয় নেয়। তখন জ্যৈষ্ঠমাসে আউশ-আমন ধানের ক্ষেতে হাঁটু সমান জল পেড়িয়ে দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি আর্মিরা নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। গণহত্যার তৃয় দিনেও লাশ সংকার করা হয়নি। ৪৪ দিনে শহিদদের লাশ গণকবর দেয়কেতনার বিলের বাসিন্দা হরলাল পাত্র, তাঁর তিন পুত্র সুনীল চন্দ্র পাত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাত্র, মদনমোহন পাত্র। এছাড়া অমূল্য পাত্র, রাজেন পাত্র, মনীন্দ্র পাত্র, রাধাকান্ত পাত্র, ধীরেন বিশ্বাস ও নীলকান্ত বৈদ্য প্রমুখ পাত্র বাড়ির উত্তর পাশে সাতটি গর্ত করে। এদের মধ্যে অন্যতম সুনীল চন্দ্র পাত্র বলেন—

গণহত্যার তিন দিন পর ৪৩ জ্যৈষ্ঠ বিশ-পঁচিশ জন লোক মিলে পাঁচ জন করে কবর দেওয়ার প্রস্তুতি নেই। একটা লাশের ওজন এত বেশি যে চার জন মিলে ধরে কবরে আনতে হয়। দেখি মহিলাদের লাশে কাপড় পর্যন্ত নাই। মৃত্যুর পরে বিলের মধ্যে রাজাকারদের তাওব শুরু হয়। তারা মহিলাদের সোনা-গহনা ও কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে যায়। লাশে প্রচণ্ড গন্ধ হওয়ার ধরার উপায় ছিল না। তখন পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে কেরোসিন মেখে নাকে ঢুকিয়ে ৩৫ টি লাশ কবর দেই। আর শত শত লাশ বিলের মধ্যে হাঁটু সমান জলে পড়ে থাকে। যা পরে শিয়াল-কুকুর আর শুকনের খাবারে পরিণত হয়।»

কেতনার বিলের গণহত্যার স্মৃতি অস্থান রাখার জন্য ২০২২ সালে সরকারের পক্ষ থেকে চৌক্রিক লক্ষ টাকা ব্যয় করে এখানে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সেই সাথে পাকা রাস্তা নির্মাণ করে যোগাযোগের সুব্যবস্থা করা হয়। এতে অত্র এলাকার জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হয়েছে। তবে যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের নাম এখনও গেজেটভুক্ত হয়নি, পরিবারসমূহও পায়নি শহিদ পরিবারের স্বীকৃতি।

২. কেতনার বিলে মাখন পাত্র বাড়ি গণকবর

দক্ষিণ বাংলার সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনা ঘটে কেতনার বিলে। ১৫ মে দুপুরের দিকে এই গণহত্যা সংঘটিত হয়। কেননা কেতনার বিল নিরাপদ আশ্রয় মনে করে পূর্ব উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে হাজার হাজার লোক আশ্রয় নেয়। পাক-আর্মিরা তাদেরকে পাখির মতো গুলি করে

হত্যা করে। যে সমস্ত লাশ মাখন পাত্রের বাড়িসহ আশ-পাশে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে, সেগুলো এই বাড়ির পশ্চিম পাশে গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণকবর সম্পর্কে অমূল্য পাত্র বলেন – গণহত্যার তিন দিন পর সুনীল পাত্র, প্রাণ পাত্র, কেষ্ট পাত্র, রামসিদ্ধির ভুলু সিকদারের ছেলে দুলা সিকদার ও চাঁদশীর কৃষ্ণকান্ত বাড়ে ও তপন গৌর আমরা একত্রে মিলিত হয়ে কবর দিতে চেষ্টা করি। কবর দেওয়ার সময় প্রত্যক্ষ করি বেশিরভাগ লাশে কাপড় পর্যন্ত নাই। শিয়াল, কুকুর, শুকুন লাশগুলো খাচ্ছে ও মারাত্মক দুর্ঘন্ত ছড়াচ্ছে।»

৩. রাংতা বেপারী বাড়ি গণকবর

১৪ মে পাক আর্মিরা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে গৌরমন্দী উপজেলার বাকাই ও দোনারকান্দি গ্রামে আক্রমণ করতে শিয়ে চার জন জনতার হাতে মারা যায়। ১৫ মে প্রতিশোধের নেশায় পাক-আর্মিরা টরকী, কসবা, রামসিদ্ধি, চাঁদশীসহ বিভিন্ন গ্রামে ঘড়-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও গণহত্যা করতে করতে পশ্চিম দিকে আসতে থাকে। প্রাণের ভয়ে মানুষ বিলাঘঁটলের দিকে আশ্রয় খোঁজে। কসবা থেকে রাজিহার পর্যন্ত গ্রামীণ মেটো রাস্তায় পাক-আর্মিরা এগুতে থাকে। রাস্তার আশ-পাশে যত লোক পায় তাঁদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। তখন বেপারী বাড়ির চারদিকে অনেক লোক নিহত হন। তাদের লাশগুলোকে গণকবরে সমাহিত করা হয়। শহিদদের লাশ গণকবর দেয় রাংতা বেপারী বাড়ির বাসিন্দা রূপচাঁদ বেপারী, তাঁর ছেলে অনিল বেপারী, কার্তিক বেপারী, বেপারী বাড়ির উত্তরের বাসিন্দা হানিফ খলিফা, লাশের অভিভাবক টরকীর ব্যবসায়ী নিমাই চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের মধ্যে অন্যতম অনিল বেপারী এই গণকবর সম্পর্কে বলেন–

গণহত্যার তিন দিন পর আমরা সারে চার হাত গভীর, সাত হাত লম্বা ও পাশে ছয় হাতের মতো গর্ত করে উনিশ জনকে একত্রে করব দেই। কবর দেওয়ার সময় বেশিরভাগ লাশই ছিল অর্ধ গলিত, পেট থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি বের হওয়া, গদ্দে বাম আসত। মৃত মহিলাদের সাথে সোনার গহনা ছিল সেগুলো এক শ্রেণির লোকেরা লুট করে নিয়ে যায়। টরকীর নিমাই চক্রবর্তীর পরিবারের চার জন সদস্য শহিদ হন যে ঘটনাটি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক।»

৪. কাঠিরা ব্যাস্টিট চার্ট গণকবর

আগৈলবাড়া উপজেলার কাঠিরা, জোবারপাড়, আশকর গ্রামে পাকিস্তানি আর্মিরা ১৯৭১ সালের ৩০ মে গণহত্যা চালায়। এ হত্যায়জ্ঞ কাঠিরা গণহত্যা নামে পরিচিত। স্থানীয় রাজাকার প্রফুল্ল অরিন্দার (খ্রিস্টান সম্প্রদামের লোক) দেখানো পথে পাকিস্তানি আর্মিরা এ এলাকায় প্রবেশ করে। সাধারণ জনগণের তথ্য মতে এখানে প্রায় অর্ধশত লোক হত্যা করা হয়। মাইকেল অধিকারীর নির্দেশে শহিদদের লাশগুলো পল অধিকারী, নিত্য মঙ্গল, অধীর বৈরাগী, তিমু অধিকারী, বরুণ ব্যানার্জী ও জয়ন্ত অধিকারী কাঠিরা ব্যাস্টিটচার্টের পাশে গণকবর দেয়। হিমু অধিকারীর বর্ণনানুসারে–

৩০ মে কাঠিরা এবং আশ-পাশের এলাকায় ব্যাপক গণহত্যার পরে স্থানীয় রাজাকারেরা লাশগুলো কবর দিতে নিষেধ করে। তাই ওদিন আর কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ৩১ মে সকাল থেকে বড় গর্ত করা হয় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে লাশগুলো আনা হয়। কেউ আত্মরক্ষার্থে পাট ক্ষেতে, কেউ বোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে ছিল, সেখানে গিয়েও পাক-আর্মিরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে। লাশগুলো সমাহিত করার জন্য দুই-তিন জন ধরাধরি করে এনে দুপুর পর্যন্ত গণকবরে আনা হয়।»

৫. রাজিহার খ্রিস্টান পল্লী গণকবর

আগৈলবাড়া উপজেলা থেকে উত্তর দিকে রাজিহার গ্রামে খ্রিস্টান পল্লীতে পাকিস্তানি আর্মিরা নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। খ্রিস্টান পল্লী থেকে পাকিস্তানি আর্মিরা নয় জনকে পার্শ্ববর্তী হাম

বাকাল হাটে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে ব্রিজের উপর নিয়ে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ত্রাশফায়ার করে। ভাগ্যক্রমে মুকুল হালদার এবং সুকুমার হালদার নামে দুই জন বেঁচে যান। এই লাশগুলোকে রাজিহার খ্রিস্টান পাড়ায় গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণকবর সম্পর্কে শহিদ পরিবারের সদস্য শহিদ স্যামুয়েল হালদারের স্ত্রী মারিয়া হালদার বলেন— ঐদিন ২৩ আষাঢ় বিকেলে ফ্রান্সিস হালদার, পিটার হালদার, খোকন গোলদার ও অতুল বালার নেতৃত্বে বেশ কয়েক জন মিলে লাশগুলো নৌকায় করে এনে আমাদের হালদার বাড়িতে বড় কবর তৈরি করে একত্রে সমাহিত করা হয়।^{১১}

৬. বাগদা দাসপাড়া নীলকান্ত ধূপী বাড়ি গণকবর

১৯৭১ সালের ১৬ জুন পাকসেনারা এখানে বেলা ৩টার দিকে আক্রমণ করে গণহত্যা চালায়। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকা মানুষকে ধরে এনে গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ মাঠের মধ্যে ধান ক্ষেতে লুকিয়ে ছিল, তাদেরকে ত্রাশফায়ার করে নির্বিচারে হত্যা করে। এই গ্রামে সেদিন কোটালীপাড়া থেকে বেড়াতে আসা তিন জন অতিথিও পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়। পাক-আর্মির মোট পনেরো জনকে সেদিন হত্যা করে। হত্যার পর গণকবর দেওয়ার সময় নিকটে বসে প্রত্যক্ষ করেন কালিপদ ধূপী ও বিমল চন্দ্ৰ ধূপী। আপন ভাই নিহত হওয়ায় শোকে কবর দেওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। বিমল চন্দ্ৰ ধূপীর বর্ণনানুসারে—

গণহত্যার দিন কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি তাই পরের দিন ১৭ জুন সকালের দিকে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐদিনই আবার মিলিটারি আসার খবর লোকমুখে শুনতে পাই। সে অনুসারে কয়েক জন মিলে দাসপাড়ায় নীলকান্ত ধূপীর বাড়ি কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নীলকান্ত ধূপীর বাড়ির পূর্ব পাশের পুকুর পাড়ের উত্তর-পূর্ব কোনে বেলা ১১ টার দিকে দুই-তিন হাত গতীর গর্ত করে মুখে আঙুল দিয়ে নীলকান্ত ধূপী, সুবল ধূপী, বিলাশ ধূপী, কার্তিক ধূপী, জোনা ধূপী ও বলাই ধূপীসহ বেশ কয়েক জন অংশগ্রহণ করেন। এ কবরে সুরেন ধূপী (১৪), (পিতা - নীলকান্ত ধূপী) ও অমূল্য ধূপীর, (৫৫) (পিতা - কেদারী ধূপী) লাশ কবর দেওয়া হয়।^{১২}

৭. বাগদা দাসপাড়া নারায়ণ ধূপী বাড়ি গণকবর

১৯৭১ সালের ১৬ জুন পাকসেনারা এখানে বেলা ৩ টার দিকে বাগদা দাসপাড়ায় গণহত্যা চালায়। বাগধা দাস পাড়ায় গণহত্যায় যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের কতিপয় শহিদের লাশ নীলকান্ত ধূপীর বাড়ি গণকবরে সমাহিত করা হয়ে এবং কয়েক জন শহিদকে নারায়ণ ধূপীর বাড়ি গণকবরে সমাহিত করা হয়। এ সম্পর্কে কালিপদ ধূপী বলেন—

১৬ জুন গণহত্যার পরের দিন ১৭ জুন নারায়ণ ধূপীর বাড়ির দক্ষিণে (ছাড়া বাড়ি নামে খ্যাত) বেলা ১২ টার দিকে মজিদ হাওলাদার ও শ্যাম মাঝিসহ কয়েক জন মিলে শহিদ হরিপদ ধূপী, (পিতা - লক্ষ্মীকান্ত ধূপী) ও গণেশ ধূপীর লাশ কবর দেওয়া হয়। খুব তারালোরে করে কবর দেওয়া হয়, কেননা ঐদিনই আবার মিলিটারি আসার কথা ছিল। আর দেবেন চক্রবর্তী ও সুরেণ মুখাজ্জীর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।^{১৩}

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বর্তমান প্রবক্ষে প্রাণ ফলাফলের নিম্নরূপ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়:

- (ক) মহান মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক তথ্য উৎঘাটিত হয়েছে।
- (খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আগৈলবাড়ার গণহত্যা ও গণকবরের সন্ধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সন্নিবেশ করবে।
- (গ) বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম অবদান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
- (ঘ) তরুণ প্রজন্য দেশপ্রেমে জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

উপসংহার

আগেরবাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনার ও হৃদয়স্পন্দনী। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য বিশ্লেষণ করে ১৩টির মতো গণহত্যার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে আরও বেশি ঘটেছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর এই ব্যথা-বেদনার অন্তর্নিহিত চিত্র তুলে ধরা খুবই কঠিন। কেননা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সকল স্থানে এতো বছরেও স্মৃতিস্তুতি তৈরি হয়েন। এখন পর্যন্ত মাত্র ৪টি স্থানে স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শহিদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েন। ঐতিহাসিক কেতনার বিলে যেখানে এক থেকে দেড়হাজার লোক শহিদ হয়েছেন, সেখানে মাত্র ৬২ জন শহিদের নামফলক রয়েছে। কোদালধোয়ার গণহত্যার স্মৃতিস্তুতি কোনো তালিকাই দেওয়া হয়েন। এমনকি কাঠিরার স্মৃতিস্তুতি শহিদদের শুধু নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের পিতার নামসহ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টুকুও দেওয়া হয়েন। নতুন প্রজন্মের কাছে মহান স্বাধীনতার এই বার্তা পৌছে দিতে হলে স্মৃতিস্তুতি নির্মাণ করে প্রকৃত ইতিহাস উপস্থাপন করতে হবে এবং বিশদভাবে গবেষণা করে এর প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। স্বাধীনতার রণাঙ্গনে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের গৌরবময় জীবনালেখ্য অনেক বেশি হৃদয়ে ধারণ করার বিষয়। দুঃখের বিষয় হলো ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং তাঁর আত্মায় আগেলবাড়ার জনপ্রিয় নেতা আব্দুর রব সেরিনিয়াবাতকে হত্যার মাধ্যমে সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে দেয়া হয়েন। শুধু এটুকু বলা যায় সে, বীর শহিদেরা জীবন দিয়ে লিখে গেছেন বাংলাদেশের নাম, আগেলবাড়ার নাম। সেদিনকারের ঘটনা না দেখলেও বর্ণবদ্ধ করতে গিয়ে অশ্রুবাস্পে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, বুকের মধ্যে রক্তকরণ হয়। ১৯৭১ সালে আগেলবাড়ায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর গণহত্যা হয়েছিল আগেলবাড়ার কেতনার বিলে। এখানে পাকিস্তানি আর্মিরা ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা ও লুটতরাজ চলায়। আগেলবাড়া উপজেলাটি আয়তনে ছোট হলেও এখানে যেভাবে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তাতে প্রায় তিন হাজার লোক শহিদ হয়েছেন। আর যারা আহত হয়েছেন তাঁরা ক্ষতিচিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছেন। কেউ-বা বার্ধক্যে এসে অসুস্থ হয়ে মানবেতরভাবে জীবন অতিবাহিত করছেন। অনেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেননি। অনেক শহীদ পরিবার তাঁদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের নামটি গেজেটভুক্ত করাতে পারেননি, পাননি শহীদ পরিবারের স্বীকৃতি, পাননি কোনো ভাতা। স্বজনহারা পরিবারগুলো এখনও নিরবে-নিভৃতে চোখের জল ফেলছেন। ধর্মিতা মা-বোনেরা সাহস করে তাঁর কষ্টের কথাগুলো বলতেও পারছেন না। অনেকে ধ্বংসস্তুপ হয়ে যাওয়া ঘড়-বাঢ়িগুলো এখনও ঠিকমতো তুলতে পারেননি। কেউবা দেশের কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন – এই কি তার স্বাধীন স্বদেশ! সময়ের বিবর্তনে দুঃসময়ের স্মৃতিগুলো ফিকে হয়ে আসলেও ক্ষতিগুলো এখনও দগ্দগে। বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা বান্ধব সরকারের নানামুখী উল্লয়নমূলক কার্যক্রমের উপর ভর করে নতুন ভোরের আশায় বুক বাঁধছেন মানবেতরভাবে জীবনযাপন করা এসব দেশপ্রেমী মানুষগুলো। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, স্বাধীনতার এতো বছর পর যে সকল গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা ও সাধারণ জনতা মিলে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষদের সমাধিস্থ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নিহতদের গণকবরে সমাহিত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য বর্তমান সরকার দুটি গণকবরে স্মৃতিস্তুতি নির্মাণ করে দিয়েছেন। রাজিহারে মিশনারী কর্তৃক একটি স্মৃতিস্তুতি নির্মাণ করা হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকটি গণকবরে স্মৃতিস্তুতি নির্মাণ করা হয়েন। স্থানীয় সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগণ শহিদদের অমর স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিস্তুতি নির্মাণ ও স্বীকৃতি বিহীন মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জোর দাবি জানান।

তথ্যনির্দেশ

১. হাকন-অর-রশিদ, (প্রধান সম্পাদক), বাংলাদেশ মুভিয়ুদ্দ জ্ঞানকোষ, (১ম খণ্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৯৭
২. সাক্ষাৎকার: তালুকদার মোঃ ইউনুস, পিতা - মোঃ শহর আলী তালুকদার, সাবেক সংসদ সদস্য, বরিশাল - ১, ৫ জুলাই ২০২৪
৩. সাক্ষাৎকার: আব্দুর রইচ সেরানিয়াবাত, পিতা - সেকেন্দার আলী সেরানিয়াবাত, উপজেলা চেয়ারম্যান, আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১৮ এপ্রিল ২০২৪
৪. অজয় দাশগুপ্ত, একান্তরের ৭১, আগামী প্রকাশনী, ভূতায় বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৭-৭৮
৫. সাক্ষাৎকার: রাজেন্দ্রনাথ পাত্র, পিতা - কাশিনাথ পাত্র, গ্রাম - রাংতা (কেতনার বিল), উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৬ এপ্রিল ২০২৪
৬. সাক্ষাৎকার: দীনেশ চন্দ্ৰ হালদার, পিতা - গুৰুদাস হালদার, গ্রাম - কাঠিরা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৯ ডিসেম্বর ২০২৩
৭. সাক্ষাৎকার: হরেকৃষ্ণ রায় পলাশ, পিতা - পুলিন রায়, গ্রাম - বাকাল, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৬ এপ্রিল ২০২৪
৮. সাক্ষাৎকার: সুনীল চন্দ্ৰ সুনীল সরকার, পিতা - সিদ্ধেশ্বর সরকার, গ্রাম - কোদলধোয়া, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৯ ডিসেম্বর ২০২৩
৯. সাক্ষাৎকার: সাবিত্রী বেপারী, পিতা - স্বামী - অনিল বেপারী, গ্রাম - রাংতা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৬ এপ্রিল ২০২৪
১০. সাক্ষাৎকার: সেকান্দার মৃধা, পিতা - হাছেন মৃধা, গ্রাম - শিহিপাশা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২৩
১১. সাক্ষাৎকার: নারায়ণ নাগ, পিতা - বিপিন বিহারী নাগ, গ্রাম - পতিহার, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২৩
১২. সাক্ষাৎকার: সিরাজুর হক সরদার, পিতা - মোঃ আবদুল কাদের সরদার, গ্রামঃ পূর্ব সুজনকাঠি, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৯ মার্চ ২০২৪
১৩. সাক্ষাৎকার: সুনীল কুমার দাস, পিতা - নলিনী রঞ্জন দাস, গ্রাম - শিহিপাশা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২৩
১৪. সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার: এডভোকেট দেবদাস সমদার, পিতা - শান্তি রঞ্জন সমদার, গ্রাম - বাগধা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২২
১৫. সাক্ষাৎকার: রথীন্দ্রনাথ দত্ত, পিতা - অবনীমোহন দত্ত, গ্রাম - শিহিপাশা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৪ নভেম্বর ২০২৩
১৬. সাক্ষাৎকার: কমলা হালদার, স্বামী - শহীদ বিমল হালদার, গ্রাম - রাজিহার, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৪ নভেম্বর ২০২৩
১৭. সাক্ষাৎকার: রণজিৎ বাড়ে (৭১), পিতা - বিশেষ্যের বাড়ে, গ্রাম - পশ্চিম সুজনকাঠি, ইউনিয়ন - গৈলা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১৯ এপ্রিল ২০২৪
১৮. সাক্ষাৎকার: সুনীল চন্দ্ৰ পাত্র, পিতা - হৰলাল পাত্র, গ্রাম - রাজিহার, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪
১৯. সাক্ষাৎকার: অমূল্য পাত্র, পিতা - কাশিনাথ পাত্র, গ্রাম - রাংতা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪
২০. সাক্ষাৎকার: অনিল বেপারী, পিতা - রূপচাঁদ বেপারী, গ্রাম - রাংতা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪
২১. সাক্ষাৎকার: হিমু অধিকারী, পিতা - সমীর অধিকারী, গ্রাম - কাঠিরা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪

২২. সাক্ষাৎকার: মারিয়া হালদার, স্বামী - শহিদ স্যামুয়েল হালদার, গ্রাম - রাজিহার, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ১২ এপ্রিল ২০২৪
২৩. সাক্ষাৎকার: বিমল চন্দ্র ধূপী, পিতা - নীলকান্ত ধূপী, গ্রাম - বাগদা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৬ মে ২০২৪
২৪. সাক্ষাৎকার: কালিপদ ধূপী, পিতা - নীলকান্ত ধূপী, গ্রাম - বাগদা, উপজেলা - আগেলবাড়া, জেলা - বরিশাল, ৬ মে ২০২৪

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র: ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১৯৮২
- হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র: ৩য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১৯৮২
- সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, বরিশাল বিভাগের মুক্তিযুদ্ধ, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
- মনিকুজ্জামান শাহীন, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা, গণহত্যা-নির্ধারণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্ধারণ আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯
- লুলু আল মারজান, কেতনার বিল গণহত্যা, গণহত্যা-নির্ধারণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্ধারণ আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০২৩
- হিমু অধিকারী, কাঠিরা গণহত্যা, গণহত্যা-নির্ধারণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্ধারণ আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪
- বীর মুক্তিযোদ্ধা কে. এম. শামসুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আগেলবাড়া, বরিশাল, ২০১৫
- বদর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, বধ্যভূমির পথে পথে, বেগবতী প্রকাশনী, বিনাইদহ, ২০২৩
- প্রেমানন্দ ঘৰামী, নিউজ টাইম, নেই স্মৃতিসৌধ: মেলেনি শহীদের স্মৃতি, বরিশাল, ২০০৯
- কলম সেনগুপ্ত, আজকের পরিবর্তন, কেতনার বিল বধ্যভূমি: শিশু শহীদ অমৃতর কথা, বরিশাল, ২০২৩
- কালিদাস ভক্ত, আগেলবাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: কেতনারবিলে গণহত্যা প্রসঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ৩৫তম সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ২০২০
- মনিকুজ্জামান শাহীন, বরিশাল ৭১: গণহত্যার ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি, ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭, ঢাকা, ২০১৮

Role of Women Entrepreneurs in Handicraft Small Enterprises and Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh

Dr. Salma Begum¹, Moniruzzaman²

Abstract

Women's empowerment is a key factor in achieving sustainable economic and social development. As a result, promoting entrepreneurship and self-employment through innovation and multidimensional training in our country is necessary. This study aimed to determine the factors that motivate women to become entrepreneurs, the types of institutional barriers that hinder women's entrepreneurship in the handicrafts business and to identify how women's entrepreneurship supports achieving Sustainable Development Goals (SDGs). The study was conducted in Delduar Upazila under the Tangail District of Bangladesh. The participants of the study were women entrepreneurs who are directly involved with handicraft small enterprises business. For the study, the total sample size was 105. Quantitative data was gathered with the help of an interview based on a structured questionnaire. Moreover, for qualitative data, case studies, FDG and KII were conducted based on a checklist of key questions. It has been found that the main causes of becoming an entrepreneur are social status, the economic situation of the family, the opinion of the husband, own wishes etc. The study has identified some major challenges that women entrepreneurs face such as fewer opportunities for training for women entrepreneurs, the high interest rate for receiving new loans from banks and NGOs, poverty, local people's attitudes towards female participation in business, fewer marketing opportunities, lack of knowledge to get finance, lack of credit, lower social status, religious superstitions, etc. So, the government needs to take a more comprehensive policy decision to promote women entrepreneurs by providing better credit facilities, ensuring marketing opportunities, and good working conditions. Additionally, financial institutions should provide more loans with easy terms and conditions for female entrepreneurs to run smaller enterprises.

Key words: Women Entrepreneurs; Employment; Small and Medium Business Ownership, Self Employment.

-
1. Professor, Department of Sociology, University of Dhaka.
Email: sociodu2013@gmail.com
 2. Lecturer, Willes Little Flower School and College.
Email:mukul.math@yahoo.com

DOI: <https://www.doi.org/10.62272/JS.V14.A13>

Introduction

The development of women's entrepreneurship generally depends on the prevailing socio-economic and cultural background of the social structure. Bjerke stated that entrepreneurship has been approached from various perspectives by scholars of different disciplines, including economics, sociology, psychology, anthropology, history, and political science (Bjerke, 2007). Sultana (2006) agrees all developments cannot be achieved without women's participation in the development sectors of the country. The handicraft industry in Bangladesh provides huge employment opportunities for poor and vulnerable women in society. Presently the government of Bangladesh has given particular importance to ensuring women's participation in the formal economic sector, especially in the handicrafts small enterprise sector and attain SDGs 1 (No Poverty), SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth) and SDGs 5 (Gender Equality).

Although diverse innovative programs have been taken by various organizations of government, the level of women's engagement in the area of handicrafts small enterprises is still not adequate. Women entrepreneurs face gender discrimination to start and expand their businesses. Women face problems and challenges in being entrepreneurs due to family issues, societal pressure, lack of technical know-how, less self-confidence and mobility constraints (Gaur Mamta 2020). Hisrich and Brush stated that women entrepreneurs make a substantial contribution to national economic growth through their participation in start-ups and their growth in small and medium businesses. But the operation of women's entrepreneurship involves substantial, hard work, huge sacrifice and sincerity. The risks, challenges and obstacles affect women entrepreneurs more than their male counterparts, making their chances of success considerably lower than men (Hisrich and Brush, 1986). Hossain and Rahman, (1999), Afrin et al (2008), and Tambunan (2009) argue that in Bangladesh women are victimized more because of their illiteracy, deprivation, lack of knowledge, unorganized, powerless or less political representation, rigid social customs, and injustice by their counter partners. Adki (2014) stated that women's entrepreneurship is a very crucial factor for achieving sustainable economic growth, social development and women empowerment. Another study by Meunier et al (2017) proposed that the elimination of disparities from legal, social, educational, financial and other sectors will alleviate the gender gap for women entrepreneurs. This can eventually assist in achieving the Sustainable Development Goal (SDGs 5) that addresses all forms of discrimination against women and girls (Meunier, Krylova & Ramalho, 2017).

At present the cross-cutting issues taken by the Bangladesh government at the national level are sustained economic growth, reduction of poverty and inequality, earning more foreign currency through exports of goods, and creation of job opportunities for the youth and disadvantaged groups of society. In this line, the handicrafts small enterprise in Bangladesh is a key driver of economic growth because the Bangladeshi handicrafts industry is highly labour intensive. Bangladesh's handicrafts promise to increase not only foreign currency earnings through exports but also women empowerment. The workers of handicraft small enterprises are mainly un-skilled women, disadvantaged groups and children of our society. So, to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) of 2030, transformational economic growth, generation of more employment, alleviation of poverty and smooth and sustainable development the engagement of women entrepreneurs in the handicrafts industry has to increase. The aim of this study was to determine the factors that inspire women to become entrepreneurs, the types of challenges that are faced by women entrepreneurs in the handicrafts business and to identify the role of women entrepreneurs in achieving Sustainable Development Goals (SDGs).

Methodology

Study Sites

The study was conducted in Pathorail and Nolshoda village of Delduar Upazila under the Tangail District of Bangladesh. The participants of the study were women entrepreneurs who were directly involved with handicraft small enterprise businesses, small businessmen, traders, and other relevant populations.

Sampling and Data Collection

In total 105 samples were purposively selected to collect quantitative information. Purposive sampling involves selecting participants based on specific criteria that are relevant to the research question and objectives. For qualitative data, 12 case studies were followed by the stakeholders based on a checklist of key questions. To enrich the qualitative data, 4 Focus Group Discussions (FGDs), and 5 Key Informant Interviews (KII) were conducted. The qualitative data was analyzed with the help of SPSS 17 programs. Besides, thematic analysis approach was used to analyze the qualitative information.

Conceptual Framework of Women Entrepreneurship Development

The conceptual framework for women's entrepreneurship development has been developed based on a related literature review, diverse approaches like social, psychological and economic to the development of female entrepreneurship, and collected data from the field level based on thematic analysis approach, case studies, KIIs and FGDs.

Box-1: Conceptual Framework of Women Entrepreneurship Development

Sociological factors <p>Changing gender norms and attitudes regarding women's participation in business. Women are playing particular socio-economic roles both in their families and communities. Gained family and government support. Women are empowered regarding decisions-making in family affairs and political policy-making. Women develop leadership, risk-taking innovativeness, confidence and self-esteem to manage any challenges. Women developed awareness through multiple training.</p>	Economic factors <p>Women developed market access opportunities and management capabilities. Introduction of new products and production methods in the market. Women entrepreneurs provide employment opportunities for other deprived rural women. Females were able to value-added to their products. Developed access to credit.</p>	Women Entrepreneurship Development
Digital factors <p>Developed digital knowledge, skills and customer engagement. Mobile banking and financial services. E-commerce and online shopping, payment options and companions.</p>		Model of Women's Entrepreneurship Development

Results

Difficulties Faced by Women Entrepreneurs during Business

In the present study, the women entrepreneurs have faced multiple difficulties during the starting of business which include lack of family cooperation, unfriendly environment, lack of capital, religious trouble, lack of proper resources etc.

In Figure 1, it is found that out of total 105 respondents, as high as (21.0 %) per cent of the respondents attained an unfavorable environment during business and 18.1 % did not receive family support while starting up a business. The other difficulties they faced were capital support (19.0%) followed by buying and selling problems (11.4%), lack of awareness of family members (7.6%), lack of proper sources (5.7%), delayed education (2.9%), and confusion about the choice (3.8%), fake customer (3.8%), and less worker (2.9%) respectively.

Figure 1: Percentage Distributions of Various Difficulties Faced by the Respondents during Business.



Problems Faced by Women Entrepreneurs after Establishing Business

In the study area, women entrepreneurs face huge problems after establishing their business such as monetary problems, lack of communication, continuous pressure, gaining people's trust, shortage of raw materials, insufficient facilities, worker mistakes, lack of access to information technology, communication problems, customer satisfaction problems, etc.

Table 1: Percentage Distributions of Business Problems Faced by the Women Entrepreneurs

Problems Related to Business	Number	Percentage
Severe Competition	9	8.6
Problems Related to Design	6	5.7
Monetary Problems	12	11.4
Lack of Communication	12	11.4
Continuous Pressure	13	12.4
Gaining People's Trust	7	6.7
Lack of Employees	7	6.7
Shortage of Raw Materials	11	10.5
Insufficient Facilities	10	9.5
Customer Satisfaction Problems	7	6.7
Problems Related to Getting Support	2	1.9
Lack of Proper Time	4	3.8
Worker Mistakes	5	4.8
Total	105	100

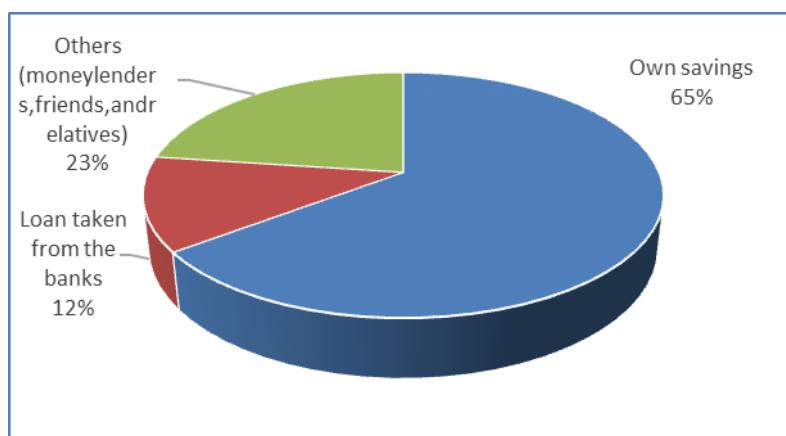
In Table 1, it is found that women entrepreneurs stated multiple factors that women entrepreneurs faced during the business and these are monetary problems 11.4%, lack of communication 11.4%, continuous pressure 12.4%, gaining people's trust 6.7%, and shortage of raw materials is 10.5%, insufficient facilities are 9.5%, and worker mistakes are 4.8%. The women entrepreneurs were asked to explain the core problems they faced after establishing a business by themselves. From FGD, KII and case study it is revealed that the main challenges for women entrepreneurs are copy design, lack of access to information technology, communication problems, lack of information on women entrepreneurship, proper raw materials, gaining customer satisfaction etc.

Sources of Capital

Women entrepreneurs receive capital from various sources such as banks, NGOs, local moneylenders, friends, and relatives. During the data collection period, 64.8 per cent of the respondents were identified as having their own money to start their business, 12.4 per cent took out

loans from the bank, and 22.9 per cent took out loans from others like friends and relatives. It is clear that in the study area women entrepreneurs face huge difficulties in getting bank loans when they start their businesses. At the same time, it is found from FGD and case studies that most of the respondents were not interested in borrowing money. On the other hand, banks were not interested in giving loans to women entrepreneurs. It is also noticeable that they receive loans from banks with strict terms and conditions and also high interest.

Figure 2: Percentage Distribution of The Major Sources of Money



Family Support for Women Entrepreneurship Development

Women's economic empowerment is a positive aspect of developmental discourse. Recently both in the rural and urban areas of Bangladesh a new women's entrepreneurs' class has emerged and they involved themselves in multidimensional business. It was found that out of the total 105 respondents, most of them (44.8) received strong support from their families for starting a business. At the same time, 19.0 per cent of women replied that they did not receive any support from their family.

Table 2: Percentage Distribution of Family Support Received by the Women Entrepreneurs

Family support	Number	Percentage
Strong support	47	44.8
Supportive	38	36.2
Not supportive	20	19.0
Total	105	100

Discussion

The study conducted 12 case studies and the participants were women entrepreneurs. All of them are married. Most of them completed secondary school education and only a few of them are graduates. They live with their husband and children. The single woman entrepreneur lives with their parents or siblings. The lowest family income of the entrepreneurs is Tk.6,000/- and the highest is Tk. 1,00,000/. Most of the women entrepreneurs started their business with a capital of Tk.40,000 to Tk. 60,000 and their current business capital is Tk. 1.00 lac and monthly income is Tk.40000. Majority of the woman entrepreneurs are interested in taking innovative training in designing, fashion and making show pieces. They have some paid employees to buy business-related raw materials. Women entrepreneurs in the study area took loans from banks, and other friends and relatives. Women entrepreneurs always maintain coordination with other entrepreneurs to collect information related to market prices, new designs, fashion issues and also various policy support related to available resources (such as grants and loans) for increasing their professional matters. Now family members, neighbours, and friends have positive attitudes towards starting and growing their businesses. Most of the women operate their businesses online or home delivery basis. Women entrepreneurs stated that the important advantages of an online business are low overhead costs, increased sales, and easy customer service. Most of the women entrepreneurs are educated and they created employment opportunities for other unemployed women. Now women entrepreneurs are involved with income-generating activities and build their own identity in society.

It is found from Focus Group Discussions (FGDs), and Key Informant Interviews (KII) that in the present study, women stated multiple factors that influenced them to be women entrepreneurs. Mainly due to economic hardship, gaining financial freedom and security and also supporting their husband's work they decided to engage themselves in a small handicrafts business. Some women are crafts makers who make showpieces from the fibers of a banana tree and pineapple leaf. They received training from an organization namely 'Inspire Project' from Youth Development Training Institute' and 'Jubo Unnayan Training Center' where a large number of women also received training. This project mainly provides training to women on small handicrafts. Women also participated in 'Bureau Bangladesh' where 100 women are working. They make various showpieces like tissue boxes, penholders, ornament boxes, Nakshikantha and boutique, different kinds of toys, embroidered Katha, bed covers and salwar kamij, handmade bags, wall mats, key rings and other daily usable products from the fibers of banana tree and pineapple leaf as per the design of the customer.

They mainly sold their products at handicraft trade fairs in Dhaka and another divisional fair. Most of them replied that insufficient capital is the major problem for continuing the business. The ownership type of business is personal ownership. Women entrepreneurs procure raw materials from the wholesale market. During Eid and Pahela Baishak they are overloaded with their work. Mainly the price of their produced products is estimated based on the price of essential raw materials, labour fees, transport charges and utility charges. This business has made a positive change in their life. Most of the women entrepreneurs meet their family expenditures like educational expenses of their children and repay loans in installments with their earnings. Now they participate in all kinds of decision-making in the family and their opinion is always valued in their family, even before starting the business. At the same time, the women entrepreneurs faced many challenges from the beginning in their businesses. The main challenges faced by women entrepreneurs are lack of capital, lack of raw materials, lack of preservation system of raw materials, poverty, exploitation, local people's negative attitudes towards female participation in business, lack of training, lack of technology, lack of support from the family, household burden, lack of marketing opportunities due to unavailability of transport, low price, lack of knowledge to get finance (less know-how on project proposal writing), etc. Continuous competitive pressure is another challenge to run their business smoothly. On the other hand, most of the women entrepreneurs do not have proper information about available government and private banking support systems for them. Mainly they took loans from BRAC and Grameen Bank. But in most of the cases when women go to the bank for a loan, they face gender discrimination such as the bank authority seeking male support to endorse the loan.

By starting a new business, now women entrepreneurs contribute a lot to poverty reduction, and human resource development and encourage transformational economic development, which aligns with SDGs 1 (No Poverty) and SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth). Encouraging female entrepreneurship promotes gender equality (SDGs 5 Gender Equality). At present, women entrepreneurs maintain collaboration with various government organizations, NGOs and donors to overcome the multifaceted challenges. These types of collaborative initiatives develop their strengths and courage.

Conclusions

This study identified that the development of women entrepreneurship in the handicraft industry in Bangladesh mainly depends on some entrepreneurial capabilities and supportive conditions of the entrepreneurs such as economic and, motivational issues. In the study area, the main

causes of becoming a women entrepreneur are poverty, the economic situation of the households, the opinion of the husband, own wish etc. In the study area, they take loans from local NGOs like BRAC, and Grameen Bank and they use the loans especially for starting new businesses and also to extend their enterprise on a large scale. The study findings give new insight into the entrepreneurial features developed by women in the study area. Now females are opening up a new small handicrafts' enterprise in their locality. Women are now more empowered in the areas of making their own decisions on income spending and participatory decision-making at the family level. At the same time, the study has identified some major challenges that women entrepreneurs face while doing new business such as less opportunity for training for women entrepreneurs, the high-interest rate for receiving new loans from banks, poverty, lack of marketing opportunities, unavailability of transports, lack of credit, etc. Women's entrepreneurship is not just a source of income, but also a way to achieve multidimensional Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh such as ensuring gender equality, creation of jobs, poverty alleviation and economic growth. So the government has to make a comprehensive gender-disaggregated policy and programmes to promote women entrepreneurs by providing better credit facilities, ensuring marketing opportunities, and good working conditions. Moreover, women should be given more handicraft training and motivation to develop new entrepreneurship in a better way. Additionally, financial institutions should provide more loans with easy terms and conditions for female entrepreneurs to run their businesses.

Recommendations

Based on the findings, the following recommendations were provided to support women entrepreneurs:

Establishing a credit guarantee scheme for workable women entrepreneurs who are capable of running independent businesses.

Regular monitoring of credit disbursement from public and private banks for women entrepreneurs.

Regular dissemination of gender-based data on credit opportunities.

Supporting credit for women entrepreneurs without collateral.

Encouraging female entrepreneurs through award given system

Regular arrangement of national and international trade fairs for women entrepreneurs.

Ensuring more participation of women entrepreneurs in national policymaking and financing.

Arrange more entrepreneurship development training programmes and incentive packages.

References

- Adki, S., 2014. Role of Women Entrepreneurship in Sustainable Development of India, International Journal of Innovative Technology & Adaptive Management, vol.01, issue 05.
- Afrin, S, Islam, N, & Ahmed, S. U. (2008). A multivariate model of micro credit and rural women entrepreneurship development in Bangladesh. International Journal Business Management., 3(8), 169–185.
- Bjerke, B. (2007), ‘Understanding Entrepreneurship’ Edward Elgar, Cheltenham, UK.
- GaurMamta, (2020) Women Entrepreneurs in India: A Study of Opportunities and Challenges, Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, 12(7), 1307–1317
- Hossain KS, M Rahman (1999) Role of Gramen Bank in Entrepreneurship Development: A study on some selected Entrepreneurs. Islamic University.
- Hisrich, R.D., Brush, C. 1986. Women and minority entrepreneurs: a comparative analysis, Mass., Babson Center for Entrepreneurial Studies. Pp. 566 587.
- Meunier, F., Krylova, Y. and Ramalho, R., 2017. Women's entrepreneurship: how to measure the gap between new female and male entrepreneurs? Development Economics, Global Indicators Group.
- Sultana, N., 2006. The role of NGOs in increasing awareness among vulnerable women in Bangladesh: A study on two selected NGOs in Rajshahi. (Unpublished M. Phil Paper), University of Rajshahi.
- Tambunan, T., 2009. Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints, J. Dev. Agric. Econ., 1(2): 27-40.